নীতিবিদ্যা

নীতিবিদ্যা

ডক্টর সুধীর কুমার নন্দী এম. এ., এল্. এল্. বি.,
পি. এইচ. ডি. (কস্লল), সাহিত্যভারতী (বিশ্বভারতী),
স্যার আশুতোষ মুখার্জী গোল্ড মেডালিস্ট (ক্যাল),
গ্রিফিথ রিসার্চ প্রাইজম্যান, প্রাক্তন রিসার্চ ফেলো ও
রিসার্চ স্কলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; সিনিয়র
ফেলো, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অফ্ এ্যাড্ভান্সড্ ষ্টাডি,
সিমলা ; ক্ষুদিরাম বসু স্মারক অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; স্নাতকোত্তর
অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ;
দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলিকাতা

উৎসর্গপত্র

মাতৃপ্রতিম

কল্যাণী রায়

পরম পুণ্যনিলয়াসু—

ভূমিকা

গ্রন্থের মুখবন্ধে নীতিবিদ্যার প্রধান বিচার্য বিষয় ভালো বা শুভ কথাটির তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। 'ভালো কাজ', 'ভালো মানুষ', 'ভালো কথা'— এই সব বিভিন্ন শব্দ যোজনার মধ্যে দিয়ে আমরা 'ভালো' শব্দটির যে অর্থ বা তাৎপর্যটুকু বোঝাতে চাই তার সঠিক চরিত্র বা ধর্মটুকু নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই কাজটি খুব সহজ কাজ নয়। তাই ব্রিটিশ বাস্তবতাবাদী দার্শনিকদের অগ্রগণ্য জর্জ এডওয়ার্ড মূরের এই প্রসঙ্গে বহুখ্যাত আলোচনাটি এখানে সন্নিবিষ্ট ক'রে দিচ্ছি।

মূর তাঁর একখানি গ্রন্থের উপসংহারে বললেন, যে কাজকে আমরা ভালো কাজ বলি তার মধ্যে এমন কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকবে যা কেবল মাত্র মানুষের সমস্ত ভালো কাজেই উপস্থিত থাকতে পারে এবং মন্দ কাজে কখনই তা উপস্থিত থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যে পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কাজটা করা হয়েছে সেই অবস্থায় অনুরূপ অন্য কোন কাজ করে কৃত কর্মের চেয়ে অধিকতর শুভ ফললাভ করা যেত না। তৃতীয়তঃ কৃত-কর্মের ফলকে যদি ভাল বলি তাহলে তার অনুরূপ সমস্ত কাজকেই ভালো বলব এবং অন্যান্য মন্দ কর্ম থেকে এই ভালো কর্মটিকে পৃথক ক'রে দেখব এবং ঐ মন্দ কর্মকে এবং তার অনুরূপ বা স্বধর্মবিশিষ্ট সমস্ত কর্মকেই নিকৃষ্ট বলে মনে করব।

মূর বর্ণিত প্রথম বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। যাকে আমরা ভালো কাজ বলছি সেই কাজের বা যে কোন কাজের তিনটি অঙ্গকে আমরা নির্দেশ করতে পারি : উদ্দেশ্যাঙ্গ (Intention বা motive), প্রক্রিয়া এবং ফল। এখন মনে করা যাক যে আলোচ্য কর্মটির উদ্দেশ্যাঙ্গ শুভ বলে তাকে ভালো কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনায় যে দূর প্রসারী দুরূহ বিতর্কের সৃষ্টি হবে তা হ'ল কাজটিকে ভালো বলছি উদ্দেশ্য শুভ বলে, না কর্মফল কল্যাণকর ব'লে। সেটিকে এড়িয়ে গেলেও আমরা মূর প্রদর্শিত আলোচনার সরনি বেয়ে কোন নির্দিষ্ট সর্বগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না। কেননা ঐ উদ্দেশ্যটি শুভ হলেও এবং ভালো কাজের লক্ষণ হিসেবে এই শুভ উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করলেও মূর নির্দিষ্ট প্রথম তত্ত্বটির সম্যক প্রতিষ্ঠা হয় না। কেননা এমন কথা বলা চলে না যে শুভ উদ্দেশ্যটির আশ্রয় কেবল মাত্র

ভূমিকা

শুভ কর্মের মধ্যেই। অশুভ কর্মের পিছনে শুভ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না এমন কথা কেবল মাত্র তখনই বলা চলে যখন আমরা বলব যে কাজের আত্যন্তিক মূল্য বিচার কেবল মাত্র উদ্দেশ্য দিয়েই সাধিত করতে হবে। শুধুমাত্র উদ্দেশ্য নির্ভর হ'লে কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা দুরূহ হ'য়ে পড়ে, কেননা উদ্দেশ্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি নির্ভর ; তাই মূর কর্মের মূল্যবিচারে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য বিচারকেই মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেননি ; তার এই না গ্রহণ করার ফলে উপরি বর্ণিত শুভকর্মের প্রথম লক্ষণটি কেবল মাত্র শুভ কর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারেনা। অভিজ্ঞতা বলে যে এমন বহু কর্ম নিত্য সংসারে সঙ্ঘটিত হচ্ছে যার উদ্দেশ্য সাধু এবং মহৎ হলেও তার ফল অকল্যাণকর হয়েছে। সুতরাং যদি একথা বলা হয়, ভালো কর্মের মধ্যে এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে যা কেবল মাত্র ভালো কর্মের মধ্যেই থাকবে এবং যা মন্দ কর্মের মধ্যে থাকবে না তা'হলে একথা অসংসয়ে বলা চলে যে সেই গুণটি কর্মের উদ্দেশ্য আশ্রয়ী নয়। তবে সেই গুণটি কী প্রক্রিয়া আশ্রয়ী ? কর্মের শুভাশুভ প্রক্রিয়াকে আশ্রয় ক'রে থাকে এমন কথাও বলা চলে না। প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য এক থাকা সত্ত্বেও দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ফল লাভ করি এবং একটা কর্মকে শুভ এবং অন্য আর একটি কর্মকে অশুভ বলি। বহুশ্রুত গ্রাম্য গোচিকিৎসকের গল্পটা স্মরণ করুন ; প্রথম দিনে আনীত গরুটির ফোলা গলাতে হাতুড়ির আঘাত দেওয়ায় গরুটি ব্যাধিমুক্ত হল আর দ্বিতীয় দিনে আনীত গরুটির স্ফীত গণ্ডদেশে হাতুড়ির আঘাত করায় গরুটির প্রাণবায়ু বহির্গত হ'ল। একই প্রক্রিয়া উভয় কর্মের অঙ্গ। প্রথম কাজটাকে ভালো এবং দ্বিতীয় কাজটাকে মন্দ বললে আমরা সেক্ষেত্রে ফল দ্বারাই কাজ দুটাকে বিচার করছি কেননা এই উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য এবং প্রক্রিয়া একান্তভাবে সমধর্মী। পরিবেশভেদে, অবস্থাভেদে একই প্রক্রিয়া দুই বিভিন্ন ধরনের ফল প্রসব করেছে। তা হ'লে মূর কথিত প্রথম সূত্রটি প্রক্রিয়ার উপরেও প্রযোজ্য হয় না। এবার ফলাফলের কথায় আসা যাক। শুভ ফলপ্রসূ হ'লে কি কর্মকে আমরা 'শুভ' আখ্যা দিই। তা আমরা সাধারণতঃ দিই না। তা হ'লে মূর কথিত প্রথম সূত্রটি ফলাশ্রয়ী হ'তে পারে। অর্থাৎ যে কাজ ভালো ফল দিল সেই কাজই 'ভালো' এবং যে কাজ মন্দ ফল দিল সে কাজই মন্দ। তবে এখানে আর একটা বড় প্রশ্ন উঠবে। সে প্রশ্নটা হ'ল, কাকে ফল দিল ? যদি কর্মকর্তার ভালোমন্দটুকু কর্মের লক্ষ্য হয় তা হ'লে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুখবাদী হ'য়ে পড়ছি। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সুখবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় আপত্তি এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য

হবে। আবার যদি মনে করা যায় যে এই ফল বিচার হবে কর্মকর্তার কল্যাণের দিকে লক্ষ্য না রেখে, কেবলমাত্র সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এর বিচার হবে তা হলে আমরা কর্মকর্তানিরপেক্ষ সুখবাদী (Altruistic hedonist) হ'য়ে পড়ছি। তার বিরুদ্ধেও অনেক আপত্তি আছে। এতদুভয়ের বিরোধ মীমাংসার জন্য আমাদের কার্য বা মঙ্গলকে যুক্তিসিদ্ধ (rational) করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ কথিত Philosophical anarchism বা দর্শনগত নৈরাজ্যবাদের ধারণা, এই মানুষের শুভাশুভের, Rationale এর ওপর নির্ভরশীল।, আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থের মধ্যে সীমারেখা টেনে কাজের ফলধারা তার ভালো মন্দ বিচার করা কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিচার পুঁথিগত হয়ে পড়বে; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নেই বললেই চলে। কেননা একই কাজের ফল আমার কাছে মন্দ হ'তে পারে; আবার তা অনেকের কাছেই ভালো হতে পারে। এইক্ষেত্রে মূর কথিত প্রয়োজন-সূত্রটি ফলাশ্রয়ী হ'তে পারে না। আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থের সমন্বয় প্রসঙ্গে মূর বলেছেন: "I think therefore, we must conclude that a maximum of true good, for ourselves, is by no means always secured by those actions which are necessary to secure a maximum of true good for the world as a whole; আত্মকর্মের সঙ্গে পর কর্মের সমন্বয় ঘটানো সহজসাধ্য নয়; যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থের কল্পনায় জগতের কল্যাণের সঙ্গে আত্মকর্মের সমন্বয় ঘটবে কী না এ সম্বন্ধে মূর সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রমাণশাস্ত্রের সাহায্যে আত্মস্বার্থ অথবা সামগ্রিক স্বার্থসাধনের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে রায় দান সম্ভব নয়। তবে কখন কী অবস্থায় আমি আত্মস্বার্থ অথবা পরস্বার্থের কথা চিন্তা করব, এবং সেই অনুসারে কাজ করব সেটা হল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বা প্রয়োজন সাধনের প্রশ্ন (practical importance)। মূল্যায়নের অন্যকোন মানদণ্ডের সাহায্যে আমরা এই আত্মস্বার্থ পরস্বার্থের দ্বন্দ্ববিরোধের নিরসন করতে পারব না। মনে করা যাক সমানভাবে ধর্মপরায়ণ দুটি ব্যক্তির কথা, ক এবং খ; জগতের কল্যাণের জন্য ত্রিশ বৎসর বয়সে ক প্রাণ দিলেন; খ তাঁর পুত্রকলত্রের কথা চিন্তা ক'রে, নিজের কথা চিন্তা ক'রে দেশের কল্যাণে, দশের কল্যাণে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারলেন না। কর্তব্যকর্মের আহ্বানে দুজনেরই প্রাণ উৎসর্গ করা উচিত ছিল। প্রাণ উৎসর্গ ক'রে ক যে আত্যন্তিক মূল্য আপনার জীবন দিয়ে অর্জন করলেন খ কী আরো ত্রিশ বৎসর বেঁচে থেকে নানান সৎকর্ম ক'রেও তা অর্জন করতে পারবেন? যাঁরা আত্মস্বার্থের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ স্বার্থের সমন্বয়

ঘটান সম্ভব মনে করেন, তাঁরা বলবেন যে খ যতই ভালো কাজই করুন না কেন কোন দিনই তিনি আত্যন্তিক মূল্যের বিচারে ক এর সমকক্ষ হ'তে পারবেন না। এমন কথা সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা শক্ত।

সুখবাদীরা সুখের পরিমাপে কর্মের আত্যন্তিক মূল্য বিচারের পক্ষপাতী। মূর বলছেন যে বোধ হয় কাজের ভালো মন্দের বিচার সুখবাদীদের দেওয়া সুখ-লক্ষণের দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে। কিন্তু আত্যন্তিক মূল্যের পরিমাপ সুখের পরিমাপের দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না : "It may therefore possibly be the case that quantity of pleasure is, as a matter of fact, a correct criterion of right and wrong, even if intrinsic value is not always in proportion to quantity of pleasure contained." যদি আমরা এই সত্যটিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই যে আত্যন্তিক মূল্য হল সুখের পরিমাপের সঙ্গে আনুপাতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তবেই এ কথা বলা যাবে যে সুখের পরিমাপের দ্বারা কর্মের আত্যন্তিক মূল্য নির্ধরিত হয়। মূর বলছেন যে সুখ-আত্যন্তিক মূল্য নিশ্চিত সম্পর্কের প্রবর্তনার এই Postulate টিকে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করে তবেই না সুখের দ্বারা আত্যন্তিক মূল্যের পরিমাপ করতে অগ্রসর হওয়া যায়। এই মূল্যায়ন চক্রকদোষদুষ্ট।

সুখ যেমন কোন কর্মের আত্যন্তিক মূল্যের যথাযথ নির্ধারণে অপারগ তেমনি ভাবে কোন একটি উপাদান (Factor) এই আত্যন্তিক মূল্য নিরূপণে অক্ষম। মূরের নিজের কথাতেই বলি :

"We may, I think say, first of all, that for the same reason for which we have rejected the view that intrinsic value is always in proportion to quantity of pleasure, we must also reject the view that it is always in proportion to the quantity of any other single factor whatever."

জ্ঞান, পুণ্য, পরজ্ঞান, প্রেম এরা কেউই এককভাবে কর্মের আত্যন্তিক মূল্য নির্ণয়ের উপযোগী নয়। কেননা এককভাবে এদের পরিমাণগত ভেদ অথবা এক গুণের সঙ্গে অন্য আর একটি গুণের সংযুক্তি বিষয়ের আত্যন্তিক মূল্যভেদ ঘটায়। আমরা অভ্রান্তভাবে বলতে পারিনা যে, যে বিষয়ের আত্যন্তিক মূল্য বেশী, তার মূল্য কেন বেশী হল আর যার আত্যন্তিক মূল্য কম তার মূল্যই বা কেন কম হল? আত্যন্তিক মূল্যের স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় আমাদের সাধ্যাতীত। তবে এ কথাও সত্য যে যার আত্যন্তিক মূল্য বেশী বলে আমরা বুঝি সেই কর্মটিই আমাদের করা উচিত। আত্যন্তিকমূল্যসম্পন্ন কর্ম বা বস্তুনিচয়ের

অবচ্ছেদক ধর্ম বা পরজাতি ধর্ম নিরূপণ ও সহজসাধ্য নয়। মূর বলছেন যে আত্যন্তিক মূল্য নির্ণয়ের প্রমাণশাস্ত্রসম্মত পন্থা পরিহার করে আমরা যদি আত্যন্তিক মূল্যসম্পন্ন কর্মের এবং আত্যন্তিক মূল্য বিহীন কর্মের দুটি তালিকা প্রস্তুত করি এবং কর্মগুলিকে মূল্যবান অথবা মূল্যহীন কেন মনে করছি তার কারণ নির্দেশ করি তা হলে আমরা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটা অগ্রসর হতে পারব। সমাধানের এই পথের ইঙ্গিত দিয়ে মূর এই পথে অগ্রসর হননি; স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে যেন দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। এমন কথা 'ত' আমরা স্বভাবতঃই বলতে পারি যে আত্যন্তিক মূল্যের লক্ষণ নিরূপণ না করে কেমন করে আমরা আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যবান এবং আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যহীন কার্যাবলীর ক্রমান্বিত শ্রেণীবিভাগ করব? আর যদিও করি তবে তা আমাদের প্রয়োজন এবং খেয়ালখুশির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হবে। এই শ্রেণী-বিভজন কর্মটুকু বৈজ্ঞানিক বিভজন হবে না।

আত্যন্তিক মূল্য ধারণার আলোচনার উপসংহারে মূর বলছেন যে আত্যন্তিক মূল্যের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে আমাদের অনুভূতি (Feeling) এবং চেতন-মনের অন্য অন্য প্রক্রিয়া। এই অনুভূতি-অঙ্গের মধ্যেই সুখানুভতি বিধৃত এবং আমাদের আত্যন্তিক মূল্য ধারণাটুকু যৌগিক এবং মিশ্র (compound); অবশ্য মূর এ কথাও বলেছেন যে উপরোক্ত দুটি লক্ষণের কোনটাই আত্যন্তিক মূল্যের বিশেষ ধর্ম বা স্বরূপ লক্ষণ নয়, কেননা এরা মন্দ অথবা 'ভালোও না মন্দও না' এমন কর্মের অঙ্গ হিসেবেও বিরাজ করতে পারে। সুতরাং দেখা গেল, মূরের আত্যন্তিক মূল্য ধারণার কোন স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়নি। তিনি এ ক্ষেত্রে অনির্বচনীয় বস্তুবাদী।

Ethics গ্রন্থে স্থানভাবের দোহাই দিলেও মূর তাঁর Principia Ethica গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অবশ্য আত্যন্তিক শুভ এবং আত্যন্তিক অশুভকর্মের ব্যাখ্যা এবং শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রায় সমস্ত শুভকর্মই জটিল এবং যৌগিক। এই শুভকর্মের অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই কোন আত্যন্তিক মূল্য নেই। কর্মের বিষয় সম্বন্ধে কর্তার অনুভূতি প্রবণতার কথার উল্লেখও মূর করেছেন। মূর আরো বলেছেন যে, যে কাজগুলিকে আত্যন্তিক মূল্য-সম্পন্ন বলছি তাদের মধ্যে মিল যে খুব বেশী তা নয়; যে যে বিষয়ে তাদের অমিল রয়েছে সেই সেই বিষয়ে মূল্যবান কর্মাবলীর আত্যন্তিক মূল্যকে বৃদ্ধি করেছে। তাদের পরজাতিধর্ম এবং অবচ্ছেদক ধর্ম কেউই নিরঙ্কুশ ভাবে ভালো নয় অথবা মন্দ নয়; কর্মের গুণাগুণ এতদুভয়ের সমন্বয়ের ফল মাত্র। মূর ত্রিবিধ কর্মের কথা বলছেন: (১) অবিমিশ্র শুভ (২) অবিমিশ্র অশুভ এবং (৩) মিশ্র শুভ। সুন্দর বস্তু

বা ব্যক্তিকে ভালবাসা হ'ল এই অবিমিশ্র শুভের উদাহরণ। সুন্দর এবং ভালো বস্তুর প্রতি ঘৃণা পোষণ করা অবিমিশ্র মন্দের উদাহরণ হিসেবে মূর নিয়েছেন এবং মিশ্র শুভের উদাহরণ হিসেবে বলেছেন কুৎসিতকে ঘৃণা করার কথা। মূরের এই ব্যাখ্যা যে সর্বগ্রাহ্য হতে পারে না তার স্বীকৃতি তিনি আপন গ্রন্থেই রেখে গেছেন। তিনি লিখছেন :

"Many of the judgments, which I have made in this chapter, will no doubt, seem unduly arbitrary : it must be confessed that some of the attributions of intrinsic value, which have seemed to me to be true, do not display that symmetry and system which is wont to be required of philosophers'.

দার্শনিক আলোচনার সুমিতি এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না থাকলেও মূরের আলোচনা সার্থক আলোচনা। মূরের এই আলোচনার কথা স্মরণে রেখে পুস্তকের বিষয়বস্তুতে অনুপ্রবেশ করলে আমরা বিষয়টির সূক্ষ্ম জটিলতা সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে উঠব। এর ফলে যে কোন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের যে বৈজ্ঞানিক সংশয়টুকু জেগে থাকবে তা ভবিষ্যত আলোচনা এবং বিরোধী মত সম্বন্ধে সহনশীলতার পথকে প্রশস্ত করবে।

পূর্বভাষ

উচ্চতম শিক্ষার পরিসরে ও তার প্রয়োজনে নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখা খুব সহজ কাজ নয় জেনেও সে কাজে হাত দিয়েছি দেশের অগণিত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কাজে একটুখানি সহায়তা করতে পারব, এই ভেবে। দীর্ঘদিন দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করে এ কথা আমার মনে হয়েছে যে ছেলেমেয়েরা যদি পরভাষার গণ্ডীটাকে অতিক্রম করে আপনার মাতৃভাষার মাধ্যমে দর্শনের দুরূহ ধারণাগুলির সম্মুখীন হয় তবে বোধহয় তারা সহজেই দুর্বোধ্য তত্ত্বগুলিকে আয়ত্ত করতে পারবে। বিদেশী ভাষার পোশাকে যে বিদ্যা ছিল অনায়ত্ত ও দূরধিগম্য, তা সহজেই শিক্ষার্থীর কাছে অধীতবিদ্যারূপে গণ্য হবে। বিদেশী ভাষার বৈতরণী পার হতে হতে ছেলে-মেয়েরা যখন ক্লান্ত হয়ে নীতিবিদ্যা তথা দার্শনিক তত্ত্বগুলির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তখন সেই পরিশ্রান্ত শিক্ষার্থীর চোখের সামনে তত্ত্বের পাহাড়গুলো উদ্ধত বিন্ধ্যপর্বতের মতই ক্রমাগত মাথা তুলতে থাকে। ছেলেমেয়েরা ভয়ে হাল ছেড়ে দেয়—তারা বোঝার চেষ্টা ছেড়ে তত্ত্বগুলিকে না বুঝে কণ্ঠস্থ করে অথবা অসাধু উপায়ের চোরাপথে সেগুলিকে আত্মস্থ ক'রে পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করে; এ কথা সর্বজনবিদিত। মাতৃভাষার সহজপথে নীতি-বিদ্যার তত্ত্ব এবং তথ্যগুলিকে প্রবাহিত করে দিয়ে যেগুলিকে সহজেই ছেলেমেয়েদের বোধের চৌহদ্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যাবে, এই আশাতেই গ্রন্থ লেখা। সেই আশাটুকু পূর্ণ হলে আমাদের সকলের পরিশ্রম সার্থক হবে।

"আমাদের" বললেম এই কারণে যে গ্রন্থ লিখন একার কাজ নয়। লেখা পড়ায় অনেক বাধা; সে বাধা নানান রূপ নেয়, পরিবেশগত, পেশাগত এবং মনোগত। সেসব বাধা যাঁদের সাহায্যে অতিক্রম করেছি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী গবেষণারতা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নমিতা দাস সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের প্রতিটি দিনে মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে অনলস হাতে সাংকেতিক শ্রুতিলিখনে সমগ্র গ্রন্থটিকে প্রকাশযোগ্য করে তুলেছেন; তাঁকে অবশ্য ধন্যবাদ দেব না; তাঁর জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যে যেন তিনি তাঁর আশীর্বাদটুকু কল্যাণীয়া নমিতার মাথায় শ্রাবণের ধারার মত অজস্র ধারায়

বর্ষণ করেন। সুদীর্ঘ সাংকেতিক শ্রুতিলিখনের ছোটখাটো অবকাশের ফাঁকে ফাঁকে শ্রুতিলিখন করেছেন আমারই তত্ত্বাবধানে গবেষণারতা ছাত্রী কল্যাণীয়া সুচেতা মৈত্র। তাঁকে আশীর্বাদ করি যেন তিনি তাঁর গবেষণার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন।

"শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানির" বোঝায় চাপা পড়ে গিয়ে যখন নীতিবিদ্যার তথ্য এবং তত্ত্বের বোঝাকে একপাশে সরিয়ে রেখে শেল্ফে রাখা কোনান্ ডয়েলের দিকে হাত বাড়িয়েছি তখনই যে কিশোরী কপট ক্রোধে আমার সেই পলায়ণী বৃত্তিটুকুকে ব্যাহত করেছে সে আমার কন্যা ধৃতি। নিরন্তর উৎসাহে সে আমাকে আমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে উদ্বোধিত করেছে। আশীর্বাদ করি কল্যাণীয়া ধৃতির জীবনে যেন এই জ্ঞানস্পৃহাটুকুর সত্য উদ্বোধন ঘটে।

Loyal Art Press (P) Ltd. এর শ্রীযুক্ত বাসুদেব লাহিড়ী মহাশয়ের এবং State Book Board এর চীফ একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীঅবনী মিত্র মহোদয়ের সহযোগিতাটুকুর কথা উল্লেখ করছি, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। সহকর্মী ডক্টর জটিল কুমার মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁদের অকুণ্ঠিত সাহায্যের জন্য।

গ্রন্থখানিকে উৎসর্গ করেছি মাতৃপ্রতিমা স্বর্গতা কল্যাণী রায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে। স্বাধীনতাযুগে মেদিনীপুরের সংগ্রামের ঐতিহ্য জাঁড়ার জমিদার বাড়ীকে কেন্দ্র করে একটি ছোটখাটো সংগ্রামীরূপ নিয়েছিল; শ্রীযুক্তা রায় জাঁড়া ভবনের প্রধানা হিসেবে অন্তরাল থেকে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের রসদ জুগিয়েছিলেন; সে কথা স্মরণ করে তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছি: 'ধন্যোঽহম্'।

দর্শন বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলিকাতা।

শ্রীসুধীর নন্দী

নীতিবিদ্যা

সূচীপত্র

বিষয়সূচী | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীতিবিদ্যা ও অন্যান্যবিদ্যা

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া

পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

নৈতিক চেতনা

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিক দায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুখবাদ

সপ্তম অধ্যায়

স্থূল নৈতিক সুখবাদ

পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়

ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ

নবম অধ্যায়

যুক্তিবাদ : কাণ্টের কৃচ্ছ্রবাদ

দশম অধ্যায়

পরিপূর্ণতাবাদ

একাদশ অধ্যায়

নৈতিক ভিত্তি

পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায়

মানুষ ও তার সমাজ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সামাজিক ও নৈতিক সংস্থা

চতুর্দশ অধ্যায়

কর্তব্য ও অধিকার

পঞ্চদশ অধ্যায়

কর্তব্য ও ধর্ম

পৃষ্ঠা

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

শাস্তিতত্ত্ব

সপ্তদশ অধ্যায়

চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতি

পরিশিষ্ট

ভারতীয় নৈতিক আদর্শ

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

নীতি ও নীতিবিদ্যা—বৈদিক প্লেতোনিক ও আরিস্ততলীয় মতবাদ—নীতি শব্দটির অর্থ—নৈতিক বিচারের প্রয়োগ—নীতিবিদ্যা ও বিজ্ঞান—আদর্শাশ্রয়ী বিজ্ঞান রূপে নীতিবিদ্যা—নীতিবিদ্যার স্বরূপ—নীতিবিদ্যা ও Practical Philosophy—হার্টম্যান ও অন্যান্য নীতিশাস্ত্রবিদদের অভিমত—নীতিবিদ্যা ও প্রয়োগবিদ্যা—ম্যাকেঞ্জি ও অন্যান্য নীতিশাস্ত্রবিশারদদের অভিমত—নীতি-বিদ্যার বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়—নীতিশাস্ত্রপাঠের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা।

নীতিবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

কোন বিষয়ে পাঠ আরম্ভ করার আগে সেই বিষয়টির সংজ্ঞা নির্দেশ করার একটা রীতি আছে। কিন্তু বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার পূর্বেই যদি আমরা বিষয়টির সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করি, তবে বোধ হয় সংজ্ঞাটি দুর্বোধ্য হয়ে পড়বে। বিশেষ করে যখন নীতিবিদ্যার সংজ্ঞার ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। তাই নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার আগে আমরা উদাহরণ সহযোগে নীতিবিদ্যার স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করব। মানুষের নৈতিক আচরণ বিধির ব্যাখ্যা ও তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্বনির্ণয়ই যে হল নীতিবিদ্যার কাজ, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষের আচরণ বিধিকে বিধিবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা চলেছিল এবং সেই চেষ্টার মধ্যেই আমরা নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনার প্রথম সূত্র আবিষ্কার করি। বেদের 'ব্রাহ্মণ' অংশে নীতিকথা ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া যায়। বেদ প্রায় যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৪৫০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল। বৈদিক ঋষিরা এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী নীতি-পরিমণ্ডলের কথা ভেবেছিলেন। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ঋত'। একে বৈদিক ঋষিরা বলেছেন বিশ্ব সত্তা। মানুষ কেন, দেবতারাও নীতিকে মেনে চলতেন। বৈদিক মতে মানুষকে সৎ হ'তে হ'লে তাকে নিত্যদিন দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। বৈদিক ক্রিয়াকর্মের, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাও আমাদের নৈতিক জীবনের অনুকূল ব'লে ধারণা করা হ'ত। যাঁরা বেদপন্থী নন এমন পণ্ডিতের সংখ্যা ও কিন্তু এদেশে কম নয়। এদেশের চার্বাক পন্থীরা, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা, জৈন ধর্মে বিশ্বাসীরা কিন্তু বেদের মত মানেন না। ওদেশের অর্থাৎ পাশ্চাত্যের প্রাচীন দার্শনিক প্লেতো এবং আরিস্ততলের কথা ধরা যাক। এঁরা যথাক্রমে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪০০ এবং ৩০০ বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্লেতো তাঁর 'Republic' ও 'Philebus' গ্রন্থে ব্যক্তি মানুষের নৈতিক আচরণ-বিধি ও সমাজের সামগ্রিক নৈতিক আচরণ বিধির কথা বললেন। তিনি স্বভাবতই বেদপন্থী নন ; তাই

বেদকে প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার ক'রে বেদোক্ত নীতি শাস্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেননি। আর তাঁর পক্ষে বেদকে গ্রহণ বা বর্জন করার প্রশ্নটা ও অবান্তর। আরিস্ততল বললেন যে সর্ব্বোচ্চ নৈতিক মূল্য রয়েছে সুখের মধ্যে। তবে সে সুখকে পেতে হ'বে নৈতিক আচরণ বিধির অনুসরণ ক'রে। তাঁর মতে বুদ্ধিজীবী মানুষ আপন আপন বিচারবুদ্ধির ব্যবহার ক'রে যে আচরণবিধি অনুসরণ করে তা হ'ল 'Dianoetic Virtues'; যুক্তি আশ্রিত বলেই এই নীতি-ধর্মের মূল্য অনেক বেশী। আর এক ধরনের নীতি ধর্ম আছে। প্লেতো এর নাম দিয়েছিলেন 'Ethical Virtues'; যখন আমরা যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে আমাদের আবেগ প্রবণ পশুবৃত্তিটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তখন আমরা এই Ethical Virtues এর সন্ধান পাই। আরিস্ততল বললেন, যে সুখে আমরা আমাদের নৈতিক জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাই তা হ'ল এই dianoetic এবং ethical virtuesএর সমন্বয়ের ফলশ্রুতি; অর্থাৎ এই দুই ধর্মের সমন্বয়ের মধ্যেই নৈতিক জীবনের পূর্ণ সার্থকতা। নৈতিক জীবনসাধনার পরামূল্যটুকু এই সমন্বয়ের মধ্যেই বিধৃত।

কিন্তু মানুষের এই প্রবৃত্তি বা Instinct টাকে এযুগের নীতিবিদরা সবাই নিন্দা করেননি। নব্য দার্শনিক ব্রাট্রাণ্ড রাসেল আবার বললেন যে নৈতিক জীবনের লক্ষ্য হ'ল আনন্দ। ব্যক্তি মানুষের Good life বা সৎ জীবন হ'ল আনন্দের জীবন এবং সেই জীবনই হ'ল পরম কাম্য (desirable); সেই আনন্দময় নৈতিক লক্ষ্যের নিরূপণ করার ব্যাপারে যুক্তি-বুদ্ধির (Rationality) কোন হাত নেই। জীবনের নৈতিক লক্ষ্য নিরূপণ ব্যাপারে Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তির কর্তৃত্ব ষোল আনা। নৈতিক লক্ষ্যটি নিরূপিত হ'য়ে গেলে কোন উপায়ে, কী ভাবে সেই লক্ষ্যে পেঁছানো যাবে সেটি ঠিক করে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি বা reason; লক্ষ্য বা উপেয়কে যুক্তিআশ্রিত বা যুক্তিহীন (Rational or Irrational) এই সব আখ্যায় আখ্যাত করতে চাননি দার্শনিক রাসেল। নৈতিক লক্ষ্য হ'বে প্রেয় বা অভীপ্সার যোগ্য। তা হ'ল মানবপ্রবৃত্তির (Instinct) কাজ; যখন কোন নৈতিক লক্ষ্যকে ভালো ব'লে বুঝব, অভীপ্সিত বলে ধারণা করতে পারব তখনি কিন্তু তাকে জীবনে সত্য ক'রে তোলার জন্য আমরা উপায়ের সন্ধান করতে থাকব। এই নির্দিষ্ট আনন্দময় লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রশ্নে উপায় উদ্ভাবনের সার্থকতা এবং সেই প্রকৃষ্ট উপায়টুকু উদ্ভাবনের কাজ হ'ল যুক্তি-বুদ্ধির (Reason); অতএব গ্রীক দার্শনিকের

যুক্তিবাদিতা থেকে নব্য ইয়োরোপীয় নীতিদর্শনের যুক্তিবাদিতার স্বরূপ স্বতন্ত্র। সেখানেও পার্থক্যটা পরিস্ফুট।

তা হ'লে দেখা গেল যে বেদ যাকে নীতির সার বললেন, ঠিক তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না প্লেতো এবং আরিস্ততল উভয়েই। আবার প্লেতো-আরিস্ততল যে নীতিধর্মের কথা বললেন, তা ঠিক বৈদিক আচরণ-বিধির সঙ্গে হুবহু মিলল না; নব্যদার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও ভিন্ন কথা বললেন; সেখানেও অমিল রয়ে গেল। অথচ বেদের প্রামাণ্য বা প্লেতো এবং আরিস্ততল কথিত নীতিধর্মের সারবস্তুর কথা কেউই সহজে অস্বীকার করতে পারেন না। ভারতের আস্তিক্যবাদী দর্শন যেমন বেদপন্থী ঠিক তেমনি আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনকে প্লেতোর দর্শনের পাদটীকা বা Foot-note বলা হয়েছে। অর্থাৎ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন এক অর্থে প্লেতো-পন্থী। উভয়ের মতের গরমিল নৈতিক আদর্শের দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের কথাই নির্দিষ্ট ক'রে দেয়। নীতি বলতে আমরা কী বুঝি? তা নির্ধারণ করতে না পারলে নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়াও সহজসাধ্য হবে না। নৈতিক আদর্শের চরিত্র নির্ণয় করতে না পারলে নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়াও কঠিন হ'বে। বিভিন্ন পণ্ডিতজন আবার ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করেছেন; তাই তাঁদের গ্রহণযোগ্য নীতিবিদ্যার সংজ্ঞাও বিভিন্ন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নীতিবিদ্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। অতএব নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক অনু-সন্ধানের পরে এর সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করলে বোধ হয় তা ফলপ্রসূ হ'বে।

দার্শনিক ক্রোচে শিল্প নীতি সম্মত কিনা এই দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন যে, যেহেতু শিল্প মানুষের সমগ্র মনন ধর্মের প্রতি-ক্রিয়া বা প্রতিবেদন মাত্র, অতএব শিল্পে নীতিধর্মের স্পর্শ এবং প্রভাব থাকবেই। মানুষের জীবনে নৈতিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কেননা মানুষ সামাজিক জীব এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে নৈতিকতার সম্বন্ধ অতি নিবিড়। মানুষের নৈতিক আচরণের আধার হ'ল তার সামাজিক জীবন। সমাজ জীবনে মানুষের কতকগুলি আচরণ এবং অভ্যাস নিন্দিত ও অন্য কতকগুলি প্রশংসিত হয়; পশ্চিম দেশীয় নীতিশাস্ত্রবিদ এদের বলেছেন Moral Actions, অর্থাৎ নৈতিক মূল্যায়ন যোগ্য ক্রিয়াকর্ম। মানুষের সমাজ জীবনের এই দিকটা—যাকে আমরা সৎ বা অসৎ এই দুই আখ্যায় আখ্যাত করতে পারি, এরই সম্যক আলোচনা যে বিদ্যার

থাকে তার নাম নীতিবিদ্যা (Ethics অথবা Science of Morality) দিয়ে থাকি।

গ্রীক বিশেষ্য Ethos থেকে Ethics কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে। Ethos শব্দের অর্থ হল, সামাজিক প্রথা অভ্যাস বা আচার। এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে Ethics (চরিত্র) কথাটি। আমরা বলতে পারি যে, সমাজে স্বীকৃত প্রথা ও আচারের নিত্য অনুসরণ করে আমরা যে অভ্যাস গঠন করি এবং সেই অভ্যাসের মাধ্যমে যে চরিত্র গঠিত হয় তাকে 'নৈতিক' বলে প্রশংসা করা হয়। তাহলে বলা যায় যে, Ethics বা নীতিবিদ্যা হল সেই শাস্ত্র যে শাস্ত্রে মানুষের আচরণ এবং চরিত্রের প্রশংসা এবং নিন্দার যুক্তিসঙ্গত মান নির্দিষ্ট করে দেয়।

লাতিন শব্দ Mores (বিশেষ্য পদ) থেকে Moral শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে; এর অর্থও সমাজ-সম্মত আচরণ; সামাজিক মানুষেরা অনুশীলনের দ্বারা এই আচরণ অভ্যাস করে থাকে। এই সূত্রটি থেকে বিচার করলে আমরা Ethics বলতে সেই চিন্তাগুলিকেই বুঝবো যা মানুষের আচরণের সামাজিক দিকটা নিয়ে আলোচনা করে এবং ভালো (Good) বা কল্যাণের অর্থ ও মান নির্দিষ্ট করে দেয়। এই শাস্ত্র বা বিজ্ঞান মানুষের আচরণের বিচার বিশ্লেষণ ক'রে কোন একটি আদর্শকে নির্দেশ করে। এই আদর্শকে কেন গ্রহন করা হল, তাকে আদর্শই বা বলা হল কেন তার যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে আলোচনাও এই শাস্ত্রে দেখা যায়। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'ভালো এবং মন্দ' কথা দুটির যথেচ্ছ ব্যবহার করি; কিন্তু নীতি-বিদ্যার মানদণ্ডে বিচার ক'রে বলব যে, মানুষের কোন কোন আচরণকে ভালো বা বলা হয় কেন আবার অন্য কতকগুলি আচরণকে মন্দই বা বলা হয় কেন? নীতিশাস্ত্রে এই ভালো-মন্দ বলার ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখব যে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আচরণ; এই আচরণ-অভ্যাস নৈতিক বিচারের বিষয়; এই আচরণ মানুষের চরিত্রকে সম্যক্ প্রকাশ করে। অতএব বলা চলে, নীতি বিদ্যা মানুষের আচরণ ও চরিত্রের মান নির্নয় করে; তাদের আদর্শও নির্দেশ করে দেয়। এই মান বা আদর্শ হল মানুষের কল্যাণের আদর্শ। এই আদর্শ আবার ঔচিত্য-অনৌচিত্যের নিয়ামক। আমরা নীতিশাস্ত্রবিদ Lillie-র সংজ্ঞা মনে রেখে বলতে পারি যে, নীতিবিদ্যা হল সামাজিক মানুষের আচার আচরণের আদর্শ-বিধায়ক বিজ্ঞান। মানুষের আচরণকে এই বিজ্ঞান

ন্যায় বা অন্যায়, ভালো অথবা মন্দ এই ধরনের আখ্যায় আখ্যাত ক'রে থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ নীতিবিদ্যার কাজ হ'ল মানুষের অভ্যাস ও প্রথাকে অনুসরণ ক'রে তার নৈতিক আদর্শের অন্বেষণ করা, যে নীতি মানুষের সমগ্র চরিত্রকে বিধৃত করে থাকে তার সম্যক্ আলোচনা করা। মানুষের ন্যায় অন্যায় আচরণ, শুভ এবং অশুভপ্রসূ অভ্যাসগুলি কোন্ নীতির উপর নির্ভরশীল, কোন্ আদর্শকে তারা আশ্রয় করে থাকে এসবের আলোচনাও নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুত।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি যে, সমাজ বহির্ভূত মানুষের বেলায় কি নৈতিক বিচার ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য নয়। নির্জন দ্বীপবাসী Alexander Selkirk যখন সমাজ জীবনের কথা, বন্ধুত্বের কথা, প্রীতি ভালোবাসার কথা আকুলভাবে বলছেন তখন কি তিনি যা ভাবছেন তা নৈতিক বিচারের আওতায় আসবে না? উত্তরে আমরা বলব যে তা নিশ্চয়ই আসবে। কেন না নৈতিক আচরণ বলতে আমরা শুধু পরিদৃশ্যমান ক্রিয়া কাণ্ডকেই বুঝি না, আমরা মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকেও বুঝি। কারণ হল, মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি মানুষের চরিত্রকে, তার অভ্যাসকে প্রকাশ করে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, সমাজসম্মত হলেই যে তা নৈতিক হবে এবং সমাজসম্মত না হলে তা অনৈতিক হবে এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের কল্যাণ কামনা যে সব সামাজিক বিধি বিধান এবং আচার-প্রথার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'বে, তাকে আমরা নৈতিক বলব। কিন্তু কালের প্রভাবে যখন এই ধরনের প্রথা এবং আচার-বিচার তাদের কল্যাণের শক্তিটাকে হারিয়ে ফে'লে সমাজের সংহত শক্তিকে ধ্বংস করে তখন তাকে আর কল্যাণপ্রসূ বলে স্বীকার করা যায় না। অন্ধ সামাজিক প্রথায় তা পর্যবসিত হয়। এই ধরনের সামাজিক প্রথার অন্ধ অনুকরণ নৈতিক আচরণ নয়। নীতিবুদ্ধি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ; সেই নীতি বুদ্ধি মানুষের মনন ধর্মের মধ্যে অনুস্যূত। মানব প্রকৃতির মধ্যেই মানুষের নৈতিক বুদ্ধিটকু প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মানুষের প্রতিষ্ঠা এই নীতি বুদ্ধির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

উপরের প্রাথমিক মন্তব্যগুলি থেকে আমরা নীতিবিদ্যার একটি সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করতে পারি। (নীতিবিদ্যা হ'ল সেই বিজ্ঞান যা মানবজীবনের পরম আদর্শ ও সেই আদর্শের নির্ণায়ক ও পরিপোষক নৈতিক বিধিবিধানগুলির চরিত্র নির্ণয় করে; এই নৈতিক বিধিবিধান

অনুসারেই মানুষের আচরণের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়।) দার্শনিক William Lillie নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন: ('সমাজের অধিবাসী মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানই হ'ল নীতিবিদ্যা। মানুষের আচরণ ভালো অথবা মন্দ, উচিত কী অনুচিত, তার বিচার নীতিবিদ্যা করে।' ('We may define Ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies—a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way'. W. Lillie : An Introduction to Ethics, পৃ: 2)

নীতিবিদ্যা কী বিজ্ঞানধর্মী ?

নীতিশাস্ত্রকে নীতি-বিজ্ঞান বলা হয়েছে। বিজ্ঞান কথাটির অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান; অন্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দ এই অর্থেই বিজ্ঞান কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। আমরা বিজ্ঞান বলতে সাধারণত: বুঝি সমজাতীয় কতকগুলি বস্তু বা ক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ও যুক্তি সঙ্গত আলোচনা ক'রে সেই বিষয়ের মূল বিধিবিধান বা আইন কানুনের অনুসন্ধান কার্য; বিজ্ঞান কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশে অগ্রণী হয় না। বিজ্ঞানী মানুষের জ্ঞানের সীমাকে স্বীকার করে নেয়; তাই প্রত্যেক বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। একটি বিশেষ সীমার দ্বারা বিজ্ঞানী তার আলোচ্য বিষয়কে চিহ্নিত করেন। বিজ্ঞানের চেষ্টা হল বিশ্বের চলমান ঘটনা প্রবাহের পশ্চাতে যে মূল বিধিবিধান বা Fundamental Laws ক্রিয়াশীল রয়েছে, তার সন্ধান ও ব্যাখ্যা করা। বিজ্ঞান কতকগুলি মৌল সূত্রকে বিশ্লেষণ করে এবং যুক্তি বিচারকে অবলম্বন ক'রে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে প্রাকৃতিক শক্তির তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করে। সুষ্ঠু তর্কশাস্ত্রসম্মত আলোচনা হল বিজ্ঞানের লক্ষ্য। প্রত্যক্ষণ ও পরীক্ষণ অর্থাৎ Observation ও Experiment—এদের আশ্রয় করেই বিজ্ঞানী তাঁর সন্ধান কার্য চালান। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল, জ্ঞান লাভ করা। বিজ্ঞানীর মুখ্য উদ্দেশ্য হল সুসম্পূর্ণ জ্ঞান; এই সুসম্পূর্ণজ্ঞানটুকু লাভ হয় বিষয়ের সাধারণ সূত্রগুলির (General Laws) যথাযথ আয়ত্তীকরণের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট এবং নির্ভুল হওয়া চাই বিজ্ঞানের আলোচনা প্রকরণ: তাই বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলশ্রুতিও নির্দিষ্ট এবং নির্ভুল হয় ব'লে সাধারণের ধারণা। নীতি বিজ্ঞানে কিন্তু এই পরীক্ষণ বা Experi-

ment-এর কার্যকারিতা অপ্রাসঙ্গিক। তবে নীতিবিজ্ঞানের আলোচনা সুশৃঙ্খল ও যুক্তিসঙ্গত হওয়া দরকার। সুনিবদ্ধ চিন্তা এবং বিচার, এদের আশ্রয় করেই নীতি বিজ্ঞান সিদ্ধান্তের পথে অগ্রসর হয়।

নীতিবিদ্যা : বস্তুনিষ্ঠ (Positive) ও আদর্শনিষ্ঠ (Normative) বিজ্ঞানের প্রভেদ— :

কতকগুলি বিজ্ঞানকে Positive Science (বস্তুনিষ্ঠ বা সদর্থক বিজ্ঞান) বলা হয়েছে: 'Positive Science tells us about the nature of things as they actually are'. প্রাকৃতিক ঘটনা যেমনটি ঘটে এই বিজ্ঞান তেমনটি বলে এবং তার স্বরূপ বিচার বিশ্লেষণ করা হল এই ধরনের Positive Science-এর কাজ। রসায়ন শাস্ত্র বা Chemistry, পদার্থবিদ্যা বা Physics হল এই ধরনের Positive Science; রসায়ন শাস্ত্র জলের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ফরমুলা বা সূত্র নির্দেশ করে দেয় বা পদার্থবিদ্যা শব্দের গতি সম্বন্ধে যে পরিমাপ দেয় তা সবই হল Positive Science-এর আলোচ্য এবং অন্তর্ভূক্ত। নীতিশাস্ত্র কিন্তু এই ধরনের Positive Science নয়; একে বলা হয়েছে Normative Science বা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। Normative Science-কে ব্যাখ্যা করে বলা চলে যে, এই ধরনের আলোচনাও বিকলন নৈতিকব্যবহারের ও চিন্তনের মান ও আদর্শকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমরা কি করব, কি আমাদের করা উচিত এই সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। এই মান নির্ণায়ক বিজ্ঞানই হ'ল Normative Science: নন্দন-তত্ত্ব বা Aesthetics, তর্ক বিদ্যা বা Logic—এদের Normative Science বলা হয়। নীতি বিজ্ঞান বা নীতি বিদ্যাও এই ধরনের Normative Science; নীতি বিদ্যার উদ্দেশ্য হল, একথা আমরা আগেই বলেছি, মানুষের ব্যবহারবিধির, মানুষের আচরণের আদর্শ নির্দেশ করা। কোন্ আদর্শ কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে অর্থাৎ মানুষকে কোন্ ধরনের আদর্শের উদ্বুদ্ধ করা উচিত, তার নির্দেশ দেবে নীতি বিজ্ঞান বা নীতি বিদ্যা। মাকে কথা দিয়ে বিদ্যাসাগর উত্তাল নদী পার হয়েছিলেন রাত্রির অন্ধকারে; এই আচরণের যৌক্তিকতা ব্যবহারিক বিচার বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু আদর্শ-আশ্রয়ী মানুষের যে নৈতিক বিদ্যা সেই-বিদ্যাতে এই ধরনের নৈতিক ব্যবহারের যৌক্তিকতা অতি মাত্রায় সুস্পষ্ট। নীতি বিজ্ঞান তাই Normative Science-এর আওতায় আসে। তবে নীতি বিজ্ঞানে আদর্শের দিকটাকে বড় করে দেখা হলেও, মানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া

হলেও নীতি বিজ্ঞানের আরেকটি দিকও রয়েছে। সেই দিকটা হোল প্রকৃতি নির্দেশক। মানুষের প্রকৃতি কি, তার চরিত্রের স্বরূপ কি এইসব সম্বন্ধে আমাদের যদি কোন জ্ঞান না থাকে তবে মনুষ্য আচরণের আদর্শও আমরা নির্ণয় করতে পারি না। কোন ভাঙ্গা বাড়ী সারাতে হলে, কিংবা সেই ভগ্ন গৃহকে নতুন রূপে দিতে হলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা কি অবস্থায় আছে। এটা হল গৃহ পুনর্নির্মাণ করার প্রাথমিক পদক্ষেপ। তেমনি ধারা মানুষের চরিত্রের, তার প্রকৃতির স্বরূপ জানা না থাকলে আমরা কি করে মনুষ্য আচরণের আদর্শ নির্ণয় করতে পারি? বোধহয় পারি না। তাই নীতি বিজ্ঞান বা নীতি বিদ্যা মুখ্যত: Normative Science হলেও নৈতিক বিচার বিশ্লেষণে মনুষ্য চরিত্রের Positive অর্থাৎ সদর্থক দিকটিকে উপেক্ষা করা চলে না। তাই মনোবিকলন বা Psychological Analysis নীতি বিজ্ঞানের সহায়ক বলে গণ্য হয়েছে। এই বিশ্লেষণের ফলে মানুষের নৈতিক চিন্তার ও ব্যবহারের আদর্শ নির্ণয় করা সহজ হয়ে উঠেছে।

দার্শনিক Locke বললেন, 'Morality is the proper science and business of Mankind in general' অর্থাৎ দার্শনিক লকের মতে নীতি-বিজ্ঞানই হল সাধারণ মানুষের আলোচনার সবচেয়ে উপযোগী বিষয় বস্তু। আমরা জানি যে, সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষের কাছে নীতি বিজ্ঞান মুখ্য বিবেচনার উপযুক্ত বিষয়। মানুষের মত বাঁচতে হলে, সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হ'লে নীতি এবং আদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে; পশুর ব্যবহারের সঙ্গে মানুষের আচরণের এখানেই তফাৎ। পশুর ব্যবহার (behaviour) হল ব্যবহার মাত্র এবং মানুষের ব্যবহার শুধু ব্যবহারই নয়, তা হল আচরণ বা conduct। পশুর মত মানুষেরও সহজাত প্রবৃত্তি বা Instinct আছে। মানুষ তার শুভ নৈতিক বুদ্ধির দ্বারা এই প্রবৃত্তিকে সংযত করে; এই সংযমের মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব। তাই মহাদার্শনিক আরিস্ততল বললেন যে, নৈতিক জীবনের মধ্যেই মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। নৈতিক স্বভাবই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ স্বভাব। এই প্রসঙ্গে তিনি নীতি বিজ্ঞানকে বিশেষ মর্যাদায় অনিষ্ঠ করে দেখেছেন। মানুষের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এই নৈতিক জীবনের পটভূমিকায়; ব্যক্তির নিজের মধ্যেই মনুষ্য সমাজের মহৎ ঐক্য বিধৃত। নীতি বিদ্যার আলোচনাকালে আমরা মানুষের এই সার্বজনীন প্রকৃতির আলোচনা করি, সন্ধান পাই মানুষের সেই সর্বব্যাপী ঐক্য ও অস্তিত্বের বিস্তৃতির: এই অর্থে আমরা নৈতিকতাকে মানব-কর্মের সামান্য লক্ষণ বলতে

পারি ; এই নৈতিক গুণটি কেবলমাত্র মনুষ্যসমাজেই পরিলক্ষিত হয়। মানুষের অন্যান্য বিশেষ প্রয়োগধর্মী গুণাগুণ এবং আকস্মিক বিদ্যাবত্তা থেকে এই নৈতিক গুণটিকে পৃথক ক'রে দেখতে হ'বে ; মানুষের প্রকৃতির একরূপতা এবং তার কর্তব্যের সাধারণীকরণ–এসবের যথাযথ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা নীতি-বিজ্ঞান দিয়ে থাকে। ["Morality might in this sense be called the Universal and characteristic element in human activity, its human element, par excellence, as distinguished from its particular technical and accidental elements, the delineation of this (our common nature and common duty) the proper business of mankind in general is the endeavour of Ethical Science."]

নীতিবিত্তার স্বরূপ :

নীতিবিদ্যাকে Normative বা আদর্শাশ্রয়ী এই আখ্যায় আখ্যাত করলে এটুকু বোঝা যায় যে, এই বিদ্যা বা বিজ্ঞান নৈতিক আদর্শের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং সেই আদর্শকে নির্দিষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করে। নীতি-বিদ্যা মানুষের নৈতিক চরিত্রের বর্ণনা করে না ; নৈতিক আদর্শের উপস্থাপনা ও তাকে নির্দিষ্ট রূপ দেবার প্রয়াস পায়--এই ধরনের কথা ভাববাদী দর্শনশাস্ত্রবিদেরা বলেছেন। বিষয় বাদী নীতি-বিদ্যা বা Objective Ethics-এর ভাষ্যকার Nicolai Hartmann এই প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন তার উল্লেখ করা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বললেন, আমাদের নৈতিক অনুভূতি হল মূলত: প্রেয়ের মান সম্পর্কিত অনুভূতি ; সেই প্রেয়ের অনুভূতিকে কর্মে রূপান্তরিত করতে নির্দেশ দেয় এই অনুভূতি ; এক কথায় এই অনুভূতি হ'ল মূল্য-অনুভূতি। এই নৈতিক মূল্যের অনুভূতিকে তিনি বললেন Apriori বা সর্ব অভিজ্ঞতা অনির্ভর। প্লেতোনিক দর্শনে আমরা সকল মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা অনির্ভর এই Apriori জগৎটিকে পেয়েছি। মূল্য-সম্পর্কিত সর্ববিধ অনুভূতির আশ্রয় হল প্লেতোর এই Apriori জগৎ বা World of Ideas ; নৈতিক মূল্যের এই আদর্শাশ্রয়ী চরিত্র Hartmann এর মতে সমস্ত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত Apriori Idea-র জগতে স্থিত। তাঁর (Hartmann-এর) মতে, জ্যামিতি যেমন জ্যামিতিক সত্যগুলিকে শেখায় তেমনি নীতিবিদ্যা আমাদের নৈতিক সত্যগুলিকে শেখাতে পারে। অর্থাৎ নৈতিক আদর্শের দিকে নীতিবিদ্যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাত্র। জ্যামিতির সঙ্গে নীতিবিদ্যার তফাৎ হল এই যে, নীতিবিদ্যা আমাদের একটি

মূল্যের জগতের দিকে, একটি মান দণ্ডের দিকে, কতকগুলি অবশ্য করণীয় কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং নীতিবিদ্যা তার এই বিশেষ গুণে Normative বা আদর্শাশ্রয়ী হয়েছে ; তার Method বা প্রয়োগ-পন্থা এবং নৈতিক শিক্ষার গুণে তা মোটেই Normative বা আদর্শাশ্রয়ী হয়নি। (It therefore is normative according to its content, but not according to its method or its kind of teaching)

অতএব Hartmann-কে অনুসরণ করে বলা চলে যে নীতিবিদ্যা হল Normative বা আদর্শাশ্রয়ী এবং নীতি বিদ্যার সেই আদর্শাশ্রয়ী চরিত্রটুকু পাই আমরা তার বিষয়বস্তুতে। Hartmann আরো বললেন যে, নীতি বিদ্যার এই বিষয়বস্তুর Normative Character বা আদর্শাশ্রয়ী চরিত্রকে নীতিবিদ্যার চরিত্র হিসেবে দেখা হয়েছে। আমাদের চেতনায়ও এই সব নৈতিক আদর্শ যে পরিমাণে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠে আমাদের কর্মে প্রেরণা এবং নির্দেশ দেয়, আমাদের মানসিক গঠন তৈরী করে দেয়, আমাদের অতি-বাস্তব চারপাশের জগতটাকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে শেখায়, ঠিক সেই পরিমাণেই নীতিবিদ্যার এই Normative বা আদর্শাশ্রিত চরিত্রটুকুকে দেখা যায়। এইপ্রসঙ্গে Hartmann আরও বললেন যে(নীতিবিদ্যা হল একধরনের প্রয়োগমূলক দর্শন বা Practical Philosophy ;) কিন্তু তিনি এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে সাবধান করে দিয়ে বললেন, মানুষ নীতিবিদ্যা পাঠের ফলে কতখানি নীতি-পরায়ণ হয়ে উঠতে পারে এটা দেখা বোধহয় নীতিবিদ্যার কাজ নয়। নীতিবিদ্যা পাঠের ফলে পাঠকের কতটুকু উপকার হল, সমাজের নৈতিক মানের কি উন্নতি ঘটল, তা দিয়ে নীতিবিদ্যার চরিত্রের বিচার হয় না। তবে কি একথা বলা যায় যে, নীতিবিদ্যার কাজ হল মূল্যের জগতকে আবিষ্কার করা ? এই দুর্লভ জগতটিকে আবিষ্কার করেই কি নীতিবিদ্যাকে ক্ষান্ত থাকতে হবে ? জীবনে কোথাও তার প্রয়োগ ঘটলো কি না এটা কি নীতিবিদ্যা দেখবে না ? Hartmann বললেন যে, এই ধরনের মূল্যমান নির্ণয় করার দিকে নীতিবিদ্যার সজ্ঞান প্রয়াস না থাকলেও মানুষ যখন এই বিদ্যা আয়ত্ত করার ফলে উর্ধতর মূল্য চেতনায় চেতনাবান হয়ে উঠবে, যখন তার নৈতিক বিচার বুদ্ধির উন্নতি ঘটবে, তখন নিশ্চয়ই সেই নৈতিক মূল্য সম্বন্ধে সে অধিকতর সংবেদনশীল এবং সচেতন হয়ে উঠবে। (মানুষের মূল্য চেতনাকে নীতিবিদ্যা জাগ্রত এবং বর্ধিত করে, এই সিদ্ধান্ত করলেন Hartmann।) অতএব Normative বা মাননির্ণায়ক বিজ্ঞান হয়েও নীতিবিদ্যা তাঁর কাছে Practical Science-এর মর্যাদা পেল।

নীতিবিদ্যাকে Practical Philosophy এই আখ্যা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটা ওঠে সেটি হল কেমন করে নৈতিক আদর্শ, (কোন্ শক্তি বলে এই নৈতিক আদর্শ) বাস্তব জীবনের রূপান্তর ঘটায়? Hartmann বললেন, এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছে যে, মূল্যের জগৎ সরাসরি বস্তু জগতকে প্রভাবিত করতে পারে না। মানুষের মূল্য চেতনার ভিতর দিয়ে এই মূল্যের জগৎ বস্তু জগতের রূপান্তর ঘটায়। (একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে Nicolai Hartmann-এর মতে মূল্যের জগৎ মানুষের জ্ঞান অনির্ভর)। এই বস্তু জগৎ হল মূল্যের জগতের বিপরীতধর্মী (Contrary)। এই প্রসঙ্গে Hartmann দুই ধরনের Apriori বা অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত মূল্য বোধের কথা বলেছেন। এক ধরনের Apriori মূল্য বোধে শুধু জ্ঞানের পরিচয় থাকে; কর্মে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা মানুষ পায়না এই ধরনের মূল্য বোধ থেকে। আরেক ধরনের Apriori মূল্য বোধের কথা তিনি বললেন। এই অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত মূল্য বোধের তিনি নাম দিলেন, Commanding Apriori; অর্থাৎ এক্ষেত্রে মূল্য বোধ মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের কি করা উচিত এই শিক্ষা এই মূল্য-বোধ আমাদের দেয়। মূল্যের ধর্মই হল, আদর্শের চরিত্রই হল, কি করে, কেমন করে সেই মূল্যকে, সে আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় তার পথ নির্দেশ (Suggest) করা। এই অর্থেই নীতিবিদ্যাকে Practical Philosophy বলা হয়েছে।

অতএব আমরা দেখলাম কী অর্থে Hartmann নীতিবিদ্যাকে Practical Philosophy ব'লে চিহ্নিত করলেন। নীতিশাস্ত্রবিদ ম্যাকেঞ্জি এবং মুরহেড নীতিবিদ্যাকে 'Practical' আখ্যা দিতে সম্মত হলেন না। ম্যাকেঞ্জির মতে যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করতে পারি তাদেরই প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান বা Practical Science বলা উচিত। ভেষজ-বিদ্যা এই ধরনের বিদ্যা বা বিজ্ঞান; অনুরূপ বিজ্ঞান থেকে লব্ধ জ্ঞান আমাদের শুধু জ্ঞানের পিপাসা মেটায় না; বস্তু জগতে এর প্রয়োগের ওপর এই জ্ঞানের সার্থকতা। ভেষজ বিদ্যা যেমন শুধু ঔষধ এবং রোগের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক'রে কি ব্যাধিতে কি ঔষধ প্রয়োগ করা হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ দেয়; নীতিবিদ্যা কিন্তু আমাদের নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নিদান সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দান করে না। ম্যাকেঞ্জির মতে নীতিবিদ্যা (আচরণের আদর্শ অনুসন্ধান করে মাত্র; তাই তাকে Normative Science বা আদর্শমূলক বিজ্ঞান বলা হয়।) কিন্তু কেমন করে এই আদর্শ জীবনে প্রয়োগ করা হবে তার খুঁটিনাটি নির্দেশ আমরা নীতি বিদ্যা থেকে পাই না। জীবনে

নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের কি কর্তব্য হওয়া উচিত তার নির্দেশ নীতি শাস্ত্রে থাকে না। ম্যাকেঞ্জি বললেন : নীতিবিদ্যার কাজ হ'ল নৈতিক আদর্শের যথাযথ অনুধাবন করা। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রকরণবিধি অর্থাৎ তার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব নীতিবিদ্যার নেই। (Ethics must content itself, with understanding the nature of the ideal, and must not hope to formulate the rules for its attainment.)*

নীতিশাস্ত্রবিদ মুরহেড Theoretical Science ও Practical Science-এর মধ্যে (জ্ঞানানুসারী বিজ্ঞান ও প্রয়োগ মূলক বিজ্ঞানের মধ্যে) দুর্ভেদ্য সীমারেখা টানিতে চাননি। তিনি সাধারণ বুদ্ধির নির্দেশ মেনেই বললেন, সব Theoretical Science-এর বা জ্ঞানাশ্রয়ী বিদ্যার কিছু প্রয়োগ জীবনে ঘটেই ; আবার সব প্রয়োগ বিদ্যারই একটা জ্ঞানের দিক, একটা জানার দিক আছে। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি না জানলে তার প্রয়োগকৌশল ও আয়ত্ত করা যায় না। অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির একটা আত্যন্তিক সম্বন্ধ না থাকলেও এক ধরনের সম্পর্ক এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে ; এই সম্বন্ধটিকে ঠিক 'আকস্মিক' বলা চলে না। মুরহেড স্বীকার করলেন যে, নীতিবিদ্যার সঙ্গে মানুষের জীবনের খুবই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। শারীরবিদ্যা বা জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে আমাদের এতটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নেই। তবুও মুরহেড বললেন, একথা মানতেই হবে যে নীতিবিদ্যার কাজ হল বিচারের দ্বারা যুক্তির আশ্রয় নিয়ে নৈতিক আদর্শ, নৈতিক মানকে নির্দেশ ক'রে দেওয়া। সেই আদর্শগুলিকে কেমন করে জীবনে রূপায়িত করা যায়, সেই আলোচনা তাঁর কাছে গৌণ।

Nicolai Hartmann নীতিবিদ্যাকে Practical Philosophy বলতে চেয়েছেন, একথা আমরা জানি। দার্শনিক Seth নীতিবিদ্যাকে প্রয়োগবিদ্যা বলায়, কোন আপত্তির কারণ দেখতে পান নি। আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং সেই জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা মানুষের চরিত্রকে উন্নত করা—এরা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধবদ্ধ। জ্ঞান এবং তার প্রয়োগ এরা একে অপরের পরিপূরক। আরিস্ততলের কথা উদ্ধৃত করে সেথ্ বললেন যে, নীতিবিদ্যা নৈতিক জ্ঞান এবং তার প্রয়োগের ওপর সমান ভাবে দৃষ্টি দেয়। অতএব একে Practical Philosophy বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না। এই ব্যাপারে সেথের সঙ্গে হার্টমানের মতের মিল রয়েছে।

---

*Mackenzie : Manual of Ethics, পৃ: ৯

নীতিবিদ্যা কী প্রয়োগবিদ্যা মাত্র ?
((Is Ethics an Art ?)

এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থাপিত হয় ; সেটি হল : 'Is Ethics an Art ?' প্রয়োগ বিদ্যাকে কি আমরা শুধুমাত্র কলা কৌশল বা প্রয়োগ নিপুণ্য বলে মনে করব ? আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, প্রয়োগ-বিদ্যা বা Practical Science হল সেই বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগেই তার সার্থকতা। অর্থাৎ সেখানে প্রয়োগটাই মুখ্য। আমরা জানি যে নীতি বিদ্যায় জ্ঞানটা মুখ্য হলেও প্রয়োগটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাই আমাদের বিচার করতে হবে যে নীতিবিদ্যাকে কি art বলা চলবে ? (Art বা কলা বলতে আমরা বুঝি, কোন নির্দিষ্ট ফল লাভের জন্য কতকগুলি বিধি বা নিয়মকানুন অনুসরণ করা (An art is a set of rules to produce a result). এই Result বা ফল লাভটাই মুখ্য হ'ল কলা বা আর্টের সীমানার মধ্যে। নীতিবিদ্যা কি কেবল আমাদের কতকগুলি প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করতে শেখায় ? আমাদের নৈতিক ব্যবহার কি এমন কতগুলি কৌশলের সমষ্টি যা আয়ত্ত করলেই আমাদের আচরণ নৈতিক আচরণের মর্যাদা পাবে ? বিচারের কোন স্থান কি এখানে নেই ? আমাদের মতে বিচারের স্থান নীতি-বিদ্যার মধ্যে মুখ্য। তাই যে অর্থে আমরা বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বিদ্যাকে কলা বা আর্ট বলি ঠিক সেই অর্থে নীতিবিদ্যাকে কলা বা আর্ট বলা চলে না। বস্ত্রবয়ন বিদ্যার প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট ফলাকাঙ্ক্ষা রয়েছে : ধুতি শাড়ী কাপড় চোপড়। নৈতিকতায় এধরনের অতি নির্দিষ্ট ফল প্রাপ্তি নেই। নৈতিক আদর্শনিষ্ঠ আচরণকে বস্তু বা 'অবস্থা' কোন আখ্যাতেই আখ্যাত করা যায় না ; একে ক্রিয়া বলা চলে। ম্যাকেঞ্জির কথা উদ্ধৃত করি : "Goodness is not a capacity or potentiality but an activity".* নৈতিক সততা অর্থাৎ যাকে আমরা ভালো বলি তাকে কোনমতেই কাজকরার সামর্থ্য বলা চলে না। ভালো বলতে আমরা নীতিসম্মত ক্রিয়াকে বুঝি।

নীতিবিদ্যা কী বিজ্ঞান ?
(Is Ethics a Science ?)

নীতিবিদ্যা কি 'বিজ্ঞান' এই আখ্যায় আখ্যাত হতে পারে। আমরা

---

*A Manual of Ethics : পৃ: 14

পূর্বেই নীতিশাস্ত্রবিদ ম্যাকেঞ্জির প্রাসঙ্গিক মতের উল্লেখ করেছি। ম্যাকেঞ্জি বলেছেন,(আচরণ বা Conduct-ই হল মানুষের সামগ্রিক জীবন। মানুষের সমগ্র পরিচয় টুকুই হল তার নৈতিক পরিচয়। তাহলে নীতিবিদ্যা এই সামগ্রিক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের বিচার করে।) অতএব নৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীই হল সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হল দার্শনিক জনোচিত, Viewing things sub-specie aeternitatis; এটা হল দার্শনিকের কাজ। অতএব নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর নিকট আত্মীয়তা রয়েছে, একথা নীতিশাস্ত্রবিদ ম্যাকেঞ্জি বেশ জোরের সঙ্গে বললেন। ম্যাকেঞ্জি যখন নৈতিক আচরণকে মানুষের সম্যক আচরণের, মানুষের সম্যক জীবনের সমানধর্মা বললেন, ঠিক সেই চিন্তা ধারার অনুসরণ ক'রে ম্যাথুআর্নল্ড বললেন যে, মানুষের conduct বা আচরণই হল তার জীবনের চার ভাগের তিনভাগ। অর্থাৎ তিনিও নৈতিক জীবনকে, নৈতিক জীবনচর্যাকে ম্যাকেঞ্জির মতই প্রাধান্য দিলেন। কিন্তু এই মতকে সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না। আমরা একথা স্বীকার করব যে, অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিবিদ্যার যেটুকু সম্বন্ধ তার চেয়ে অনেক গভীরতর সম্বন্ধে নীতিবিদ্যা দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু দর্শনের বিষয়বস্তু যেমন আব্রহ্মস্তম্ভ পরিব্যাপ্ত, নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু তেমন ব্যাপক নয়। তাছাড়া মানুষেয় আচরণই তো তার অস্তিত্বের সবটুকু নয়। মানুষের দেহের পরিবর্তন, তার সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবর্ত ক্রিয়া প্রভৃতি বহুলাংশে অন্ধ এবং তাদের কর্মপদ্ধতি বহু ক্ষেত্রেই চিন্তা ও বিচার বহির্ভূত। তাই আমরা এদের 'আচরণ' এই আখ্যায় আখ্যাত করতে পারি না। এদের এক ধরনের জৈব ক্রিয়া বললেও 'আচরণের' মর্যাদা এদের দেওয়া চলে না। আমাদের আচরণের পিছনে চিন্তা এবং বুদ্ধির পরিচালনা থাকে। আবার চিন্তা-সিদ্ধ সকল ক্রিয়াকেও আমরা 'আচরণ' বলতে পারি না। নৈতিক দৃষ্টিতে আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চাকে Natural বা নির্গুণ মনে করতে পারি; হয়তো আমাদের আচরণে তার প্রতি-ফলন ঘটে না। এছাড়াও নীতিবিদ্যার আলোচনায় আমরা বিজ্ঞানাশ্রয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করব; শুধুমাত্র Speculation বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে আমরা অগ্রসর হব না। মানুষের প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা যদি নৈতিক সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান খুঁজতে চাই তবে একথা মনে রাখতে হবে যে নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান অস্ত্র পরীক্ষণ বা experiment এবং নির্ভুল পরিমাপ বা accurate measure-ment-এর ব্যবহার চলে না। নৈতিক ঔচিত্য অনৌচিত্য নির্ধারণ করার

ব্যাপারে আমাদের সহজাত অন্তর্দৃষ্টি (Intuition)-র উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। এই অন্তর্দৃষ্টির সামগ্রিক বীক্ষণ কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। তাই নীতিবিদ্যাকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় বলা যায় না। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে যে বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি নীতিবিদ্যার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। তাই ক্ষেত্রবিশেষে একে Normative Science (আদর্শনিষ্ট বিজ্ঞান) বলা হয়েছে।

নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু

(The Subject matter of Ethics)

নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু এবং পরিধি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করার পূর্বে নীতিবিদ্যার যে ষড় রূপের পরিকল্পনা পণ্ডিতেরা করেছেন তার উল্লেখ করা দরকার। মূলত: এই ছয়টি রূপই দেশবিদেশের পণ্ডিতদের নৈতিক বিচারে আত্মপ্রকাশ করেছে।

(১) প্রথমটি হল, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নৈতিক আদর্শের বিবরণ। ঐতিহাসিক এবং অস্তিবাচক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই পরিচয় আমরা পাই। এই পর্যায়ে কোন আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় না।

(২) নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এই পর্যায়ের নীতি বিদ্যায় আলোচনা করা হয়; Normative বা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে Ethics বা নীতিবিদ্যার আলোচনা এই স্তরে হয়েছে।

(৩) এই পর্যায়ের নীতিবিদ্যায় নীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে সমগ্র বিশ্বের মূল সত্যের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখে, গভীরতর বিশ্লেষণ ক'রে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর নামকরণ করা হয়েছে Moral Philosophy.

(৪) কোন বিশেষ নৈতিক আদর্শকে আমরা কেন গ্রহণ করি? যখন আদর্শগত সংঘাত ঘটে তখন কোন একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি আমাদের পক্ষপাতদুষ্টতা কেন হয়? এবং আদর্শের সংঘাতের ফলে কোন্ আদর্শটি আমাদের কাছে কি কারণে গ্রহণ যোগ্য হ'বে?—এই সব নীতিশাস্ত্রসম্মত প্রশ্নের সমাধান আমরা পাই যে শাস্ত্রে তাকে আমরা Casuistry অথবা Applied Ethics এই আখ্যায় আখ্যাত করি।

(৫) এই শ্রেণীর নীতিশাস্ত্র প্রধানত: প্রয়োগ-অনুসারী। সুষ্ঠু নৈতিক জীবন যাপনের জন্য আমরা যেসব উপদেশ পালন করি তার বিধিবদ্ধ রূপ আমরা এই শ্রেণীর নীতিবিদ্যায় পাই। যেমন, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবে; শৌচকর্মাদির পর ভালো করে হাত-মুখ ধোবে, গুরুজনদের প্রণাম করবে; অতিথিপরায়ণ হবে—ইত্যাদি নির্দেশ।

(৬) এই শ্রেণীর নীতিবিদ্যায় নৈতিক আদর্শকে অনুসরণের কথা বলা হয়। সৎ জীবন-যাপনের জন্য অভ্যাস গঠন করা হয় এই নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ ক'রে। Lillie একে বললেন; The art or practice of living a good life.

সাধারণত: নীতিবিদ্যার এই ছয়টি রূপই আমাদের চোখে পড়ে। নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা ক'রে উপরোক্ত ছয়টি শ্রেণীকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে। আমাদের মতে নীতিবিদ্যা শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের বিচার বিশ্লেষণ ও বিবরণ দেয় এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির পর্যালোচনা করে। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়—এদের স্বরূপ, প্রকৃতি ও ধর্মের বিচার বিশ্লেষণ করে। নৈতিক বিচারের সঙ্গে তর্কশাস্ত্র সম্মত বিচারের প্রভেদ কোথায়, নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু কি, এই সব আলোচনা নীতিবিদ্যার অন্তর্গত। নৈতিক বিচারে ন্যায়-অন্যায়ের মান (Standard of moral Judgment) নির্দেশ করা নীতিবিদ্যার কাজ। বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের তুলনামূলক বিচারও নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত; বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের সমন্বয় সম্ভব কিনা তার বিচারও নীতিবিদ্যার বিষয়ীভূত।

নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে মানুষের প্রকৃতির বিশ্লেষণও করা দরকার। কেননা, মানুষের ইচ্ছা এবং চিন্তার ওপর তার নৈতিক আচরণ বহুলাংশে নির্ভরশীল। সচেষ্ট ক্রিয়া বা Voluntary Action-কে আশ্রয় করেই মানুষের নৈতিক জীবন স্ফুরিত হয়; এই ধরনের মনোবিকলন হল মনস্তত্ত্বের কাজ। অতএব কিছু কিছু মনস্তাত্বিক আলোচনা নীতিবিদ্যার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

নৈতিক আচরণে ব্যক্তির সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে। এই নৈতিক দায়িত্ব বা Moral Responsibility-র ধর্ম সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে মানুষের ব্যক্তিত্বকে (Personality), তার বিচার বুদ্ধিকে (Rationality) এবং তার কাজ করার ব্যক্তি স্বাধীনতাটুকুকে (Freedom) স্বীকার করে নিতে হবে। অতএব এইসব বিষয়ের আলোচনাও নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিক কর্তব্য আমাদের একধরনের বন্ধনে আবদ্ধ করে; তাকে আমরা

বাধ্যবাধকতার দায় বা Moral obligation আখ্যা দেই। সে দায়টুকু আমাদের অমোঘ নৈতিক বিধির (Moral Low) কাছে। সুতরাং এই নৈতিক বিধির বিধান সম্বন্ধেও নীতিবিদ্যাকে আগ্রহী হতে হবে।

আমাদের নৈতিক কর্মের সঙ্গে, নৈতিক জীবনের সঙ্গে কতিপয় গভীর আবেগ যুক্ত থাকে। তাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করাও নীতিবিদ্যার কাজ।

মানুষের নৈতিক জীবন পাপ পুণ্যের ধারণার দ্বারা বিধৃত। নৈতিক আচরণের সঙ্গে এই পাপ পুণ্যের ধারণার ঐকান্তিক যোগ আছে। তাই নীতি-বিদ্যায় তাদের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক।

অন্যায়ের প্রতিষেধক হ'ল শাস্তি। বিভিন্ন গর্হিত আচরণগুলির শাস্তিও বিভিন্ন হয়। কি ধরনের দোষের কি ধরনের সাজা দেওয়া হবে? অন্যায়ের আকার ও প্রকার ভেদের সঙ্গে। তার গুরুত্বের সঙ্গে, শাস্তির যোগ কিভাবে স্থাপন করা যায়? শাস্তি দানের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? এই সব প্রশ্নও নীতিবিদ্যার আলোচ্য।

মানুষের নৈতিক জীবন চলমান। ধীরে ধীরে তার নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটে। যখন অপকর্ষ ঘটে তখন তার স্বরূপ নির্ণয় করা—তা কেন ঘটল তার বিচার করা, এসবই নীতিবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত। আবার সাম-গ্রিকভাবে নৈতিক আদর্শের যখন উর্দ্ধগতি হয় তখন সেই উর্দ্ধগমন কোন পথে চলেছে, তার বিকাশ ঠিক পথ ধরে হচ্ছে কিনা অর্থাৎ এক কথায়, নৈতিক প্রগতির আদর্শটাকে নির্ণয় করাও নীতি বিদ্যার কাজ।

নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় (Scope or province of Ethics)

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই আলোচনার কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় বস্তু থাকে এবং এই বিষয়বস্তুর আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও এই ধরনের বিজ্ঞানে সন্নিবিষ্ট হয়। এই আলোচ্য বিষয়গুলিকে বলা হয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা scope ; অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই নীতিবিদ্যারও একটি নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়বস্তু আছে। নীতিবিদ্যা যেহেতু নীতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান সেহেতু নৈতিক চেতনার উপাদান নিয়ে এ বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। ঔচিত্য এবং অনৌচিত্যের ধারণা (right and wrong) ভালো মন্দের ধারণা (good and bad), গুণ এবং দোষের ধারণা (merit and demerit), ধর্ম এবং অধর্মের ধারণা (Virtue and vice), নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্বের ধারণা (moral duty & responsibility) প্রমুখ নৈতিক চেতনার উপাদানের আলোচনা নীতিবিদ্যার অন্তর্গত।

মানুষের নৈতিক চেতনা ও নৈতিক মানসিকতার সঙ্গে তার আচার-আচরণ ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। আমাদের যে আচরণ অনৈচ্ছিক বা non-voluntary তা নীতি-বিদ্যার আলোচনা বহির্ভূত। ঐচ্ছিক ক্রিয়া বা Voluntary action-ই নৈতিক মূল্যায়নের যোগ্য ; অতএব তা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। এই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ ও ধর্ম, ঐচ্ছিক ক্রিয়া ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মৌল প্রভেদ, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়, তার উৎস (Spring), প্রেষণা (motive), অভিপ্রায় (intention), এবং এই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূলে যে অভীপ্সা বা desire রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সম্যক আলোচনাও নীতিবিদ্যার অন্তর্ভূত।

আমরা যখন কোন কাজের নৈতিক বিচার করি তখন আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে এই নৈতিক বিচার করার যথাযোগ্য বৃত্তি বা faculty আমাদের আছে কিনা। এবং যদি সেই বৃত্তি থেকে থাকে তবে তার স্বরূপ কি, নৈতিক বিচারের কর্তা যে আমি (subject) তারই বা স্বরূপ কি এবং কাকে নীতিগত ভাবে বিচার করছি অর্থাৎ নৈতিক বিচারের বিষয় কি, এই প্রসঙ্গ নিয়েও তর্কশাস্ত্রসম্মত আলোচনার অবকাশ রয়েছে নীতিশাস্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে। এখানে একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নৈতিক বিচার করতে হলে তার মানদণ্ডের নির্ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই নৈতিক বিচারের মান-দণ্ডটি ছাড়া কোন কাজকেই ভালো অথবা মন্দ এই আখ্যায় আখ্যাত করা যায় না। নীতিবিদ্যাবিশারদদের মধ্যে কেউ কেউ বলবেন যে বিধি (law), কেউ বা বলবেন আমাদের জীবনের সুখ-শান্তি (pleasure-happiness) বা ঐ ধরনের মূল্য নির্ণায়ক মানকে নৈতিক মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। নীতিবিদ্যার কাজ হল এই সব বিভিন্ন মতের পর্যালোচনা করে কোন একটিকে গ্রহণ করা।

যখনই আমরা কোন বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে কোন একটি কাজকে আমাদের কর্তব্য বলে গ্রহণ করি অর্থাৎ কাজটি আমাদের করা উচিত বলে মনে করি তখনই সেই কাজটি করার জন্য আমাদের মধ্যে একধরনের বাধ্য-বাধকতাবোধ (obligation) দেখা দেয়। ঔচিত্য-অনৌচিত্য বোধের সঙ্গে এই বাধ্য-বাধকতা বোধের ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যা করা উচিত তা করার জন্য আমাদের মনের ভিতরে এক ধরনের বাধ্যবাধকতাবোধ জাগে, যা করা অনুচিত তা না করার জন্যেও আমাদের মন থেকে এক ধরনের নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ অনুচিত কাজ না করার জন্য আমাদের মধ্যে একধরনের বাধ্যতাবোধ দেখা দেয়। এই বাধ্যবাধকতাবোধের

ধারণাটি ছাড়া ঔচিত্য-অনৌচিত্যবোধের ধারণা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। আবার দায়িত্ব (responsibility), মর্যাদা (merit), প্রমুখ অন্যান্য ধারণাও আমাদের এই বাধ্যবাধকতাবোধের সঙ্গে যুক্ত। যা করা উচিত তা করার জন্য আমরা একধরনের দায়িত্ব মনে মনে বোধ করি এবং তা সম্পাদন করতে পারলে আমাদের নিজের চোখে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ; এ কথাটি অপরের পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অপরেও উচিত কাজ করলে আমরা তার কাজের অনুমোদন করি এবং তার কাজের নৈতিক মর্যাদাকে স্বীকার করি। অপরে অনুচিত কাজ করলে আমরা তার নিন্দা করি কেননা সে কাজের মধ্যে আমরা নৈতিক অপকর্ষ বা moral demerit প্রত্যক্ষ করি। অতএব এ সব তথ্য এবং তত্ত্বও নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। আমাদের কর্তব্যের ধারণা ও সে কর্তব্য পালনে আমাদের যে মনোগত প্রবৃত্তি বা ধর্ম (virtue), সেই কর্তব্যের অবহেলায় আমাদের যে ত্রুটি ঘটে (vice), এ সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাও নীতিবিদ্যায় স্থান পায়। এ ছাড়া আমরা যখন ভালো কাজ করি তখন মনে যে প্রীতির ভাব জাগে এবং মন্দ কাজ করলে মনে যে অস্বস্তি জাগে, এই সব মানসিক অবস্থাগুলিকে; নৈতিক মনোভাবকে moral sentiments বলা হয়েছে। নীতিবিদ্যায় আমরা এই সব নৈতিক মনোভাবের (moral sentiments) স্বরূপ নির্ণয় করি এবং এই নৈতিক মনোভাবের সঙ্গে নৈতিক বিচারের সম্পর্কটুকু সম্বন্ধেও আলোচনা করি।

এ ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানের মত নীতিবিদ্যায়ও আমরা কতকগুলি তত্ত্বকে স্বত: স্বীকৃত সত্য বলে স্বীকার করেছি। যেমন, মানুষের ব্যক্তিত্ব (personality), বিচার বুদ্ধি (reason), এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতা (Freedom of will); এগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করাও নীতিবিদ্যার কাজ। আবার নীতিবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিদ্যারও যে সম্বন্ধ আছে সে সম্বন্ধটুকুর কথা নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়ে থাকে। মনোবিদ্যা (Psychology), পরাবিদ্যা (metaphysics), সমাজবিদ্যা (sociology), রাষ্ট্র-বিদ্যা (political science) ও দর্শনের (philosophy) সঙ্গে নীতিবিদ্যার নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় যে ঐচ্ছিক ক্রিয়া তার প্রকৃতি ও স্বরূপ হল মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বাধীনতা, একদিকে যেমন নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় অন্যদিকে তারা আবার মনোবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়বস্তু। দর্শন ও পরাবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হ'ল (মানুষের সত্তা, মানুষের ইচ্ছার স্বরূপ ও স্বাধীনতা, মানুষের আত্মার অমরতা, ভগবানের অস্তিত্ব ও তাঁর স্বরূপ।) নীতিবিদ্যা আপন বিষয়

-বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়গুলির আলোচনাও করে। অতএব এই দিক থেকে নীতিবিদ্যার সাথে পরাবিদ্যার ও দর্শনের একটা সম্পর্ক আছে। নীতিবিদ্যায় আমরা ব্যক্তি মানুষের কাজ কর্মের মূল্যায়ন করি। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া এই নৈতিক মূল্যায়ন সম্ভবপর হয়না। অতএব ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধটুকুরও পরোক্ষ আলোচনা আমরা নীতিবিদ্যায় করে থাকি। আবার এই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধটুকু সমাজবিদ্যার আলোচনার বিষয় -বস্তু। অতএব সমাজবিদ্যার সঙ্গে নীতিবিদ্যার একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক। ব্যক্তির ও সমষ্টির সম্পর্কটুকু একদিকে যেমন নীতি-বিদ্যার আলোচনার বিষয় অন্যদিকে তা রাষ্ট্রবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়; কেননা রাষ্ট্রবিদ্যা ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধের আলোচনা করে। অতএব এই দিক থেকে রাষ্ট্রবিদ্যার সঙ্গে নীতিবিদ্যার সম্বন্ধের বিষয়টুকও নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

নীতিবিদ্যার লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা (End and utility of ethics)

নীতিবিদ্যার জ্ঞানগত বা তাত্ত্বিক দিক (theoretical) এবং ব্যবহারিক দিক (practical), এ দুটি দিকই রয়েছে। তাই আমাদের জীবনের পরমতম কল্যাণের (highest good) প্রকৃতি ও ধর্ম নির্ধারণ করাই শুধু মাত্র নীতি-বিদ্যার লক্ষ্য নয়; কোন্ পথে কিভাবে চললে সেই পরমতম কল্যাণের আদর্শকে আমরা জীবনে সত্য করে তুলতে পারব তার পথনির্দেশ করা ও নীতি-বিদ্যার কাজ। আমরা আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করি, ছোট ছোট নৈতিক আদর্শকে জীবনে সত্য করে তুলি, এক পরম নৈতিক আদর্শকে সত্য করে তোলার জন্য যত্নবান হই। এই আদর্শই হল আমাদের নৈতিক জীবনের পরমার্থ বা summum bonum ; এই পরমতম কল্যাণের আদর্শই আমাদের কর্তব্য এবং নৈতিক ধর্মের স্বরূপ নির্ধারণ করে দেয়। এই পরমতম কল্যাণের ধারণাটুকু নীতিবিদ্যা পাঠের ফলেই আমাদের মনে জাগ্রত হয়; আমাদের অন্ধবিশ্বাসগুলি দূরীভূত হয়। তার ফলেই আমাদের মনে যে নূতন নৈতিকবোধ সঞ্জাত হয় তা বিচার-বিবেচনা -প্রসূত। নীতিবিদ্যা পাঠের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়েছে যে এই বিদ্যা আয়ত্ত করার ফলে আমরা আমাদের নীতিসম্বন্ধীয় আদিম বিশ্বাসগুলিকে হারিয়ে ফেলি এবং এর ফলে আমাদের নৈতিক জীবনে ভারসাম্য ব্যাহত হয়। কিন্তু এই আপত্তির বিরুদ্ধে আমরা বলতে পারি যে অন্ধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তথাকথিত নৈতিক জীবন যাপন করার চেয়ে বিচার বুদ্ধির আলোক-দীপ্ত সৎ

জীবনযাপন করা বহুলাংশে শ্রেয়। নীতিবিদ্যা পাঠের ফলেই নৈতিক জীবনযাপনের জন্য যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন সেই অন্তর্দৃষ্টিটুকু আমরা লাভ করি। এই অন্তর্দৃষ্টিটুকু ছাড়া আমরা কোন উন্নত নৈতিক জীবনের অধিকারী হতে পারি না। অতএব এদিক থেকেও নীতিবিদ্যা পাঠের উপযোগিতাকে স্বীকার করতে হয়।

সদাচার করতে হলে সৎ আচরণ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার। মহামতি সক্রেতিস্ বলেছিলেন যে জ্ঞানই হলো ধর্ম : 'knowledge is virtue' নৈতিক ধর্ম পালন করতে হলে নীতিশাস্ত্রের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতএব নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকলে সদাচার কখনই সম্ভব হয় না।

নীতিবিদ্যাকে আমরা একধরনের পরাবিদ্যার মর্যাদা দিতে পারি। কেননা সমাজবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্যার আলোচ্য মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আচরণের ত্রুটি বিচ্যুতি গুলো নীতিবিদ্যা দেখিয়ে দেয়। নীতিবিদ্যা পাঠের ফলে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আচার ব্যবহার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে সব দোষ-ত্রুটি রয়ে গেছে সেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা আসে। প্রচলিত রীতিনীতি আচার ব্যবহারকে নৈতিক বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে নিতে পারি। যা চলছে সেটাই আমাদের কাছে সত্যরূপে গৃহীত হয় না; আমরা বাস্তবকে সকল মূল্যের নির্ণায়ক বলে আর ভুল করি না। নীতিকে, আদর্শকে আমরা খুঁজতে শিখি। যে ধর্মের মূলে নীতি নেই, যে রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলে নীতি নেই তা কুসংস্কার, উৎপীড়ন ও অনিষ্টের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। যে শিক্ষা-ব্যবস্থার পশ্চাতে নৈতিক আদর্শ নেই তা জ্ঞানের বিবর্ধন ঘটাতে পারে না। অতএব বলা চলে যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিকে এবং পর্যায়ে নীতিবিদ্যার সাহায্য একান্তরূপে প্রয়োজন। নীতিবিদ্যা পাঠে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপক ও সংস্কারমুক্ত হয়ে ওঠে; নৈতিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়। আমরা সংস্কার-মুক্ত, সুস্থ নৈতিক জীবনযাপন করতে পারি। এই প্রসঙ্গে নীতিবিদ Fowler বললেন: "Ethics is a living and fruitful subject which ever has been and ever will be fraught with the most important results to the hightest interest of mankind." অর্থাৎ নীতিবিদ্যা মানুষের মহত্তম স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষকে উন্নততর এবং সার্থক জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে; এর ফলে মানুষের ভাগ্যে যে নৈতিক সিদ্ধিলাভ ঘটে তা তার চরম এবং পরম স্বার্থের অনুকূল। নীতিশাস্ত্রবিদ William Lilbie

বললেন যে নীতিবিদ্যা পঠনপাঠনের ফলেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার হয়; আমাদের নৈতিক উদ্দেশ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব এদিক থেকেও নীতিবিদ্যা পঠন পাঠনের উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়। নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে শিক্ষক, রাজনীতিবিদ্, আইনবিদ্, ধর্মযাজক প্রমুখ চিন্তাজগতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কেউই আপন আপন কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারেন না। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা বলতে পারি যে নীতিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীতিবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা

নীতিবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার সম্বন্ধ—

(ক) মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা

(খ) নীতিবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা

(গ) নীতিবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্যা

(ঘ) নীতিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব

(ঙ) নীতিবিদ্যা ও পরাতত্ত্ব

(চ) নীতিবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীতিবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা

মানুষের বিরাট মানস আয়তনে নানান বিষয়ে নানান আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই সমস্যা উদ্দীপ্ত হয় প্রাকৃতিক পরিবেশে, বাইরের জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবানে। অর্থাৎ মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার বাইরের জগৎ তার মনে হাজারো রকমের প্রশ্ন তোলে, হাজারো সমস্যার সৃষ্টি করে। মানুষ নানান ধরনের বিজ্ঞান ও দর্শনে সেই সব সমস্যার সমাধানের প্রয়াস পেয়েছে। মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও নীতিবিদ্যা প্রমুখ শাস্ত্রে আমরা এইসব সমস্যার আলোচনা করেছি। অতএব দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে এবং ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে নীতিবিদ্যার একটা সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। কেননা যে মনে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে সেই মনেই নৈতিক প্রশ্ন জাগরূক হয়। মানুষের যে বুদ্ধি মনোবিদ্যার সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হয়, সেই বুদ্ধি নীতিবিদ্যারও প্রশ্নের সমাধান করে। তাছাড়া কর্মের দিক থেকেও আমরা যে সব কাজ করি, ধর্মানুষ্ঠান করি, যে সব সামাজিক আচরণ করি--তারা সবই আমাদের মনের সাধারণ ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়। অতএব আমরা নীতিবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যা বা বিজ্ঞানের সম্বন্ধটুকু নির্ণয় করার চেষ্টা করতে পারি। প্রথমেই Psychology ও Ethics, অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যার সম্বন্ধটুকু নির্ধারণ করার চেষ্টা করা যাক।

(ক) মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা

প্রথমেই বলা দরকার যে, Psychology বা মনোবিজ্ঞান হল একটি Positive Science বা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। মানুষের মনের সমগ্র অবস্থা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে মানব মনের সামগ্রিক প্রকৃতিটিকে অনুধাবন করাই হ'ল মনোবিদ্যার কাজ। মনোবিজ্ঞানে মনের তিনটি প্রধান অবস্থার কথা বলা হয়েছে : জ্ঞান (Cognition), অনুভূতি (Emotion) এবং উদ্যম বা ইচ্ছা (Conation)। মনের এই বিভিন্ন অবস্থা ও ক্রিয়াগুলির মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ ও আকস্মিক সম্বন্ধ রয়েছে তার আবিষ্কার করাই হল মনোবিজ্ঞানের

উদ্দেশ্য। ব্যক্তি মানুষকে কেন্দ্র করেই এই বিজ্ঞান প্রভূত অগ্রগতি লাভ করেছে। মানুষের স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য ও ব্যক্তিত্বকে মনোবিজ্ঞান পুরোপুরি স্বীকার করেছে। কেমন করে মানুষ চিন্তা করে, অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহার বিধি এবং মানুষের মনন ক্রিয়ার সঙ্গে তার ক্রিয়াকর্মের সম্বন্ধ—এগুলির সূত্র আবিষ্কার করতে চেয়েছে মনোবিজ্ঞান। ব্যক্তি মানুষকে কেন্দ্র ক'রে এই বিজ্ঞান আবর্তিত হলেও মানুষের সামগ্রিক চিন্তাধারার, তার অনুভূতি-প্রক্রিয়ার কতকগুলি সাধারণ বিধিবিধান, এগুলিও মনোবিজ্ঞান আবিষ্কার করতে চায়। অর্থাৎ আমরা যে চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার ব্যবহার ক'রে থাকি তা কোন্ পদ্ধতিতে কিভাবে কোন্ কোন্ নিয়মতন্ত্রের অনুসরণ ক'রে কাজ করে, এক কথায় তাদের উৎপত্তি ও ব্যবহারবিধি আবিষ্কার করাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের কাজ। ব্যক্তি মানুষের চিন্তার মধ্যে, তার ইচ্ছার মধ্যে, তার অনুভূতির মধ্যে সমগ্র মানব সমাজের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকরার সাধারণ সমন্বিত সূত্রটি (Principle of Universality) রয়েছে। তার আবিষ্কারও করতে চায় মনোবিজ্ঞান।

নীতিবিদ্যা মানুষের নৈতিক কাজ কর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে নেমে আসে মানুষের মনন-ভূমিতে। সব মূল্যায়নই তো মনকে আশ্রয় করে; নীতিবিদ্যা মূল্যায়ন করে মানুষের ব্যবহারের এবং সেই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃতির। সেই মূল্যায়ন আবার ঘটে কোন এক বিশেষ নৈতিক আদর্শের পটভূমিকায়। মানুষকে নৈতিক হতে হ'লে একদিকে যেমন তার মনন-শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি আবার তার ইচ্ছাও উদ্যমের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারও করা দরকার। অতএব যে চিন্তা, ইচ্ছা ও উদ্যমকে আমরা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলে জেনেছিলাম তারা নীতিবিদ্যারও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। তবে মানুষের মনন-প্রকৃতির অনুসন্ধান কার্য অনেক বেশী ব্যাপক। মনোবিজ্ঞান মানুষের ইচ্ছা ও উদ্যমের, অনুভূতি ও মননের স্বরূপ জানতে চায়। নীতিবিদ্যা জানতে চায় কোন্ আদর্শের অনুসারী হলে মানুষের জ্ঞান, তার ইচ্ছা ও উদ্যম একটি বিশেষ আদর্শ অনুযায়ী সার্থকতা লাভ করবে। মনোবিজ্ঞান মানব মনের স্বরূপ জানতে চায়, তার অনুসন্ধান বাস্তবাশ্রয়ী বা Positive। নীতিবিদ্যার অনুসন্ধান আদর্শাশ্রয়ী ও আদর্শ নির্দেশক বা Normative। নীতিবিদ্যা আদর্শকে নির্দেশ করে এবং সেই আদর্শের আলোকে মানুষের ব্যবহারের মান নির্দেশ করে। মনোবিজ্ঞান জ্ঞানাশ্রিত; মানবমনের ত্রিবিধ কর্মের (জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা) প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা মনোবিজ্ঞানের কাজ। অতএব বলা

চলে, (বিষয়বস্তুর দিক থেকে মনোবিজ্ঞান নীতিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর। সমগ্র মানব মনই হোল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়; নীতিবিদ্যা মূলত: মানুষের উদ্যম ও ইচ্ছার দিকেই বেশী দৃষ্টি দিচ্ছে।)

মানুষের নৈতিক ব্যবহার কিন্তু এক অর্থে জ্ঞানাশ্রয়ী; ভালোমন্দ বিচার ক'রে তবেই আমরা কর্মে অগ্রণী হই এবং এই নৈতিক বিচারের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি বা আবেগও এসে পড়ে। অতএব এদের আলোচনাও নীতিবিদ্যার অন্তর্ভূত। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, নৈতিক ভালোমন্দের আলোচনা বুদ্ধিগত হলেও এবং নৈতিক আচরণের সঙ্গে অনুভূতি বা আবেগের একটা আনুষঙ্গিক যোগ থাকলেও এসবের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তুর উপর নেই। নীতিবিদ্যা মূলত: মানুষের উদ্যম এবং ইচ্ছাকেই গ্রহণ করেছে তার আলোচ্য বিষয়বস্তু রূপে। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে মনোবিজ্ঞান নীতিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর।

পশ্চিম দেশের দার্শনিক বললেন, 'Man is not a moral Melchizedek' অর্থাৎ বলা হ'ল মানুষের নৈতিক আচরণ তার সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। মানুষ সামাজিক জীব বলেই অপরের সঙ্গে সামাজিক আচরণের বিধি-বিধানটিকে নির্দিষ্ট করবার জন্য নীতিবিদ্যা পঠন-পাঠনের প্রয়োজন হয়। আচরণের নৈতিকতা সামাজিক মানদণ্ডে বিচার্য। অতএব সামাজিক আচরণের বিচার-বিশ্লেষণও মনোবিদ্যায় করা হয়ে থাকে। নীতিবিদ্যা মানুষকে সামাজিক জীব রূপে দেখতে এবং দেখাতে চেষ্টা করে। মনোবিজ্ঞান মানুষকে দেখে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে তার প্রকৃতির বিচার করে। মানুষের আচরণের বিধি বিধান নির্ণয় এবং আদর্শকে নির্দেশ করা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা মানুষের মানস প্রকৃতিটিকে বুঝতে পারবো। আমরা বলতে পারি, এদিক থেকে নীতিবিদ্যা মনোবিজ্ঞানের কাছে ঋণী।

(খ) নীতিবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা (Ethics & Sociology).

মানুষ যে সমাজবদ্ধ জীব এই সত্যটিকে নীতিবিদ্যা এবং সমাজবিদ্যা এরা উভয়েই মেনে নিয়েছে। নীতিবিদ্যা মানুষের কর্মকে, মানুষের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়কে বিচার করে সামগ্রিক সামাজিক পটভূমিকায়। মানুষের সমস্ত নৈতিক সম্বন্ধই সমাজ জীবনের আওতায় আসে। পরস্পরের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের সম্বন্ধ বা Economic relation গড়ে তুলি। ব্যক্তি মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন, সংস্কৃতির প্রয়োজন, আনন্দ করার প্রয়োজন এমনকি বিলাস, ব্যসন ও ব্যভিচারের প্রয়োজন মেটাবার বিভিন্ন ধরনের

ব্যবস্থা সমাজ করেছে। সমাজবিদ্যা মানুষের সবটুকু আবিষ্কার করতে চায়। এইসব বিভিন্ন সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের ন্যায় কর্ম, অন্যায় কর্ম, মানুষের ধর্ম-সাধনা, ব্যবহারগত ত্রুটি বিচ্যুতি, এদের সম্যক্ বিবেচনার মধ্য দিয়েই সমাজ-বিদ্যা মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করে। সমাজবিদ্যা বলে যে ধর্ম সাধনার মধ্য দিয়ে আমরা যেমন মানুষের চরিত্রকে বুঝি, তেমনিধারা অধর্ম সাধনের মধ্য দিয়েও তার প্রকৃতিকে বোঝা যায়। সুতরাং মানুষকে বুঝতে হলে তার সর্ব-বিধ কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাকে বুঝতে হবে; শুধুমাত্র নৈতিক ব্যবহার বিধির আলোতে তাকে বিচার করা চলবে না। অতএব একথা বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজবিদ্যা নীতিবিদ্যার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করে। মানুষের বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টা তার নানান ধরনের সম্বন্ধ—এইসবের ভিতর দিয়ে সমাজবিদ্যা মানুষের স্বরূপটুকু বুঝতে চায়। সমাজবিদ্যা প্রকৃতি নির্দেশক, বস্তুনিষ্ঠ বা Positive বিজ্ঞান। সমাজ জীবনে যা ঘটে, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ যা করে তারই বিচার বিশ্লেষণ এবং আলোচনা সমাজবিদ্যার বিষয়; নীতিবিদ্যার পরিসর সঙ্কীর্ণতর হলেও তা আদর্শ নির্দেশক, আদর্শনিষ্ঠ বা Normative; মানুষের সকল কর্মেরই একটা নৈতিক তাৎপর্য আছে; আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধেরও একটা গভীরতর নৈতিক মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি। আমরা যে কাজই করি না কেন—তা ব্যবসা-বাণিজ্যই হোক, শিক্ষা-সংক্রান্তই হোক, এমন কি শুধুমাত্র আনন্দ পাবার জন্য আমরা যে সব কাজ করি তার মধ্যেও নৈতিক মূল্য নিহিত আছে। এই নৈতিক মূল্যের কথা কিন্তু সমাজবিদ্যা ভাবে না। অবশ্য সমাজ জীবনের আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজ-বিদ্যা হয়তো মূল্যের কথা চিন্তা করে, আদর্শের কথা চিন্তা করে, কিন্তু এই সব আলোচনা সমাজবিদ্যায় গৌণ।

অবশ্য আমরা আগেই বলেছি যে, নৈতিক আচরণ সমাজাশ্রিত। সমাজ ছাড়া, বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ ছাড়া, মানুষের নৈতিক জীবন স্ফুরিত হয় না। তাইতো নীতি শাস্ত্রবিদ Sidgwick তাঁর 'Methods of Ethics' গ্রন্থে বললেন যে মানুষের নীতিবুদ্ধি তার সামাজিক জীবন চর্যার ফল-শ্রুতি মাত্র। তাই তিনি নীতিবিদ্যাকে সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করে দিই: মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের আদর্শ যদি তার পরিবেশগত সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সমন্বিত না হয় অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যদি কোন আত্যন্তিক যোগ না থাকে, যদি তার সামাজিক সম্বন্ধ, তার সমাজের গতিবিধি এবং তার সামাজিক অবস্থা থেকে এই আদর্শ বিযুক্ত

হ'য়ে থাকে, তবে সে আদর্শ অর্থহীন হয়ে পড়বে। সমাজ এবং মানুষের কল্যাণের আদর্শের বিযুক্তি-তত্ত্ব একেবারেই দুর্বোধ্য। ['That it is a paradox to maintain that man's highest good is independent of his social relations, or of the constitution and condition of the community of which he forms a part.'] মানুষের এই নৈতিক আদর্শ এবং তার নৈতিক জীবন সমাজাশ্রিত হলেও তা পরিপূর্ণভাবে সমাজ জীবনের দান নয়। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা তার সামাজিক জীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার শক্তি রাখে, তার চেষ্টা, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশকে অনুকূল করে তোলে ; মানুষ সামাজিক বাধার সমুদ্র পার হয়ে যায় আপন ইচ্ছা শক্তির প্রেরণায়। এই ইচ্ছা শক্তিই হল মানুষের নৈতিক শক্তি। নীতিবিদ্যা মানুষের এই আন্তর শক্তিকে এই আভ্যন্তরীন চারিত্র -বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করে। সমাজবিদ্যা মানুষকে বিচার করে বাইরের দিক থেকে, তার আচার, প্রথা প্রভৃতির অনুসরণ ক'রে। সমাজবিদ্যা মানুষের আচার, প্রথা ও সামাজিক ব্যবহার বিধির আলোচনা করে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। কোন সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য কোন সামাজিক আদর্শ রূপায়ণের জন্য সমাজবিদ্যা মানুষের কাছে আবেদন করে না। নীতিবিদ্যার কিন্তু একটা দূরাশ্রিত প্রয়োগের দিক আছে যাকে পণ্ডিতজনা 'Practical Interest' আখ্যা দিয়েছেন। মানুষ যখন নৈতিক আদর্শের কথা জানতে পারে, নৈতিক আদর্শ ব্যবহার বিধির কথা বুঝতে পারে, তখন আপন অন্তরে সেই আদর্শকে রূপায়িত করার স্পষ্ট আহ্বান সে শুনতে পায় ; কিন্তু সমাজবিদ্যার এই ধরনের কোন আবেদন নেই।

(গ) নীতিবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি (Ethics and Politics)

রাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝি সামাজিক বিচার ও শাসনের কেন্দ্রীভূত সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থাটিকে। অর্থাৎ সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিচার, সমাজবদ্ধ জীবনের নিয়ন্ত্রণ করাই হল রাষ্ট্রনীতির কাজ। রাষ্ট্রনীতি তাই সমাজ নীতির অঙ্গীভূত, একথা বলা হয়েছে। সামাজিক বা রাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু, রাষ্ট্রনীতির আলোচনা এক হিসেবে সমাজবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভূত। মানুষের গোষ্ঠীজীবনের রীতিনীতি ও ব্যবহার বিধির আলোচনার ফলে আমরা রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিদ্যা ও নীতিবিদ্যাকে পেয়েছি। সামাজিক জীব মানুষই হ'ল এই তিনটি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু। নীতিবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি মানুষের আচার আচরণের বিচার করে, তার মান নির্দেশ করে। অর্থাৎ এই

দুটি বিদ্যা মান নির্দেশক, আদর্শের নির্ণয় ও এদের কাজ। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি মানুষকে বিচার করে রাষ্ট্র আইনের মাপকাঠিতে; নীতিবিদ্যা মানুষকে বিচার করে নৈতিক আইনের ও নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে। বহুলাংশে রাষ্ট্রনীতির ও নীতিবিদ্যার বিচারে একরূপতা থাকলেও এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে এই দুয়ের ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত বিপরীত হয়ে ওঠে। যা কিছু আইনসঙ্গত অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি অনুমোদিত, তা সর্বক্ষেত্রেই নৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নাও হতে পারে। কিন্তু নৈতিক আদর্শ সবসময়ই মানুষকে শুভ ও কল্যাণের পথে চালিত করে; মিথ্যার আশ্রয় নীতিবিদ কখনও নেন না। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিবিদ রাষ্ট্রের সাময়িক প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন না। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'—শ্রুত ও অশ্রুত বিভিন্ন স্বরগ্রামে উচ্চারিত এই উক্তিটি কোন কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ অনুমোদন করলেও নীতিবিদ্যা তাকে কোনদিন কোন অবস্থাতেই অনুমোদন করবে না। রাষ্ট্রনীতিবিদদের কেউ কেউ বলেন, উদ্দেশ্য সাধু হলে উপায় অসাধু হলেও দোষ নেই। কিন্তু যিনি নীতিবিদ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ, গান্ধীজীর মতো একাধারে জাতির জনক ও সত্যাশ্রয়ী নেতা, তিনি এই মতে সায় দেবেন না। স্বামী বিবেকানন্দের মত গান্ধীজীও বলেন, যে সত্যের জন্য সব কিছু ছাড়া গেলেও সত্যকে কোন কিছুর জন্যই ত্যাগ করা যায় না। এহল নীতিবিদের কথা, রাজনীতিবিদের কথা নয়। মুরহেড তাঁর 'Elements of Ethics' গ্রন্থে যেন স্বামীজির কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন, গান্ধীজীর কথারই অনুরণন তুলে বললেন যে, উপায় অসৎ হলে সে আচরণের আমরা নিন্দা করবই; সৎ উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়ে সেই অসদাচরণের সমর্থন করা যায় না। মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যার আশ্রয়-গ্রহণ করা নিন্দার্হ।

রাষ্ট্রবিদ্যার সঙ্গে নীতিবিদ্যার যে মৌল পার্থক্যটি রয়েছে, তা হল, রাষ্ট্রনীতি মানুষকে বাইরের দিক থেকে বিচার করে, তার ব্যবহারের, তার আচরণের ফলাফলটুকুই রাষ্ট্রনীতিবিদের কাছে প্রধান হয়ে উঠে। নীতিবিদ্যা বিচার করে মানুষের আন্তর বিশুদ্ধতাকে, তার অন্তরের ঐশ্বর্যকে। মানুষের শুভ বুদ্ধি তাকে যে কাজে প্রেরণা দেয় সে কাজ নীতিবিদ্যার অনুমোদিত। নীতিশাস্ত্র-অনুমোদিত হ'লেও সমাজ বা রাষ্ট্রের চোখে হয়তো সেই কাজ দণ্ডনীয় বলে গণ্য হতে পারে। যেমন, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন; তদানীন্তন রাষ্ট্র-শক্তি তাকে সত্যাগ্রহ করার জন্য বারবার শাস্তি দিয়েছে, জেলে পুরেছে। কিন্তু গান্ধীজীর শুভ প্রচেষ্টার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি কোথাও এই রাষ্ট্রীয় তিরস্কারের দ্বারা। রাষ্ট্র পশু শক্তি; তার সেনাবাহিনী, পুলিশ, আদালত

গান্ধীজীর শুভ বুদ্ধিকে, তাঁর কল্যাণ চেতনাকে কখনোই প্রভাবিত করতে পারে নি। বাইরে থেকে জোর করে ভয় দেখিয়ে সামাজিক মানুষের আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা রাষ্ট্রনীতির কাজ। রাষ্ট্র মানুষকে বাধ্য করে রাষ্ট্রের আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে। আর নৈতিক মানুষ নৈতিক আদর্শের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। সেখানে আইন-আদালতের জোর খাটে না। পার্লামেন্ট বা আইনসভাও সেখানে হৃতবল। নৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, ভলতেয়ার, রুশো, কার্ল-মার্কস ও গান্ধী তাঁদের সমসাময়িক রাষ্ট্রের আইন-কানুনকে, সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। তাদের এই অস্বীকৃতি নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলেই তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

রাষ্ট্রনীতি বা Politics হল বিবরণমূলক বা descriptive। রাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি হল বস্তু আশ্রয়ী বা Positive ; তাই একে Political Science বলা হয়েছে। আমরা জানি যে, নীতিবিদ্যা হল Normative বা আদর্শাশ্রয়ী; এই আদর্শকে আশ্রয় করতে হবে রাষ্ট্রনীতি কথিত বিধি-বিধানকে। যে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান নীতিকে আশ্রয় করে না, তা দীর্ঘকাল সমাজের কাছে গ্রহণ যোগ্য থাকে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রনীতি নৈতিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে, যে সমাজ ব্যবস্থা দিতে পারে, যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে পারে তা মানুষের কাছে গ্রহণ-যোগ্য। আবার একথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ-যোগ্য যে, সুষ্ঠু রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই ব্যক্তি মানুষের নৈতিক বিকাশটুকুও সম্ভব হয়। প্লেতো তাই এই ধরনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ রাষ্ট্রকে মানুষের নৈতিক জীবনের উজ্জীবক বললেন। প্লেতোর শিষ্য অ্যারিস্ততল গুরুর পদাঙ্ক অনসরণ করে বললেন যে, নীতিবিদ্যা হল রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভূত; কেননা নৈতিক মানুষের আধার হোল রাষ্ট্র ; তাই তাঁর মতে রাষ্ট্রনীতির মধ্যে নীতিবিদ্যার বিধৃত হ'য়ে থাকা উচিত।

(ঘ) নীতিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব (Ethics and Religion)

মঙ্গল সাধনাই হ'ল মানুষের সর্ববিধ কর্মের পরম ও চরম লক্ষ্য। কেউ কেউ বলেন, ঐহিক মঙ্গল সাধন অর্থাৎ এই জীবনের সর্ববিধ কর্মের দ্বারা আপন আপন মঙ্গল সাধন এবং অপরের মঙ্গল সাধনই আমাদেরর সর্বকর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত।অবশ্য কেউ কেউ এই নিজের কল্যাণ এবং আবার অন্য অনেকে অপরের কল্যাণ সাধনের ওপর জোর দিয়েছেন। এই ধরনের ঐহিক মঙ্গল সাধন করার কথা বলেছে নীতিবিদ্যা। এই কল্যাণ প্রচেষ্টা ইহজগতে ও জীবনে মানুষের

কল্যাণ সাধন করে। আবার আমাদের মধ্যে যারা পরলোকে বিশ্বাস করেন তাঁরা পারত্রিক মঙ্গলের কথা বলেন ; এঁদের মতে পরজগতেরও কল্যাণ সাধন করতে হবে। এই জীবনের পরেও জীবন আছে ; সেই জীবনের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে অর্থাৎ কারো কারো মতে এই জীবনে আমরা যা করি তার ফলভোগ পর জীবনেও করতে হয়। অতএব ঐহিক পুণ্য জীবন আনন্দময় পারত্রিক জীবনের ভিত্তি। এই পারত্রিক জীবনের বা পরবর্তী জীবনের কথা আমাদের বলে ধর্মতত্ত্ব। আমরা যে কাজ এই জীবনে করে থাকি নৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, তা কালক্রমে আমাদের বৃহত্তর জীবনাদর্শের দিকে নিয়ে যায় ; সেই জীবনাদর্শ ধর্মাশ্রিত। অধর্মের জীবনে, আমাদের এই ধর্মাশ্রয়ী নৈতিক সংগ্রামটুকু বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে আসে। ধর্মীয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য হল ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পণ : 'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তি ভূমিতে নৈতিক সংগ্রাম অপগত হয়। অতএব একথা বলা যায় যে, ধর্মের সঙ্গে নীতির একটা ঐকান্তিক যোগ আছে এবং যে পার্থক্যের কথা উপরে আমরা বলেছি সেটুকু থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটা গভীরতর ঐক্য রয়েছে। এমন কথা বড় বড় দার্শনিকেরা বলেছেন যে, মানুষের নিয়মবোধ তার ধর্ম-বোধ থেকেই জন্ম নেয়। Descartes এবং Paley এই ধরনের মত প্রচার করেছিলেন। ঈশ্বরই হোল নৈতিক আদর্শের উৎস। আর ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই হল ধর্ম। এই ধর্মেই মানুষের সমস্ত নৈতিক অগ্রগতির পরিসমাপ্তি ঘটে। আমরা নৈতিক জীবনে যে দায় দায়িত্ব বহন করি, তা যথাযথভাবে বহন করতে অপারগ হলে যে গ্লানি আমাদের আচ্ছন্ন করে, তার মূল কোথায় ? আমাদের অপরাধবোধ কোথা থেকে আসে এবং কার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয় ? এই সব প্রশ্ন সহজেই জাগে। দার্শনিক মার্টিন্যু (Martineau) বললেন যে, মানুষের এই দায়বোধ ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হয় ; কর্তব্য কর্মে অবহেলা করলে আমাদের মধ্যে যে অপরাধ বোধটুকু জাগে তা-ও সেই ভগবৎ অভিমুখী। আমরা ভগবানের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নৈতিক জীবন ধর্ম জীবনকে আশ্রয় করে তার শেষ পরিণতি হিসেবে।

যে ক্ষেত্রে ধর্ম নীতিবিরোধী হয়েছে সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে সে ধর্ম তার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে ; সে আর ধর্ম নয়, ধর্মের নামে 'বজ্জাতি'। আমরা যখন ধর্মের নামে কঠোর জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করেছি, সতীদাহ করেছি, তখন ধর্ম তার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। ধর্ম যদি

তার চরিত্র না হারায় তাহলে দার্শনিক কান্টের কথা উদ্ধৃত করে বলা যাবে যে, নীতিবিদ্যাই হোল ধর্মের সোপান। আমরা আমাদের নৈতিক জীবনে যেসব ভালো কাজ করি তার ফল লাভ করা বহুক্ষেত্রেই এ জীবনে ঘটে না। কেননা, সাধারণত: মানুষ এই জীবনে দু:খ পাচ্ছে, ভালো কাজ করেও কষ্টে কালাতিপাত করছে—এই দৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। যারা অসৎ লোক তারা জাগতিক সমৃদ্ধি, জাগতিক ঐশ্বর্য দু হাতে লুঠে নিচ্ছে—এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তবে মানুষ কোন্ ভরসায়, কার আশ্বাসে নৈতিক জীবন যাপন করবে? আমরা যদি আমাদের কৃত কর্মের যথাযথ ফল লাভ না করতে পারি তবে আমরা নীতিসম্মত আচরণ করব কেন? এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে। ধর্ম বলবে, এই জীবনের সব কর্মের দেনাপাওনার হিসেব এই জীবনেই চুকে যায় না; জন্মান্তর আছে এবং পর জন্মে মানুষ তার কৃত কর্মের ফল ভোগ করবে। এই জন্মজন্মান্তরের কৃত কর্মের হিসেব নিকেশের দিকে লক্ষ্য রাখেন স্বয়ং ভগবান। তিনি ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের তুলাদণ্ডে মানুষের পুরস্কার অথবা তিরস্কার দানের কর্তা। সকল কর্মের চূড়ান্ত হিসেব নিকেশের শেষে কর্ম সমাপ্তি ঘটলে তবেই ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে; সেই জীবন হ'ল ধর্মীয় জীবন; সেই জীবনে নৈতিক জীবন অবসান লাভ করে।

কাজেই বলা চলে যে, নীতি ও ধর্ম পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল; এরা অভিন্ন একথা বলা যায় না। নীতি ধর্মের স্থান নিতে পারে না। ধর্ম ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হবার কথা বলে; ধর্মের এই মৌল অংশটি অতীন্দ্রিয়। নীতির আদর্শে যদি শুভ বা কল্যাণের চরম এবং পরম ধারণাটি থেকে থাকে, যদি ভগবানের সঙ্গে তাকে একাত্ম করে দেখি, তাহলে ধর্মের পরম আশ্রয় ও নীতির পরমপুরুষ একাত্ম হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে বলা চলে যে ব্যবহারিক শুভ বা কল্যাণ নৈতিক বিদ্যার বিচার্য। অবশ্য নীতিবিদ্যার পরম কল্যাণের আদর্শকে ভগবানের থেকে পৃথক করে দেখা চলে না। যদি বলা হয় যে, নীতির আদর্শ হল এই কল্যাণের আদর্শ বা শুভ আদর্শ এবং ধর্মের আদর্শ সত্য, শিব ও সুন্দরের সমন্বয়, তাহলে আমরা ধর্মের সেই ব্যাপকতর চরিত্রটির সাক্ষাৎ পাই। অতএব সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, নীতি মানুষকে মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে সমাজ জীবনে। রবীন্দ্রনাথের কথা: 'যুক্ত করহে সবার সঙ্গে'—একথা হোল নৈতিক জীবন চর্চার কথা। আর নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মানুষের যে যোগ সেই যোগের কথা বলেছে ধর্ম। অতএব এদিক থেকে বিচার করলেও ধর্মকে নীতিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর বলতে হয়।

(ঙ) নীতিবিদ্যা ও পরাতত্ত্ব (Ethics and Metaphysics).

দর্শন বা পরাতত্ত্ব সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখে। দার্শনিক স্পিনোজা এই দেখাকে বলেছেন, 'Viewing things Sub-specie aeternitatis'। অর্থাৎ পরাতত্ত্ব জগৎ এবং জীবনের গভীরতম সমস্যাগুলির আলোচনা করে ; তাদের খণ্ড চরিত্রকে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিতে এদের পর্যবেক্ষণ করে। পরাতত্ত্ব এই সমগ্র দৃষ্টিতেই মানুষকে নিত্য-কালাশ্রয়ী আদর্শের ক্ষেত্রে বিচার করে। নৈতিক আদর্শ এই ধরনের একটি চিরন্তন মূল্যের নির্দেশ করে। সুতরাং কেউ কেউ বলেছেন যে, নীতিবিদ্যা বা Ethics হল পরাতত্ত্ব বা Metaphysics-এর অন্তর্ভূত একটি বিষয়। সত্য সত্যই নীতিবিদ্যায় আমরা যে আদর্শের আলোচনা করি তার সত্যতা বা Validity নির্ধারণ করে, তার স্বরূপ নির্ধারণ করে পরাতত্ত্ব বা Metaphysics। সর্বাশ্রয়ী নৈতিক আদর্শের স্বরূপ ও মূল্য বুঝতে হলে আমাদের চারপাশের জগৎ এবং জীবকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশ হিসেবে বিচার করতে হবে ; তাকে বিচার করতে হবে পরমেশ্বরের বা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত ক'রে। নীতিবিদ্যায় এমন কতকগুলি দার্শনিক প্রশ্ন আমরা আলোচনা করে থাকি যার যথাযথ সমাধান দার্শনিক আলোচনার সহায়তা ব্যতীত অসম্ভব। কয়েকটা এই ধরনের দর্শনাশ্রিত প্রশ্নের কথা আমরা বলেছি। প্রথমেই মনে হয় ব্যক্তিসত্তার আত্ম-বশ্যতার প্রশ্নটির কথা। আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে কে চালনা করে ? ইন্দ্রিয় না বিচার বুদ্ধি ? না উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় ব্যক্তি-সত্তা চলমান হয়। এটা দুরূহ প্রশ্ন। আবার মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে তার দায়িত্ব ও থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আমাদের কর্মের উৎস হিসেবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা এবং বিচার-বিবেচনা যথাযথভাবে কাজ না করলে সে কাজে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকে না। উত্তেজনার বশবর্তী হ'য়ে কোন কাজ করলে আইনের চোখে সেই কাজের পুরো দায়িত্বের ভার আমাদের ওপর বর্তায় না। এ সত্যটা আইনশাস্ত্রসম্মত। নীতিশাস্ত্রও এর পরিপোষক। অতএব নৈতিক জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উঠবে যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কিনা ? পরবর্তী প্রশ্ন উঠবে, ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে জাগতিক সম্বন্ধকে যুক্ত ক'রে। যদি জগৎ চালিত হয় মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তাহলে হয়তো আমরা বলতে পারি যে, নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যই এই জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। আর তা যদি না হয়, জগৎ যদি কতকগুলি অন্ধ শক্তির দ্বারা চালিত হয় তাহলে বিশ্বজগতের

এই চলমানতার কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না। এর পরে প্রশ্ন উঠবে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তি মানুষ কি কেবল মাত্র সমাজের মঙ্গলের কথা ভেবেই কাজ করবে? সমাজের স্বার্থ ছাড়া কি মানুষ আপন স্বার্থেও আত্মস্ফুরণ ঘটাতে পারবে? তারপরের প্রশ্ন হোল ভগবানের সঙ্গে নৈতিক আদর্শের কি সম্বন্ধ? নৈতিক আদর্শের বাস্তবায়িত মহিমাময় রূপই কি হল ভগবানের রূপ? ভগবান কি নৈতিক আদর্শের পরিপূর্ণ প্রকাশ? এইসব কঠিন সমস্যার আলোচনা আমরা পাই পরাতত্ত্ব বা Metaphysics-এর মধ্যে। সুতরাং নীতিবিদ্যার সার্থক আলোচনা সর্বাঙ্গীণ আলোচনা Metaphysics বা পরাতত্ত্বকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। নীতিবিদ্যা দর্শন বা পরাতত্ত্বের উপর কোন না কোন ভাবে নির্ভরশীল। তবে তারা অভিন্ন নয়; তাদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। পরাতত্ত্ব বা দর্শন নীতিবিদ্যার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক। কেননা, দর্শন শাস্ত্রের বিষয়বস্তু অনেক বড়। নীতিবিদ্যা কেবলমাত্র মানুষের আচরণ ও তার আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে। অবশ্য এই আদর্শের আলোচনা অর্থাৎ আদর্শতত্ত্ব (axiology) দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভূত। নীতিবিদ্যা কল্যাণের আদর্শটুকুর কথা ভাবে। দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে সত্য, শিব এবং সুন্দরের আদর্শের কথা আলোচিত হয়। প্রয়োজন বিশেষে তাদের স্বাঙ্গীকরণ ঘটায়। দর্শনশাস্ত্র এইভাবেই বৃহত্তর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বুদ্ধির জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করে, প্রশমিত করে। দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়োগের দায়িত্ব দার্শনিকের নেই। নীতিবিদ্যার বিধিবিধান ভিন্নরূপ। নীতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে পাঠকের ব্যবহারিক জীবনের ওপর সেই অর্জিত নীতিবিদ্যার প্রভাব পড়ে। কাজে কাজেই নীতিশাস্ত্রের প্রয়োগের দিকটিকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

(চ) নীতিবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র (Ethics and Economics)

আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানান প্রয়োজন রয়েছে; সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা নানান বস্তু আহরণ এবং সঞ্চয় করি। অর্থশাস্ত্র হল মানুষের অভাব দূর ক'রে এমনি সব বস্তুর আহরণ এবং সঞ্চয়ের বিজ্ঞান। এবং সবটাই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অভাব মিটিয়ে আমাদের কল্যাণ সাধনের প্রয়াস পায়। এইসব অভাব পূরণ মানুষের আপেক্ষিক কল্যাণ সাধন করে। আর নীতিবিদ্যা মানুষের পরমার্থ (Highest good) নিয়ে আলোচনা করে; অর্থশাস্ত্র মানুষের আপেক্ষিক কল্যাণ-কারক; নীতিবিদ্যা সৎ চিন্তা ও কর্মের পরমার্থ নিয়ে আলোচনা করে ব'লে তা হোল নৈতিক মূল্যের পরমতম প্রকাশ।

অর্থশাস্ত্র আপেক্ষিক কল্যাণের কথা আলোচনা করে ; তার মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি রয়েছে। এগুলির প্রয়োজন আমাদের জৈবিক সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ; সেই সত্তাটুকু অক্ষত এবং সুস্থ না থাকলে মানুষের নৈতিক মূল্য বোধের বিকাশই তো সম্ভব হয় না। কাজে কাজেই বলা চলে যে, অর্থশাস্ত্র মানুষের নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণের সোপান মাত্র। অর্থশাস্ত্র হল ধনৈশ্বর্যের বিজ্ঞান, ধনের সুষম বন্টনের ফলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয় ; মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা-কৃষ্টির অগ্রগতি এই ধন-বণ্টন সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যা কিছু প্রেয় বলে গ্রহণ করে থাকি, শ্রেয়ের মর্যাদায় তাকে নৈতিক মূল্যে মূল্যবান ক'রে তোলার জন্য নীতিবিদ্যার প্রয়োজন। ঐশ্বর্যকে যদি আমরা নীতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করতে পারি তবে তার ফল শুভ হয় না। অর্থই অনর্থের মূল হয়ে উঠে। কাজে কাজেই অর্থশক্তিকে নৈতিক নিয়ন্ত্রিণের দ্বারা শুভফলপ্রসূ করে তুলতে হবে। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রকে নীতিবিদ্যার বিধিবিধান মেনে অগ্রসর হতে হবে। শুভ লক্ষণ হল এই যে, এযুগে অর্থশাস্ত্র নীতিবিদ্যার সার্বিক কল্যাণের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়ে ধনকে, ঐশ্বর্যকে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কর্মে আংশিকভাবে নিযুক্ত করছে। মানুষের সামাজিক কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে অর্থশাস্ত্র নীতিবিদ্যাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। অর্থাৎ নৈতিক বিচার বিবেচনা ধন বণ্টন, ঐশ্বর্যের ব্যবহার প্রভৃতির চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। অতএব একথা বলা যায় যে উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অবশ্য এই ঘনিষ্ঠতার কথা মনে রেখে আমরা এই দুটি বিদ্যার মধ্যেকার মৌল পার্থক্য-টুকুকে যেন অস্বীকার না করি। পূর্বেই বলেছি যে, অর্থশাস্ত্র দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। ধনের বণ্টন, উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে অর্থশাস্ত্র। তাই তাকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বা Positive Science বলা হয়। নীতিবিদ্যা কিন্তু আদর্শাশ্রয়ী অর্থাৎ Normative। নীতিবিদ্যা বলে সেই আদর্শের কথা যে আদর্শ দেশের ঐশ্বর্যের উৎপাদন, বণ্টন এবং ব্যবহার সম্বন্ধে নীতিসম্মত নির্দেশ দেয়।

জাতির সম্পদ ও ঐশ্বর্য, তার ধন দৌলত এইসব নিয়েই অর্থবিদ্যা আলোচনা করে। নীতিবিদ্যা মানুষের নৈতিক ভালোমন্দের বিচার করে। অতএব একথা বলা যায় যে ঐশ্বর্যের পশুশক্তিটাকে মানুষের নৈতিক কল্যাণের নিয়ন্ত্রণাধীন করে তুলতে হবে। তা যদি না করা যায় তবে মানুষের ঐশ্বর্যের কালোবাজারটা তার মূল্যের জগতটাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবে। ধনের ব্যবহার, ঐশ্বর্যের ভোগ এসবই নীতিবোধের দ্বারা, ধর্মবোধের দ্বারা নিয়ন-

ন্ত্রিত হবে। উপনিষদে যখন 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' মন্ত্রের কথা বলে তখন একথাই বলা হয় যে, ধনের উপভোগ, ঐশ্বর্যের ব্যবহার এসবই ত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ মানুষের নৈতিক মূল্য বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

ব্যক্তি মানুষের নৈতিক অধিকারের ধারণা থেকে তার সম্পত্তির অধিকার, তার ব্যক্তি জীবনের নানান অধিকারের উৎপত্তি ঘটেছে। ব্যক্তিত্বের ধারণার সঙ্গে সম্পত্তির ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মানুষের ব্যক্তিত্বের ধারণার সঙ্গে যে নৈতিক অধিকারের ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সেই ধারণা থেকেই মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের ধারণা জন্ম নিয়েছে। তাই একথা বলা চলে যে, অর্থশাস্ত্র নীতিবিদ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থশাস্ত্র নীতিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া—নীতিবিদ্যার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি—ঐচ্ছিক ক্রিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, সাহজিক ক্রিয়া, ভাবজক্রিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ—উচ্ছ্বাস—পরাবর্তক ক্রিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণশীল ক্রিয়া, আকস্মিক ক্রিয়া, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ—অভীপ্সার দ্বন্দ্ব—লক্ষ্য ও প্রেষণা, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত—প্রেষণার অন্তর্দ্বন্দ্ব—এসবই মানসিক স্তর—দৈহিক পর্যায়—অভাব, ক্ষুধা এবং অভীপ্সা—ব্যক্তির চরিত্র ও অভীপ্সা—অভীপ্সা, অভিলাষ ও প্রতিজ্ঞা—প্রেষণার স্বরূপ—প্রেষণা ও অভিপ্রায়—সুখ ও প্রেষণা—যুক্তি ও প্রেষণা—অভ্যাস, আচরণ, সঙ্কল্প ও চরিত্র ।।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া

নীতিবিদ্যার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি

নীতিবিদ্যার আলোচনার সূত্রপাতে এই প্রশ্ন করার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, মানুষের অজস্র, সহস্রবিধ কর্মধারার কোন্ বিশেষ ধারাটিকে নৈতিক আখ্যা দিতে পারি? সহজ ভাষায় কোন্ কাজটিকে নৈতিক বলব এবং কোন্ কাজটিকে অনৈতিক বলব? গোড়াতেই আমরা বলে রাখি, নৈতিক বলতে আমরা মানুষের সেই সব কাজকেই বুঝবো যে কাজে আমরা নীতিসম্মত কোন গুণ (ভালো অথবা মন্দ) প্রত্যক্ষ করে থাকি। আমরা Non-Moral শব্দটির জন্য নৈতিকেতর' শব্দটি ব্যবহার করব। এমন অনেক কাজ মানুষ করে যার বিচারে নৈতিক ও অনৈতিকের প্রশ্নটি অতিরিক্ত এবং অবান্তর হয়ে পড়ে। যেসব দুষ্কর্ম প্রকৃতি করে থাকে, (যেমন ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতিতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়) তাকে আমরা কি বলব? একে কি আমরা ভালো বা মন্দ—এই ধরনের আখ্যায় আখ্যাত করতে পারি? বোধহয় পারি না। কুকুরে যদি কামড়ে দেয়, পথ চলা গরুতে যদি গুঁতিয়ে দেয়, তবে এসব কাজকে কি আমরা ভালো মন্দের আওতায় আনতে পারি? কই, আমরা তো তা আনি না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যেসব কাজ করে তা কি নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় পড়ে? কই, আমরা শিশুদের কাজকর্মের বেলায় কোন নৈতিক মূল্যায়ন করি না তো! যেসব হতভাগ্য মানুষের নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটলো না, যাদের Idoit বলা হয়ে থাকে, তাদের কাজেরও আমরা ভালোমন্দ বিচার করি না। যারা পাগোল, উন্মত্ত তাদের কাজেরও আমরা নৈতিক মূল্যায়ন করি না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নৈতিক মূল্যায়নের উপযুক্ত কি না তার বিচার বিবেচনা করার জন্যও একধরনের সর্ত আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ সকলের কাজ যে নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে না, এই সত্যটিকে আমরা মেনে নিয়েছি। এটা মেনে নিয়ে আমরা বিচার করে বুঝেছি যে কার কাজ, কি ধরনের কাজ, এই নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে, আর কোন্ কাজকেই বা ভালো অথবা মন্দ এই আখ্যায় আখ্যাত করব। পণ্ডিতজনা বলেছেন যে, মানুষের ঐচ্ছিক

ক্রিয়া, মানুষের অভ্যাসগত ক্রিয়া, এই ধরনের কাজ নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে। এক্ষেত্রে মানুষ বলতে আমরা সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে বুঝেছি। আবার এই সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ যদি স্বেচ্ছায় কাজ না করে তবে সে কাজ নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে না। অপরের ইচ্ছায় আমরা যদি কাজ করি তবে সে কাজ নৈতিক মূল্যের আওতার বাইরে থাকবে। এই ধরনের কাজকে আমরা নৈতিকেতর বা Non-Moral বলব। সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরা যেসব অনৈচ্ছিক (Non-Voluntary) ক্রিয়া করে সেগুলিও নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে না। যেমন আমাদের সাহজিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া (Instinctive actions), ভাবজক্রিয়া (Ideo-motor action) স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া বা Spontaneous action, স্বতঃ-স্ফূর্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস—এসবই নৈতিকেতর বা Non-Moral। এছাড়া পরাবর্তক ক্রিয়াকেও (Reflex action) নৈতিকেতর বা Non-moral বলা হয়েছে। নৈতিকক্রিয়া হোল সুস্থ, স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐচ্ছিক এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম। মানুষ যখন কর্মের সম্ভাব্য ফলের প্রত্যাশাটুকু কল্পনা করতে পারে, এই ধরনের কল্পিত লক্ষ্যে পেঁছুবার উপায় যখন সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তখন তার অনুসৃত কর্মপদ্ধতি এবং ক্রিয়াকর্ম এসবই নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে। অর্থাৎ এককথায় আমরা স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে যেসব কাজ কর্ম করি সেগুলিরই কেবলমাত্র নৈতিক মূল্যায়ন করা চলবে।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবগত ক্রিয়া অর্থাৎ যে কাজগুলি আমরা আমাদের অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করেছি এবং যে কাজগুলির উপর বর্তমানে আমাদের আর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই সেই ধরনের কাজগুলিকে কি আমরা নৈতিক বা নৈতিকেতর এই আখ্যা দিতে পারি? শরৎচন্দ্রের দেবদাস যখন বলে, 'আমি মদ খাই না, মদই আমাকে খায়', সে ক্ষেত্রে আমরা কি দেবদাসের কৃত-কর্মের জন্য তাকে দায়ী করতে পারি? এখানে দেবদাসের বক্তব্য এই যে দেবদাস যখন মদ্য পান করে তখন সে হয়তো অনেক সময় অভ্যাসবশত আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মদ্যপান করে। আমরা কি দেবদাসের এই ধরনের স্বভাব-গত কর্মকে নৈতিক বলবো? এখানে বলা চলে যে এই ধরণের স্বভাবগত কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন করা চলবে। কেননা, আমরা আমাদের অভ্যাস স্বেচ্ছায় গড়ে তুলি। সব অভ্যাসের একটা সূত্রপাত আছে, সুরু আছে। সেই সুরু বা সূত্রপাত আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আপন আপন নিয়ন্ত্রণ বশেই কাজ করে। অতএব অভ্যাসগত কর্মের দায়িত্ব আমাদেরই। অভ্যাসগত কর্মের তাই ভালোমন্দ বিচার করা হয়। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আমরা

একান্ত প্রয়াসের দ্বারা, একনিষ্ঠ চেষ্টার দ্বারা এই ধরনের অভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটাতে পারি। অতএব সেই ধরনের চেষ্টা না করে অভ্যাসগত কর্মে যদি গা ভাসিয়ে দিই তবে নিশ্চয়ই এই ধরনের কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করা সঙ্গত হবে। অবশ্য অভ্যাসগত কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করা গেলেও স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণশীল ক্রিয়ার নৈতিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। স্বতঃস্ফূর্ত বা অনায়াস অনুকরণশীল ক্রিয়ার (Automatic imitative action) উদাহরণ হ'ল অপরের হাসির অনুকরণ ক'রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাস্য করা। এ কাজ অনৈতিক বা নৈতিকেতর। তাহলে সংক্ষেপে বলা চলে যে আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব কাজ করি তা হ'ল ঐচ্ছিক ক্রিয়া; এই ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় একদিকে যেমন আমরা কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকি ঠিক তেমনি আমরা কী উপায়ে সেই কাজটুকু সম্পন্ন করব সে সম্বন্ধেও আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে। এই ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পাদনে আমাদের পূর্ণ দায়িত্ব থাকে। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রকৃতি এবং ধর্ম সম্যক অনুধাবন করতে পারলে অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুধাবন করা কঠিন হ'বে না। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বা non-voluntary action নৈতিক মূল্যায়নের আওতার বাইরে। এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি (ক) অচেতন পদার্থের ক্রিয়াকে (action of Inanimate Object) (খ) স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকে (Spontaneous action) (গ) পরাবর্তক ক্রিয়াকে (Reflex Action) (ঘ) স্বভাবজ বা সাহজিক ক্রিয়াকে ((Instinctive action) (ঙ) অনায়াস অনুকরণ ক্রিয়াকে (Automatic imitative action) এবং আকস্মিক ক্রিয়াকে (accidental action)।

• অচেতন পদার্থের ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে (যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, তুষারপাত প্রভৃতি ক্রিয়াকে, যেমন, গাছের ডাল ভেঙ্গে মানুষ চাপা প'ড়ে মারা গেল।) এই ধরণের কাজের কোন নৈতিক গুণাগুণ নেই। স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার ও কোন নৈতিক গুণাগুণ নেই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাত-পা ছোঁড়া, লাফানো ঝাঁপানো বা বয়স্ক লোকরা আড়মোড়া ভাঙ্গার সময় যে হাত ছোড়েন, তার ফলে যদি কারো গায়ে আঘাত লাগে তবে সে আঘাতের নৈতিক বিচার চলে না। তেমনি ধারা পরাবর্তক ক্রিয়াও নৈতিক মূল্যায়নের বাইরে। কোন উদ্দীপকের সামনে হঠাৎ আমাদের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটুকু দেখা দেয় তার নৈতিক বিচার চলে না। আমার চোখের সামনে হঠাৎ কেউ হাত নাড়লে আমি যদি আমার মাথাটা পিছিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত দিয়ে তার হাতে আঘাত ক'রে বসি তবে আমাকে আমার কাজের জন্য দোষ

দেওয়া চলবে না। কেননা পরাবর্তক ক্রিয়ার পিছনে আমার কোন সজ্ঞান প্রয়াস কাজ করে নি। স্বভাবজ কাজকে ও নৈতিক মূল্যায়নের আওতার বাইরে রাখা হয়। স্বভাবজ কাজকে কেউ কেউ আবার সাহজিক ক্রিয়া এই আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া স্বত:স্ফূর্ত অনুকরণশীল ক্রিয়া (Automatic imitativc aetion), আকস্মিক ক্রিয়া (Accidental action), উন্মাদ লোকের কাজ কর্ম (Works of madmen), শিশুর কাজকর্ম (Works of a child) এবং সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ভাবজ ক্রিয়া বা Ideo-moter action --এরা সবাই নৈতিক মূল্যায়ন -বহির্ভূত।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া বা Voluntary Action

আমরা যখন আমাদের অভিপ্রেত লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সুপরিকল্পিত রূপে নির্দিষ্ট কর্ম পন্থাকে আশ্রয় করি তখন আমাদের কাজকর্মকে ঐচ্ছিক ক্রিয়াকর্ম বা Voluntary Action বলা হয়। এই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তর বা পর্যায় লক্ষনীয়—(ক) মানসিক স্তর (খ) দৈহিক স্তর ও (গ) পরিণতির স্তর। প্রথমে আমরা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করব। একথা মনস্তত্ত্ব স্বাকার করে যে কর্মের মূলেই মানুষের একটা অভাববোধ কাজ করে। হয়তো বহুক্ষেত্রে এই অভাববোধ বস্তুগত নয়; তা' হ'ল আদর্শগত। বহুক্ষেত্রেই মানুষের Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তি তাকে কর্মে প্রণোদিত করে। একে আমরা এক ধরনের ক্ষুধা বলতে পারি। মহৎ কর্মের পিছনে মহৎ ক্ষুধা থাকে, ক্ষুদ্র কর্মের পিছনে ক্ষুদ্র ক্ষুধা, তুচ্ছ ক্ষুধার অস্তিত্ব বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের জন্ম-কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে আদি কবি বাল্মীকির মহৎ ক্ষুধার কথা বলেছেন। এই মহৎ ক্ষুধার তাড়নায় যে সৃষ্টি হয়, তা মহৎ সৃষ্টি। এই ক্ষুধা, এই চাওয়া, এ বুদ্ধিগত, নীতিগত অথবা অন্য তত্ত্বগত হতে পারে। তবে আমাদের একথা মনে রাখা দরকার যে, এই ক্ষুধা বা অভাববোধ সব সময়ই বেদনা-দায়ক। এই বেদনার নিরসন, এই শূণ্যতার অবসান ঘটানো মানস প্রকৃতির ধর্ম। শূণ্যতার বেদনাকে পূর্ণতার তৃপ্তি দিয়ে সম্পূর্ণ করাই হ'ল মনের কাজ। এখানে মানস-প্রকৃতির সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির মিল রয়েছে।

মানুষের অভাব বোধের বেদনা থেকেই আসে বস্তু সঞ্চয়ের একটা ইচ্ছা; একে অভীপ্সা বলাই ভালো। এই অভীপ্সা কিন্তু জৈবিক ক্ষুধার মত অন্ধ নয়; এর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। আত্ম-সচেতনতার দ্বারা এই অভীপ্সা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে। এই অভীপ্সাকে সজ্ঞান অভীপ্সা বা conscious

desire বলা যেতে পারে। আমরা জানি যে উপায় এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা, আমাদের ইচ্ছাকে, আমাদের কাজকে নৈতিক মূল্যায়নের যোগ্য করে তোলে। আমরা আমাদের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করি; যোগ্য বস্তুর সন্ধান ক'রে সেটিকে লাভ করতে পারলে এই ইচ্ছা পূরণ সম্ভব হয়। অবশ্য এই ইচ্ছা পূরণের পূর্বেই হয়ত কতকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী অভীপ্সা বা desire মনের মধ্যে আত্ম কলহে লিপ্ত হয়। উদাহরণ দিই, হাতে কিছু অর্থ হঠাৎ এসে গেল; মন ব'লল, পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা কর; মন তখুনি আবার উল্টো গাইল যে, না পাঠাগার নয়, ধর্মসভা বসাও। একটু পরে আবার মন বলল যে, না হাসপাতাল কর।

অভীপ্সার দ্বন্দ্ব—conflict of desires এমনি করে শুরু হয়ে গেল। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করা সহজ সাধ্য নয়; এই দ্বন্দ্ব মিটতে সময় লাগে।

বিভিন্ন প্রেষণা বা Motive-এর দ্বারা চালিত হলে আমাদের কাজকর্ম জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। মন নোঙরহীন নৌকার মত এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে; নানান অভাব একসঙ্গে ভিড় করে আসে; সবাই বলে 'আমাদের দাবী মানতে হবে; অভাব পূরণ করতে হবে'। এই বিপরীতধর্মী প্রেষণা অনেক সময়ই একে অপরের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে; বিভিন্ন প্রেষণার অন্তর্দ্বন্দ্ব মনকে বিশৃঙ্খল করে তোলে। কেননা সব লক্ষ্যই তো একই সঙ্গে প্রাধান্য পায় না। বিভিন্ন প্রেষণার প্রেরণায় আমরা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি; তবে একই সঙ্গে সব কাজ করা চলে না। একটি প্রেষণা-অনুপ্রাণিত কর্ম পদ্ধতিকে গ্রহণ ক'রে অন্যগুলিকে বর্জন করতে হয়। যখন এই ধরনের প্রেষণার লড়াই অর্থাৎ Conflict of Motives চলে তখন মানুষের মানস সত্তার মধ্যেই বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। মানুষের মন তার আপন মানস প্রবণতার সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু এই প্রেষণার অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conflict of Motives) কথাটা বোধহয় খুব বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা ইচ্ছার লড়াইকে (বা Conflict of desires) স্বীকার করলেও Conflict of Motives বা প্রেষণার লড়াইকে স্বীকার করেন নি।

প্রেষণার দ্বন্দ্ব যখন মনের মধ্যে চলে তখন মন সম্পূর্ণ রূপে নিস্পৃহ এবং ক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে। মন তখন ভাবে বিভিন্ন প্রেষণা যেসব ক্রিয়া পদ্ধতির কথা বলেছে তার মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণ যোগ্য এবং সঙ্গত। মন তখন বিচার করে মনের তুলাদণ্ডে এবং সম্ভাব্য সবগুলি পন্থার আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করে; মনের এই অবস্থাকে বলা হয় বিবেচনার অবস্থা বা Deliberation। আমাদের মনে একই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে যেসব প্রস্তাব

ওঠে তার সবগুলিরই বিচার বিবেচনা আমরা মনে মনে করি। এই বিচার-বিবেচনার ফলশ্রুতি হল একটি বিশেষ ধরনের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া বা গ্রহণ করা। সামগ্রিক ভাবে এই প্রেষণা বা Motive-এর সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে উঠি। তখন একে অভিপ্রায় বা Intention বলা হয়। প্রেষণায় লক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'বে, কী তার ফলাফল হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচার থাকে না। এগুলি সবই থাকে Intention বা অভিপ্রায়ের মধ্যে। এই অভিপ্রায়টুকুকে জানতে পারলে কাজের আন্তর দিকটা অর্থাৎ ভিতরের দিকটা সম্পূর্ণ রূপে জানা হয়। কোন কাজ করার পূর্বে যে সিদ্ধান্তটুকু আমাদের নিতে হয় তার মূলে এই অভি-প্রায়ের উপযোগিতা খুবই বেশী। অভিপ্রায় থেকে যে সংকল্পিত কর্ম নিঃসৃত হয় তা হ'ল মানুষের আচরণ বা conduct ; এই আচরণেই ব্যক্তির চরিত্র সম্যকরূপে প্রকাশ পায়। সেই অভিপ্রায় বা Intention-কে নির্বাচিত ক'রে নিয়ে কাজে হাত দিতে চাই ; তখন একে বলা হয় নির্বাচন বা choice ; অনেকে একে decision বা সংকল্প গ্রহণ আখ্যাও দিয়েছেন ; কাজটা করতে গিয়ে কি উপায়ে কাজ করা হবে সে সম্বন্ধে ও আমরা সিদ্ধান্ত নিই। আমরা যখন একটি প্রেষণা বা Motive কে গ্রহণ করি এবং অন্যান্য প্রেষণা বা Motive গুলিকে বর্জন করি তখন ওই নির্বাচিত প্রেষণা সোজা জোরদার হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য প্রেষণা বা Motive গুলি অবচেতন মনের তলায় তলিয়ে যায়। বহু ক্ষেত্রে এই একটি Motive বা প্রেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে এর রূপান্তর ঘটিয়ে আমরা একটি বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। ইচ্ছা পূরণের জন্য তৎ-ক্ষণাৎ কাজে লেগে না গিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে আরো কিছুদিন বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি। এই যে ইচ্ছাটা পূরণ করব বলে স্থির করেছি সেই স্থিরনিশ্চয় সংকল্পকে কোন কোন নীতিশাস্ত্রবিদ্ আবার Resolution আখ্যা দিয়েছেন। যদি নির্বাচিত অভিপ্রায়কে (Intention) তখনই কাজের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা না করি, তাহলে সেক্ষেত্রে এই Resolution বা সিদ্ধান্তের প্রয়োজন থাকে।

তাহলে সংক্ষেপে আমরা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরটিকে বিশ্লেষণ ক'রে বলতে পারি যে, অভাববোধ (feeling of want), লক্ষ্য ও প্রেষণা, (End and Motive) অভীপ্সা (Desire) অভীপ্সা-বিরোধিতা (conflict of desires) বিবেচনা (deliberation) এবং সিদ্ধান্ত (Decision) সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারলে তবেই আমরা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরটুকু সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করতে পারব। আমাদের অভাববোধের বেদনার মধ্যে

বাস্তব অভাববোধ এবং কাল্পনিক অভাববোধ—এদুটোই কাজ করে। বর্ত-মানের অভাব এবং ভবিষ্যতের কল্পিত অভাব, এরা আমাদের সাধারণত: কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। শীত পড়ার আগেই আমরা লেপ তৈরী করার জন্য অর্থের সঞ্চয় করি। আবার শীত পড়ে গেছে, শীতে কষ্ট পাচ্ছি ; সেই কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য লেপ কিনতে চাঁদনীচকে যাই। এ হ'ল বর্তমানের অভাবের নমুনা। আবার অন্যোর অভাব দূর করার জন্যও আমরা কাজ করি। অপরের অভাবকে নিজের অভাব ব'লে ভাবতে পারলে তখনই কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়। অভাববোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অভাব কী ক'রে দূর করা যায় সেই চিন্তা মাথায় আসে ; এ চিন্তা হ'ল প্রেষণা বা Motive এবং এই চিন্তা যে বস্তুটিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয় তা হল লক্ষ্য বা End ; আমি যখন আমাশয় রোগাক্রান্ত হ'য়ে chlorostep ওষুধ সংগ্রহ ক'রে রোগ নিবৃত্তির কথা ভাবি, তখন এই চিন্তাটি হ'ল Motive বা প্রেষণা ; chlorostep ওষুধটা হ'ল আমার লক্ষ্য বা End।

অসুস্থ হ'য়ে যে বস্তুটি পাবার জন্য মনের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করি সেটি হল ঐ chlorostep ওষুধ ; যতক্ষণ না সেটি পাই ততক্ষণ মনের অস্থিরতা দূর হয় না ; এই অস্থিরতাই হ'ল অভীপ্সা বা Desire। এই অভীপ্সা আমাদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা ওষুধের দোকানে টেলিফোন ক'রে, লোক পাঠিয়ে ওষুধটি সংগ্রহের চেষ্টা করি। ওষুধটি সংগ্রহের জন্য মনের যে ঔৎসুক্য তাকেই অভীপ্সা বা Desire বলা হয়েছে। যখন বিভিন্ন অভীপ্সা একই সঙ্গে মনের মধ্যে ভীড় ক'রে আসে, তারা গৃহীত হওয়ার জন্য দাবী জানায় একই সঙ্গে, তখনই অভীপ্সা-বিরোধিতা বা conflict of desire ঘটে। হাতে সামান্য উদ্বৃত্ত অর্থ আছে ; লক্ষ্য সেই অর্থটি ব্যয় ক'রে আমার কোন একটি অভাবের মোচন করা। অমনি গৃহাভাব, বস্ত্রাভাব, যানবাহনের অভাব, এরা সবাই মনে ভীড় ক'রে এসে বলে, বাড়ী কেনো, কাপড় জামা কেনো, গাড়ী কেনো। আমি বিপদে পড়ে যাই, অতো টাকা ত হাতে নেই। কী করি ? পথ খুঁজে পাই না।

তখন মনের মধ্যে অভীপ্সার সংঘাত চলে ; আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি প্রথম চোটে ; তারপর বিচার চলে, কোন্ অভীপ্সাটি গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে। এই বিচার বিবেচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সোপান। একে deliberation বলা হয়েছে। এই বিবেচনার প্রয়োজন হয় একাধিক যুধ্যমান অভীপ্সা মনের মধ্যে তোলপাড় করলে ; আবার একটি মাত্র অভীপ্সা থাকলে তাকে কী ক'রে কাজের মধ্যে দিয়ে সত্য ক'রে

তোলা যায়, তার জন্যও বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়। অতএব বলা চলে মানসিক স্তরে বিবেচনার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এই বিবেচনার পরেই আসে সিদ্ধান্ত বা Decision ; মন একটি অভীপ্সাকে গ্রহণ ক'রে তাকে পূর্ণ করার জন্য কর্মে ব্রতী হয়। এর সঙ্গেই মানসিক স্তরের ইতি।

দৈহিক পর্যায়

মন যখন বিবদমান প্রেষণাগুলির একটিকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ একটি প্রেষণাকে নির্বাচিত করে এবং তাকেই সত্য করে তোলার জন্য সিদ্ধান্ত (Resolution) নেয় তখনই দৈহিক কর্মের সুত্রপাত ঘটে। এই গৃহীত প্রেষণাই অভিপ্রায় (Intention)। এই অভিপ্রায়ের সঙ্গে দৈহিক কর্মের সম্বন্ধটি কি, সেটা বোধ হয় ভেবে দেখা দরকার। Volition বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া আমাদের পরিষ্কার ভাবে একথা বলে দেয় যে, একটি বিশেষ ইচ্ছাকে ফলবতী করতে হ'লে কি কি ধরনের দৈহিক কর্মের প্রয়োজন ঘটে। আমাদের চেতনায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ধরা পড়ে কি ধরনের অঙ্গ সঞ্চালন করে আমরা আমাদের প্রার্থিত বস্তুটিকে পেতে পারি। ইচ্ছা হ'ল দৈহিক প্রচেষ্টা বা উদ্যোগের মানসিক দিক। সাধারণতঃ আমরা সচেতন ভাবে চিন্তা ক'রে স্থির করি যে কোন্ কোন্ দৈহিক পরিবর্তন সাধন ক'রে অভিপ্রায় (Intention) টুকু পূরণ করতে হবে। অমনি কাজ শুরু হয়ে যায়। উদাহরণ দিই। একটি শিশু খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। আমি ঘরের একপাশে বসে বই পড়ছি ; সেই পতনোন্মুখ শিশুটিকে দেখা মাত্র আমি বুঝি যে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়ে শিশুটিকে আমার ধরে ফেলা উচিত। অমনি কাজ শুরু হয়ে যায়। দ্রুত পদ সঞ্চালনে আমি ছুটে গিয়ে শিশুটিকে ধরে ফেলি। শিশুটিকে বাঁচানোর ইচ্ছা আমাকে বলে দেয় কত জোরে ছুটে গিয়ে ওই শিশু-টিকে ধরে ফেলতে হবে। দার্শনিক উইলিয়াম জেম্স্ এই প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ। তাঁর মত হ'ল এইযে প্রস্তাবিত কাজের ধারণাটকুই দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সঞ্চালিত ক'রে তোলে। এর জন্য কোন বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়না।

পরিণতির স্তর

দেহমনের যৌথ প্রয়াসের ফলে আমাদের কাজগুলি অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ

আমরা কাজ করি, কাজের ফলও পাই। আমাদের অভিপ্রায় কখন কখন পূর্ণ হয়; আমরা কাজে সফল হই; আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; উপায় এবং উপেয়ের মধ্যে আমরা সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করি। কখন কখন আবার যা চাই তা পাই না অর্থাৎ উপায় এবং উপেয় অসঙ্গত হয়ে পড়ে। কখন কখন এমনি ফল লাভ ভাগ্যে ঘটে; যার কথা কখনই ভাবিনি অর্থাৎ দৈহিক কর্মের-ফল-প্রভৃতির সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা বা বিবেচনার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাই না, এমন অঘটনও মাঝে মাঝে ঘটে।

অভীপ্সা (Desire)

মানুষের অভাবের অন্ত নেই। নানান ধরনের বাস্তব অভাব এবং তার চেয়েও বেশী কাল্পনিক অভাব আমাদের নিত্য পীড়া দেয়। আমরা এই অভাব পূরণের জন্য যে মানসিক চেষ্টা করে থাকি তাকেই বলা হয়, ইচ্ছা বা Desire। না পাওয়াকে পাওয়ার পর্যায়ে টেনে তোলার যে বাসনা তা কিন্তু মনের মধ্যে একধরনের বিরোধ বা Tension সৃষ্টি করে। এই Tension এর মূলে রয়েছে, যা পাই না তার জন্য বেদনা-বোধ এবং তা পেলে যে আনন্দ পাব তার স্বপ্ন। এই জটিল মানসিক অবস্থার মধ্যে জ্ঞানগত, আবেগগত এবং ইচ্ছাগত উপাদান রয়েছে। (ক) প্রথমেই জ্ঞানগত উপাদানের কথা বলি। অভাব পূরণ করতে হলে আমাদের যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে সেই লক্ষ্য বা উপেয় সম্বন্ধে বুদ্ধিগত ধারণা। উপেয়ের কথা বললেই উপেয়ের কথা বলতে হয়। উপায় বা Means ছাড়া উপেয় বা লক্ষ্যের কোন প্রয়োগ সার্থকতাই নেই। উপায়টি প্রেয় কিনা, তা গ্রহণ যোগ্য কিনা সেকথা ভেবে দেখতে হয়, এবং এই উপায় অনুসরণ ক'রে নির্ভুল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার। এর মধ্যে ভাবতে হয়, বাস্তব সত্য এবং আদর্শ সত্তার কথা। যে বাস্তব অবস্থাকে দেখেছি এবং যে আদর্শ অবস্থার কথা ভেবেছি, এই দুয়ের মধ্যে তুলনা করতে হয়। এই বাস্তব অবস্থা এবং আদর্শ অবস্থার তুলনামূলক বিচার ক'রে এই দুয়ের ব্যবধানটি যত বিস্তৃত ব'লে মনে হবে, অভীপ্সা বা Desire ততোই উদগ্র হয়ে উঠবে। এই উগ্র ইচ্ছার উদাহরণ দিচ্ছেন কবি: "The desire of the moth for the star, of the night for the morrow"; ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত পোকামাকড়ের বাসভূমি থেকে নক্ষত্রখচিত আকাশের ব্যবধান অনেক। তাই কীটের নক্ষত্রলোকে পৌঁছাবার Desire বা অভীপ্সাটুকুও দুর্দমনীয়। (খ) ইচ্ছার অন্তর্বর্তী আবেগগত উপাদান হল এক ধরনের বেদনাদায়ক অভাব বোধ। এই অভাববোধের জন্যই মানুষ কর্মে ব্রতী হয়।

কাজ করার সময় সে ভাবে কর্মে সিদ্ধি লাভ করলে সে কি ধরনের আনন্দ পাবে। অতএব অভীপ্সা বা desire-এর মধ্যে এই ধরনের আবেগগত উপাদান রয়েছে। (গ) আবার আমরা আর এক ধরনের উপাদানের কথা বলি। এটা হল conative বা কর্মগত উপাদান। বস্তুর অভাব বোধ থেকে আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই। অভাবটুকু দূর করার জন্য আমরা কাজে লেগে যাই এবং অচিরেই কর্মের মধ্য দিয়ে সেই অভাব দূর করি।

অভাব ক্ষুধা এবং অভীপ্সা (Want, Appetite and Desire)

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত এবং মনুষ্য জগতের কথা বলতে পারি। গাছপালার অভাববোধ হল Organic বা প্রাণগত। প্রাণকে, রক্ষা করার জন্য তারা যে কাজকর্ম করে তার মধ্যে বিচার বুদ্ধির স্থান নেই। লতা-বৃক্ষ আলোকের দিকে হাত বাড়ায়, মাটি থেকে রস আহরণ করে, এ সবই হল 'অজ্ঞান' কর্ম। পশু জগতে সজ্ঞান কাজকর্মের প্রবণতা দেখি। Conscious Tendencies বা সজ্ঞান কর্ম-প্রবণতার অভাব রয়েছে এই বৃক্ষলতার জগতে। কুকুর বেড়াল প্রমুখ জন্তু জানোয়ারদের সুখ এবং বেদনার উপলব্ধি করার প্রবণতা রয়েছে। জন্তু জানোয়ার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে, ক্ষুধা মেটাবার জন্য চেষ্টা করে। তার চেতন মনের দরজায় এই ক্ষুধার খবর এসে পেঁছায়। অবশ্য এই ক্ষুধা খুব যে সচেতন ক্ষুধা, সেকথা বলব না ; তবে এই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এক ধরনের আবেগ বা অনুভূতি দেখা যায়। আবেগটুকুই বড় হয়ে ওঠে। কি ধরনের অবস্থা এই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলেও জন্তু জানো-য়ারেরা মোটামুটি এই অভাবজনিত বেদনাকে বোধ করে।

কিন্তু Desire বা অভীপ্সার মধ্যে আমরা পাই সেই দূরাশ্রিত লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান ; এই প্রেয়কে পেলে তার সহগামী আনন্দ অথবা বেদনার অনুভূতিরাও এসে পড়ে। এসবই হল মানুষের চেতন মনের কাজ। উদ্ভিদ জগতে অর্থাৎ গাছপালার জগতে যে ধরনের অভাব-অনুভূতি রয়েছে তা হ'ল কেবল-মাত্র প্রাণগত বা Organic। প্রাণী জগতে এটাই অন্ধ ক্ষুধার রূপ নেয় এবং মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্ষুধা অভীপ্সা বা Desire-এর রূপ নেয়। খাদ্যের জন্য যে অনুসন্ধান, তাহ'ল অন্ধ অনুসন্ধান ; অতএব একথা বলা চলে যে, অভীপ্সা একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব ; উদ্ভিদ জগতে বা জন্তু জানোয়ারের জগতে তার সন্ধান মেলে না।

ব্যক্তির ও তার চরিত্রের সঙ্গে অভীপ্সার সম্বন্ধ (Relation of desire to the self and character)

অভীপ্সা হল বুদ্ধিজীবী মানুষের কাজ। জীব-জন্তুর ক্ষুধার মতো তা অন্ধ নয়; তা আবার লতাবৃক্ষের মধ্যেকার প্রাণগত প্রয়াস মাত্র নয়। মানুষের ইচ্ছা তার আত্ম সচেতনতার আলোকে আলোকিত। যে লক্ষ্যকে আমরা ভালো (Good) বলে বুঝি সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমাদের সজ্ঞান প্রয়াসের অন্ত থাকে না। যে কোন লক্ষ্যকে যখন আমরা ভালো বলে মনে করি তখন বুঝতে হবে যে আমাদের চরিত্রের সঙ্গে এই লক্ষ্যটির কোথাও না কোথাও একটা সঙ্গতি আছে। আমরা সেই বস্তুকেই চাই বা কামনা করি আমাদের যার কাছে মূল্য আছে। কোন একটি বিশেষ বস্তু আমাদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হয় তখনই যখন আমরা আমাদের চরিত্রের সঙ্গে, আমাদের প্রকৃতিগত প্রবণতার সঙ্গে তার সঙ্গতি খুঁজে পাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ প্রাণীতত্ত্ব সম্পর্কে বই পড়তে উৎসুক হয়ে থাকেন; এই বিষয়ে লেখা বইগুলিকে তিনি মূল্যবান মনে করেন। এই মূল্যবোধ বা এই ধরনের বই পড়ার ইচ্ছা তার ব্যক্তি-সত্তা ও তার চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। আবার দীর্ঘদিন দর্শন শাস্ত্র পঠন-পাঠনের ফলে দর্শনশাস্ত্রীর মনে দর্শনশাস্ত্র পাঠের জন্য যে প্রবৃত্তি জন্মে তার সঙ্গে দর্শণশাস্ত্রের বই পাঠ করার একটা আবশ্যিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। নীতিশাস্ত্রবিদ মুরহেড্ যথার্থই বলেছেন যে, আমরা সেই ধরনের জিনিসই পেতে চাই, যাকে আমরা মূল্যবান মনে করি এবং আমরা সেই ধরনের বস্তুকেই মূল্যবান বলে মনে করি যার সঙ্গে আমাদের চরিত্রের একটা ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যিনি 'ফুটবল বলরাম'—তার কাছে ফুটবল খেলার যথেষ্ট মূল্য আছে। খেলোয়াড় হিসেবে তার যে চরিত্র তার সঙ্গে এই ফুটবল খেলার একটা ঐকান্তিক যোগ রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, স্বামী বিবেকানন্দ এই ফুটবল খেলার সঙ্গে তৎকালীন বাঙালী যুবকদের চরিত্রের কোন ঐকান্তিক যোগ দেখতে পান নি। সেই জন্যই তারা এটাকে মূল্যবান বলে স্বীকার করেন নি। পরন্তু স্বামীজী চেয়েছিলেন যে ছেলেরা ফুটবল খেলুক, এই খেলাটিকে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে মূল্যবান বলে স্বীকার করুক। তাই তিনি ছেলেদের ফুটবল খেলতে বলেছিলেন, অর্থাৎ ছেলেদের মনে তিনি এই ফুটবল খেলার ইচ্ছার বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন। ছেলেদের ইচ্ছার জগতে এই ফুটবল খেলার প্রয়োজনকে তিনি কখনও প্রত্যাক্ষ করেন নি। এই অভীপ্সার জগত বা Universe of

Desire-এর কথা নীতিশাস্ত্রবিদ ম্যাকেঞ্জি বলেছেন ; এই অভীপ্সার জগত মানুষের চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মানুষের প্রত্যেকটি ইচ্ছা তার সুবিস্তৃত অভীপ্সা রাজ্যের (Desire) অধিবাসী। এক একটি মানুষের এক একটি অভীপ্সার রাজ্য। আপন আপন চরিত্র-প্রবণতার দ্বারা এই ইচ্ছার জগৎ গঠিত হয়। আমাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছাকে বুঝতে হয় এই অভীপ্সার জগতের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে। প্রত্যেকে আপন আপন অভীপ্সার জগৎটিকে তৈরী করে নেয় আপনার নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই নৈতিক দৃষ্টিকোণ আবার তার স্থায়ী চরিত্র (Permanent character) থেকে উদ্ভূত হয়। অতএব একথা বলা যায় যে, আমাদের মনে যেসব ইচ্ছার ভাসমান মেঘ ভেসে আসে বলে মনে হয়, তাদের মূলে রয়ে গেছে আমাদের চরিত্র ; অবশ্য আমাদের মনের প্রবণতা আমাদের সুস্থ থাকা না থাকার উপরে নির্ভর করে ; বিভিন্ন সময় আমাদের মানসিক প্রবণতা পালটায়, একথা বলা যায়। তাই আমাদের অভীপ্সার জগতের রূপান্তর ঘটে। অবশ্য যদি এই অভীপ্সার জগৎ বা Universe of Desire-এর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি চরিত্রের অচ্ছেদ্য এবং অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধের কথা ভাবা যায় তাহলে কিন্তু অভীপ্সার জগতের দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব হয় না। আমাদের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটলেও অভীপ্সার জগৎ বা এই Universe of Desire-এর হয়তো সামগ্রিক পরিবর্তন এতো তাড়াতাড়ি ঘটে না। যদি বলা হয়, আমাদের ইচ্ছার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভীপ্সার জগতের বা Universe of Desire-এরও পরিবর্তন হয়, তাহলে বলতে হয় যে, Universe of Desire-এর সঙ্গে ইচ্ছার বা আমাদের চরিত্রের কোন স্থায়ী সম্বন্ধ নেই।

অভীপ্সা (Desire), অভিলাষ (Wish), প্রতিজ্ঞা (Will)

আমরা যখন কাজে নামি অর্থাৎ কোন কাজে হাত দিই, তখন অভীপ্সা বা Desire আমাদের সেই কাজে প্রেরণা দেয়। আমাদের সব কাজের মূলেই একটা অভাববোধ কাজ করে। সেই অভাবের পূরণের জন্য চিন্তা ভাবনা করে আমাদের মনে ইচ্ছা দানা বাঁধে ; একেই আমরা অভীপ্সা বলি। সেই ইচ্ছাই আমাদের উপায় এবং উপেয় এই দুটোকেই নির্দিষ্ট করে দেয়। অতএব বলা চলে, এই অভীপ্সা ছাড়া কোন কাজের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। তবে এই সঙ্গে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, এই যে অভীপ্সা এবং কাজের মধ্যে সহজ সম্পর্কটুকুর কথা বললাম, এটা কিন্তু অতো সহজ নয়। আমরা জানি যে কাজ নানান ধরনের হয় ; সব কাজই যে সহজ সরল হবে এমন কথা

সত্য নয়। জটিল কাজ বা Complex Action, এই ধরনের কাজই আমরা বেশী করি। এই ধরনের জটিল কাজের পিছনে নানান ধরনের অভীপ্সার সংঘাত থাকে। এই বিভিন্ন অভীপ্সার কথা আমাদের ভাবতে হয়, বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছাকে পূরণ করলে কি ধরনের ফল পাওয়া যাবে সেকথাও ভাবতে হয়; এই ধরনের বাছবিচার করেই আমরা যখন কোন একটি বিশেষ অভীপ্সাকে গ্রহণ করি এবং তাকেই কর্মে রূপ দেবার চেষ্টা করি তখন তাকে বলা হয় অভিলাষ বা Wish। তাহলে অভিলাষের সঙ্গে অভীপ্সার পার্থক্যটা হোল এই যে অভিলাষ হোল গৃহীত অভীপ্সা; অন্যান্য বিবদমান অভীপ্সাকে রদ করে দিয়ে আমরা অভিলাষের পক্ষে রায় দিই এবং সেই অনুসারেই কাজ করি। তাহলে দেখা গেল যে প্রাথমিক নির্বাচনে মনের মধ্যে অভীপ্সার যখন লড়াই চলে তখন যে অভীপ্সাটা জয়ী হয় তাকে বলা হয় অভিলাষ আর যেগুলি পরাজিত হয়ে বরবাদ হয়ে যায় তাদের বলা হয় অভীপ্সা বা Desire। প্রাথমিক নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য অভিলাষকে আরেকটি বাধা অতিক্রম করতে হয়; সেই বাধাটি হোল ইচ্ছার জগতের বাধা। ইচ্ছার জগৎ প্রত্যেক মানুষেরই স্বতন্ত্র; ভিন্ন ভিন্ন অভীপ্সার জগৎ বা Universe of Desire রয়েছে। অভিলাষের এই অভীপ্সার জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে। তা না হলে আমরা তাকে গ্রহণ করি না। যখনই অভীপ্সার জগতের সঙ্গে অভিলাষের মিল ঘটে অর্থাৎ তারা সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই অভিলাষ মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে; তার কাজ করার ইচ্ছা বলবতী হয়ে ওঠে। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অনেক কাজ করি। আমি হয়তো ব্যবসাদারদের একদমই পছন্দ করি না; আমি লেখাপড়া ভালোবাসি। অথচ আমার চরম দারিদ্র্যই হয়তো আমাকে ছোটখাটো কেনা বেচার কাজে নামিয়ে দিয়েছে; আমি দোকানদারি করছি। এমন ঘটনা বিরল নয়। তবে আমার ইচ্ছার জগৎ অর্থাৎ যে সামগ্রিক অভীপ্সার (Desire) জগতে আমি বাস করি, যে জগতে আমি প্রাচুর্য দেখতে চাই এবং প্রাচুর্য পেতে চাই সেই অভীপ্সার জগৎ আমাকে সাধারণত: নিয়ন্ত্রণ করে। আমার ভালো লাগা, মন্দ লাগা, আমার কোন একটি বিশেষ দিকের মানসিক প্রবণতা, আমার কোন বিশেষ ধরনের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, এসবই কিন্তু এক্ষেত্রে নিষ্ফলা হ'য়ে গেল। আমার অভীপ্সার জগত সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হ'ল; এই প্রসঙ্গে অভীপ্সার জগতের সঙ্গে অভিলাষের কোন যোগই রইল না। অভিলাষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে যে কাজ বেছে নিল তার সঙ্গে অভীপ্সার জগতে কেন আত্যন্তিক যোগই রইল না। অভিলাষ আমাকে যে প্রতিজ্ঞায় (will) উদ্বুদ্ধ করল তার সঙ্গে অভীপ্সার

যোগটুকু হারিয়ে গেল। আমি যে কর্ম সম্পাদনে কৃত-সঙ্কল্প হলাম এবং যে কাজে ব্রতী হ'লাম তা এক অর্থে আমার চরিত্রের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারল না।

প্রেষণা (Motive)

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেভাবেই কাজ করি না কেন, তার মূলে কিন্তু সবসময় থাকে একধরনের প্রেষণা বা Motive ; একে আমরা কাজের লক্ষ্য বা End of Actionও বলতে পারি। যখন প্রেষণাকে কাজের উৎস বলে গ্রহণ করি তখন তাকে একধরনের অভাব বোধের সঙ্গে এক করে দেখি। আমাদের সুখ-দু:খের অনুভূতি, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা, ভয়, অনুকম্পাবোধ এসবই এক অর্থাৎ প্রেষণা বা Motive। কিন্তু Bentham, Mill, Bain, Hume প্রমুখ সুখবাদীরা বললেন যে, সুখদু:খের অনুভূতিই হোল কর্মের উৎস। আমরা দু:খ পরিহার করে সুখ পেতে চাই। আমাদের ঐচ্ছিক কর্ম বা Voluntary Action-এর নিয়ন্তা হোল এই সুখ-দু:খের অনুভূতি ; এই অনুভূতি বিশেষ ভঙ্গীতে কাজ করে। দার্শনিক মিল কিন্তু প্রেষণার অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন, প্রেষণা হোল সেই প্রেরণা যা কর্তাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। তবে কাজে নামতে হলে শুধুমাত্র আবেগ বা অনুভূতির উপর নির্ভর করে চলা যায় না। এই আবেগ বা অনুভূতিকে ইচ্ছায় রূপান্তরিত করতে হবে। ইচ্ছা বলতে আমরা বুঝি বিচার, বিবেচনা, নির্বাচন এবং তা থেকে এক দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ; এগুলি সবই বুদ্ধির কাজ। অতএব বলা চলে, আমরা যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই তাকেই প্রেষণা বলা ভালো। আমরা তাকেই কল্যাণকর (Good) বলে গ্রহণ করি। তার পরেই সুরু হয় আমাদের হাতে কলমে কাজ করা। অতএব বলা চলে যে অনুভূতি বা Feeling হোল আমাদের কাজ কর্মের মূল উৎস। বোধহয় আমরা কোন রকম বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে একথা বলতে পারি যে কাজের মূলে প্রেষণার প্রেরণা নিরন্তর কাজ করে ; অতএব কর্তা যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় সেই লক্ষ্যের ধারণাটিও প্রেষণা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ম্যাকেঞ্জি ও গ্রীণের মতো খ্যাতনামা নীতিশাস্ত্রবিদেরা এই ধরণের অভিমত পোষণ করেছেন। গ্রীণ প্রেষণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন যে, প্রেষণা হল কর্মের লক্ষ্য বস্তুর ধারণা। এই ধারণাটিকে আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। তার ফলে এক ধরনের চেষ্টা বা প্রয়াস আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। এই চেষ্টা বা প্রয়াসকে লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দার্শনিক গ্রীণ তাঁর প্রেষণার ধারণাটিকে গড়ে তুললেন। ম্যাকেঞ্জি তাঁর 'Manual of Ethics' গ্রন্থে বললেন যে, আমরা যে শ্রেয়ের

দিকে এগুতে চাই, সে সম্বন্ধে যে পূর্ণাঙ্গ ধারণা আমাদের মনের মধ্যে থাকে তাকে Motive বা প্রেষণা বলা চলে। তিনি 'Desirable End' কথাটি ব্যবহার করেছেন ; অর্থাৎ যে লক্ষ্য আমার কামনা করা উচিত সেই লক্ষ্যের ধারণা আমাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে ; তাহলে ম্যাকেঞ্জি একথা বলতে চাইলেন যে, লক্ষ্যটা Desirable বা প্রেয় হবে তখনই যখন সেটা আমাদের সামগ্রিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। ম্যাকেঞ্জির Desirable End কথাটা পরিপূর্ণ রূপে ব্যাখ্যা করলে আমরা যে তত্ত্ব পাই, সেই তত্ত্বটিরই পুনরাবৃত্তি করলেন ন্যায়শাস্ত্রবিদ্ মুরহেড্। তিনি বললেন প্রেষণা হল সেই লক্ষ্য যে লক্ষ্যটি আমাদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই লক্ষ্যটিই আমাদের চরিত্রের সঙ্গে সর্বদা সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। তাহলে বলা চলে যে, নির্বাচিত ইচ্ছাই হোল প্রেষণা ; এটাই হল আমাদের কর্মের লক্ষ্য। মুরহেড্ প্রেষণার সঙ্গে চরিত্রের যে সঙ্গতির কথা বললেন, তার দ্বারা তিনি আমাদের বোঝাতে চাইলেন যে, এই প্রেষণার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার জগতের একটা মিল থাকা উচিত। জীবনের এই মুহূর্তে আমরা যে ইচ্ছার জগৎটাতে বাস করছি, যে ইচ্ছাগুলি সযত্নে লালন-পালন করছি, আমাদের প্রেষণা বা Motive-কে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, তার সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে তাকে আবদ্ধ হ'তে হবে। মুরহেডের এই মতটি ম্যাকেঞ্জির মতের পরিপূরক।

প্রেষণা ও অভিপ্রায় (Motive and Intention)

আমাদের কাজের প্রেষণাকে বলতে পারি একধরনের সুখপ্রদ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যবস্তুর চিন্তা ; এই চিন্তা আমাদের ইচ্ছার জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। Intention বা অভিপ্রায় হল এই লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে, এই উপেয়ের সঙ্গে উপায়কে যুক্ত করা। আমরা জানি যে, শুধুমাত্র কর্মের সঙ্গে উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যকে স্থির করলেই চলে না। কি উপায়ে, কোন পদ্ধতিতে সেই সাধ্যকে সিদ্ধ করা চলে তাও আমাদের ভেবে দেখতে হয়। যারা এই ধরনের ভাবনা করেন তারাই প্রাজ্ঞজন। কবি ব্রাউনিং তাঁর 'Grammarian's Funeral' কবিতায় যে বৈয়াকরণের কথা বললেন, তার Motive বা প্রেষণা ছিল অনন্ত ঐশ্বর্যের (Million) অধীশ্বর হওয়া। কিন্তু এই মহৎ উপেয়কে সত্য করে তোলার, বাস্তব করে তোলার উপায় সম্বন্ধে তাঁর কোন নির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। তাই তাঁর জীবনে ফললাভ ঘটলো না : 'This high man aiming at a million misses an unit' ; যখন আমরা লক্ষ্য বস্তুকে পাবার জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করলে তা সিদ্ধ হবে, এই চিন্তা করে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করে

থাকি তাকে বলা হয় অভিপ্রায় বা Intention। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, আমাদের কর্মের প্রেষণা বা আগ্রহ আছে কিন্তু তা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় নেই। এই ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ কর্মের জন্য Motive বা প্রেষণা থাকলেও তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার অভিপ্রায় বা Intention আমাদের থাকে না। অতএব একথা বলা চলে যে Motive বা প্রেষণার ক্ষেত্রে বাহ্য ফলাফল, উপায়, পদ্ধতি এসবই অবান্তর, অতিরিক্ত। অভিপ্রায় বা Intention-এর ক্ষেত্রে আবার এই বাইরের দিকটি, ফলের দিকটি বেশী জোর-দার হয়ে ওঠে ; প্রেষণা হোল মানসিক পদ্ধতি। অভিপ্রায়ে মানসিক পদ্ধতি-টাতো থাকেই উপরন্তু বাইরের প্রয়োগপদ্ধতির ধারণাও এর মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে যায়। অভিপ্রায় হল একটি জটিল ব্যাপার ; প্রেষণা অপেক্ষাকৃত সরল। প্রেষণার সঙ্গে,উপায়ের সম্বন্ধ বিচার (Consideration regarding the means to employ) এবং ফলাফল সম্বন্ধে বিচার (Consideration of the forsεen consequences) এবং এদের সঙ্গে বিচার শেষে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্কল্পকে যুক্ত করলে আমরা যে জটিল বিষয়টিকে পাই তাহোল অভিপ্রায় বা Intention। একটি উদাহরণ দিই—অগ্নিযুগের দৃঢ়চেতা একদল যুবক স্থির করলেন যে ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের অবসান করতে হ'বে। এই স্থির সঙ্কল্পটাই হল তাঁদের সমস্ত কাজের প্রেষণা বা Motive। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য তাঁরা উপায় চিন্তা করলেন। সাহেবদের হত্যা করে, তাদের সহযোগী ভারতীয়দের হত্যা করে শাসক সম্প্রদায়ের অন্তরে তারা ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইলেন। তার জন্য প্রয়োজন আগ্নেয়াস্ত্রের ; প্রচুর অর্থেরও দরকার। এই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে বিত্তবান মানুষদের ঘরে ডাকাতি ক'রে। যারা কোন অপরাধ করেনি তাদের উপর অত্যাচার করেও এই টাকার যোগাড় করতে হবে ; কিন্তু এই উপায়টি তো সাধু নয় ; অনেক অযথা রক্তপাত করতে হল তাদের। তাদের চোখে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাতে হলে, এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে এছাড়া অন্য পথ ছিল না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাতো তাদের ছিলই না, অনাহার উৎপীড়ন এমন কি মৃত্যুও তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ; একথা তারা জানত এবং এবং জেনেশুনেও অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা এই মারাত্মক পথকে গ্রহণ করেছিল। তাহলে তাদের দেশকে মুক্ত করার বাসনাকে যদি Motive বলি তাহলে তাদের Intentiion বা অভিপ্রায় হোল দেশের মুক্তির জন্য গোপনে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা, ডাকাতি, নরহত্যাও ক'রেও অর্থ সংগ্রহ করা এবং এই সব কাজের মধ্য দিয়ে চরম দুঃখবরণ করা। বেন্থাম এই প্রেষণা ও অভিপ্রায়ের পার্থক্য

দেখিয়ে বললেন যে যার জন্য, যে উদ্দেশ্যে কাজটা করা হয়, তাহল প্রেষণা এবং অভিপ্রায় হল যার জন্য যে উদ্দেশ্যে এবং যা সত্ত্বেও কাজটা করা হয়। অভিপ্রায়ের মধ্যে কর্মের অনুকূল এবং প্রতিকূল এই দুই উপাদান থাকে। আমরা যখন পরীক্ষা পাশ করবার জন্য পড়াশুনা করি তখন পরীক্ষা পাশ করা-টাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে ; এটাই হল আমাদের প্রেষণা। অভিপ্রায় হল রাত জেগে পড়া, কষ্ট করে সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর তৈরী করা, কষ্টেসৃষ্টে পরীক্ষার ফিসের টাকা সংগ্রহ করা, তার জন্য উঞ্ছবৃত্তি করা। এসব আমাদের কাছে দু:খজনক হলেও এগুলি আমরা করে থাকি ; একে অভিপ্রায় আখ্যা দেওয়া হয়। Bentham-এর মত উদ্ধৃত করে দিই। তিনি বললেন ; 'যে উদ্দেশ্যে কাজ করি তাহ'ল প্রেষণা ; অভিপ্রায় হ'ল যে সুখবহ ফললাভের জন্য কাজ করি এবং যে ক্লেশকর পরিস্থিতিটুকু এড়িয়ে যাবার জন্য ঐ কাজের সূত্রপাত ক'রে থাকি, এরা উভয়েই আমাদের অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। প্রেষণা হ'ল কাজ করার পরে সুখকর পরিণতি লাভের প্রলোভনটুকু আর অভিপ্রায় হ'ল এই সুখকর ফলের আশা এবং ক্লেশকর পরিণাম পরিহারের প্রত্যাশা। "Motive is that for the sake of which an action is done where the intention includes both that for the sake of which, and that inspite of which the action is done. Motive includes only the persuasives ; intention includes both the persuasives and dissuasives."

ন্যায়শাস্ত্রবিদ ম্যাকেঞ্জি Intention বা অভিপ্রায়ের নানান শ্রেণী বিভাগ করেছেন : (ক) তাৎক্ষণিক অভিপ্রায় বা Immediate Intention এবং দূরবর্তী অভিপ্রায় বা Remote Intention। মনে করা যাক, একজন পলাতক আসামী লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ; তাকে উদ্ধার করার জন্য পথচারী একজন যুবক এবং ওই আসামীটির পশ্চাদ্ধাবনকারী একজন পুলিশ ইনিস্পেক্টর উভয়েই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই আসামীটিকে জল থেকে টেনে তুললেন। এক্ষেত্রে উদ্ধারকারী দুজন ব্যক্তিরই তাৎক্ষণিক বা নিকট অভিপ্রায় একই। অর্থাৎ এরা দুজনেই আসামীটিকে জল থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। কিন্তু এদের দুজনের দূরবর্তী অভিপ্রায় বা Remote Intention ভিন্ন ধরনের। পথ-চারী যুবকটির দূরবর্তী অভিপ্রায় ছিল লোকটির প্রাণ রক্ষা করা ; পুলিশ ইন্সপেক্টরটির দূরবর্তী অভিপ্রায় ছিল, যাতে কোন রকমে আসামীটি তার কৃত-কর্মের শাস্তি এড়িয়ে না পালাতে পারে, তা দেখা। অতএব উভয়ের তাৎ-ক্ষণিক বা নিকট অভিপ্রায় এক হলেও এদের দুজনের দূরবর্তী অভিপ্রায় বা Remote Intention একেবারেই ভিন্ন।

(খ) এই অভিপ্রায়কে আবার বাহ্য অভিপ্রায় এবং আন্তর অভিপ্রায়--এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আমরা এই বাহ্য ও আন্তর অভিপ্রায়ের বিভেদ-টুকু বোঝাতে গিয়ে একটি বিখ্যাত গল্পের অবতারণা করতে পারি। একবার আব্রাহাম লিঙ্কন সাহেব একটি শূকর ছানাকে জলে ডুবে যেতে দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে তোলেন। তখন চারিদিকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন একটি শূয়রের বাচ্চাকে জল থেকে টেনে তুলে এতো কষ্ট করেছেন, এতো প্রশংসার কথা। কিন্তু তিনি বললেন যে, প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়। কেননা, শূকর ছানার কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করেন নি। তিনি আনপার স্বার্থেই এই কাজ করেছেন। শূকরের বাচ্চাটিকে জলে ডুবতে দেখে তাঁর মনে একটি বিশ্রী অস্বস্তি হয়েছিল, এবং এই অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি এই কাজ করেছেন। এই দিকটাই হোল অভিপ্রায়ের আন্তর দিক। এদিক থেকে বিচার করলে লিঙ্কন সাহেব আপন কষ্ট লাঘবের জন্য কাজটা করেছিলেন। আর অভি-প্রায়ের বাহ্য দিকটুকু বিচার করলে লিঙ্কন শূকর বাচ্চাটির কষ্ট মোচনের জন্যই তাকে জল থেকে তুলেছিলেন।

(গ) অভিপ্রায়কে আবার প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ এই প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়কে প্রেষণা (Motive) বলেছেন, অপ্রত্যক্ষ অভিপ্রায়কে অভিপ্রায় বা Intention বলেছেন। উদাহরণ দিই আমাদের পাড়ার গনেশবাবু গরীবের ছেলে ; দারিদ্র্যের অনেক ক্লেশ তিনি সহ্য করেছেন ; যৌবনে তিনি টাকা রোজগার করে বড়লোক হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে-ছিলেন। বড়লোক হবার সাধ অর্থাৎ তার প্রচুর অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা তার প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়। কি করে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় সেকথা ভাবতে গিয়ে তিনি সুদূর আমেরিকা গিয়ে বসবাস করা স্থির করলেন। এই আমেরিকা প্রবাস, এই স্বজন থেকে বিচ্যুত হবার আকাঙ্ক্ষাই হ'ল তাঁর অপ্রত্যক্ষ অভিপ্রায়।

(ঘ) অভিপ্রায়কে আকারগত অভিপ্রায় এবং বস্তুগত অভিপ্রায় এই দুই ভাগে ভাগ করা চলতে পারে। একটি উদাহরণ দিই—মনে করা যাক, আমাদের গনেশবাবু আসামের দরং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলী চান। স্বরাষ্ট্র সচিব (Home Secretary) একজন অসমীয়া মুসলমান। গনেশবাবু মনে করেন, হিন্দুবিদ্বেষী এই মুসলমান ভদ্রলোককে দিয়ে তার কাজ হবে না। তাই তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবের বদলি চান। আবার কার্তিকবাবু, তিনিও ওই স্বরাষ্ট্র-সচিবের বদলি চান। কিন্তু তিনি মনে করেন, আসামবাসী

অসমীয়া স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয় বঙ্গসন্তান কার্তিকবাবুর ও তাঁর আত্মীয় পরিজনের সুখ-সুবিধার দিকে দেখবেন না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কার্তিকবাবু এবং গনেশবাবুর বস্তুগত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন হলেও আকারগত অভিপ্রায় একই।

(ঙ) অভিপ্রায় আবার সচেতনও হয়, অবচেতনও হয়। আমরা সাধারণত মানুষের সচেতন অভিপ্রায়টির কথা চিন্তা করি। কাজের সঙ্গে যে অভিপ্রায়টির প্রত্যক্ষ যোগ আছে, তারই আমরা প্রশংসা বা নিন্দা করে থাকি। অর্থাৎ সচেতন অভিপ্রায় নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় পড়ে। আমরা দেশবিদেশের দানবীর মানুষদের প্রশংসা করি ; তাঁদের দানে হাসপাতাল স্কুল, কলেজ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে সেই জন্য। কিন্তু লালা-গন্‌গনিয়া হয়ত প্রকৃতপক্ষে শহরের বড় হাসপাতালটির প্রতিষ্টা করেছেন তাঁর মনের কোন অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। হয়তো প্রথম জীবনে বিনা চিকিৎসায়, তাঁরই একান্ত অবহেলায় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছিল। তিনি যথাযোগ্য চেষ্টা বা ব্যবস্থা করেন নি ; সেই অপরাধবোধই তাঁকে উত্তরকালে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করলো। আমরা তাঁর সচেতন অভিপ্রায় হিসেবে তাঁর জনকল্যাণের ইচ্ছাকেই দেখলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জনকল্যাণ করার ইচ্ছায় তিনি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন নি। তাঁর অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্তি দেবার জন্যই তিনি এই কাজটি করেছেন। এটা হোল তাঁর অবচেতন অভিপ্রায়। এই অবচেতন অভিপ্রায়ের কথা আমরা সাধারণত জানতে পারি না। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এই অবচেতন মনের কথা বললেন। ফ্রয়েডের অনুগামীরা মনে করেন যে, মানষের সমস্ত সচেতন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়ার মূলে রয়েছে অবচেতন মনের নিগূঢ় প্রভাব। আমাদের অবচেতন অভিপ্রায়ও এই অবচেতন মনেরই বাসিন্দা। অবশ্য অবচেতন মানসিকতার কোন নৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা সচেতন অভিপ্রায়কেই আমাদের নৈতিক মূল্যায়নের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছি। নীতিশাস্ত্রবিদ Lillie এই প্রসঙ্গে ঠিক কথাই বলেছেন। তিনি বললেন যে, নীতিবিদ্যার আলোচনায় প্রেষণা এবং অভিপ্রায়কে (Motive and Intention) সচেতন মানসিক ক্রিয়া রূপেই দেখা উচিত। অচেতন বা অবচেতন মনের ক্রিয়াকর্ম নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসে না।

সুখ ও প্রেষণা (Pleasure and Motive)

প্রেয়োবাদীরা বলবেন যে, সুখের সন্ধানই আমাদের লক্ষ্য এবং সেই

আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই আমরা সব সময় কাজ করি। দার্শনিক বেন্থাম বললেন যে, দুঃখ পরিহার করা এবং সুখের সন্ধান করা—এই দুটি আমাদের মৌল মানসিক প্রবৃত্তি। বেন্থাম এবং মিলের মতো মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদীরা বলেন যে, দুঃখ পরিহার করা এবং সুখ লাভ করাই আমাদের প্রেষণার লক্ষ্য বিন্দু। স্বাভাবিকভাবেই আমরা দুঃখ পরিহার করতে চাই এবং সুখ পেতে চাই। আমাদের সব কাজকর্মই এই দুটি ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। প্রেয়োবাদীদের মতে 'বাঞ্ছনীয়' এবং 'সুখকর' এই দুই শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মিল বেন্থামের মতোই বললেন যে, আমরা সুখের সম্ভাবনাকে বেছে নিই, যাতে দুঃখ পাই তাকে সযত্নে পরিহার করি। মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদীদের মতে সমস্ত মানুষই এই দুঃখ পরিহার এবং সুখের অন্বেষণ—এই দুই অভিপ্রায়ের দ্বারা চালিত। কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয় যে ব্যক্তি বিশেষ স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করছেন সুখকে বিসর্জন দিয়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুঃখ বরণ করা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, তিনি তার মধ্যেই সুখের সন্ধান পেয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যাকে আপাতঃদৃষ্টিতে দুঃখ-জনক বলে ভাবি তিনি তার মধ্যেই আনন্দের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। অনেকের মতে মিল ও বেন্থামের এই "বাঞ্ছনীয়" বস্তু এবং "সুখকর" বস্তুর সমীকরণ গ্রহণযোগ্য নয়। দার্শনিক শিজ্‌উইক এই মতবাদীদের মত খণ্ডন করেছেন। তিনি বললেন যে, কোন জিনিষ চাওয়া এবং তাকে সুখকর বোধ করা এই দুটো ব্যাপার অভিন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তুটি কি এবং তা দিয়ে কি সুখ পাব, সেকথা ভেবে কি আমরা কাজ করি? অর্থাৎ কোন কাজ করার আগেই কি আমরা হিসেব করতে বসি যে এই কাজে আমরা কতটা সুখ পাব? এবং সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করায় কী? শিজ্‌উইক যথার্থই বলেছিলেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা একটি উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, কোন একটি বস্তু লাভকরার জন্য কাজে প্রবৃত্ত হই। সুখটি আসে ফলশ্রুতি হিসেবে; আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে, সেই প্রার্থিত বস্তুটি আয়ত্ত হলে তবেই সুখ লাভ হয়। প্রথম থেকেই সুখের আকাঙ্ক্ষা করা এবং তার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া—এই ধরনের অভিমত বোধ হয় ঠিক নয়। আমরা সুখের সন্ধান যখন করি তখন প্রকৃতপক্ষে সুখ পাই না। এই প্রসঙ্গে আমরা Paradox of Hedonism বা মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদী কথিত ধাঁধার উল্লেখ করতে পারি। সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়নি। কেননা সুখের জন্য সজ্ঞান প্রয়াস বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সুখ লাভের পথের বিঘ্ন স্বরূপ। শিজ্‌উইক যাকে 'Pleasure of Pursuit' বলেছেন, সেটা

আমরা পাই খেলাধুলা ; বিদ্যাচর্চা প্রভৃতি কাজের মধ্যে। সুখ পাবার প্রকৃষ্ট পন্থা হোল সুখ সুখ করে না কাঁদা ; সুখের চিন্তা ভুলে গেলে তবেই সুখ পাওয়া যায় :

"সুখ সুখ করি কেঁদো না আর
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে ততই বাড়িবে
বিষাদ ভার।"

অতএব একথা বলা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত নয় যে, আমাদের কর্মের প্রেষণার মূলে আছে সুখের আকাঙ্ক্ষা ; আমরা সুখকর বস্তুকে চাইলেই সর্বদা যে আমরা সুখের আকাঙ্ক্ষাই করি একথাটা ঠিক নয়। ম্যাকেঞ্জি বললেন যে, আমরা সুখকর বস্তুকেই সব সময় চাইলেও সর্বদা সুখের অন্বেষণ করি না। এই প্রসঙ্গে তিনি মিলের মত উদ্ধৃত করে বললেন যে, মিল বলতে চেয়েছিলেন আমরা সুখকর বস্তুকে চাই। আমরা সব সময় সুখকে লক্ষ্য করেই কর্মে প্রবৃত্ত হই, একথা যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, শুধুমাত্র সুখানুেষণই আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে না। আমাদের কর্মের প্রেষণা হোল একধরণের সুখকর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা যা আমাদের ইচ্ছার জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গতিপূর্ণ।

যুক্তি ও প্রেষণা (Reason and Motive)

যুক্তির সঙ্গে প্রেষণার নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেছেন ; নীতিশাস্ত্রবিদেরাও সেই সম্পর্কটুকু স্বীকার করেছেন। মানুষের চরিত্রের দুটো দিক আছে ; একটি হল আবেগ-অনুভূতির দিক, আরেকটি হোল যুক্তির দিক। তার প্রেষণাগুলি তার অনুভূতি আবেগ ও ইচ্ছার দ্বারা একদিকে যেমন নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্যদিকে আবার তা যুক্তি এবং বুদ্ধি শাসিত। তবে মানুষের প্রেষণা বা Motive একেবারে যুক্তিশাসিত একথা বলা চলে না। কেননা মানুষ শুধুমাত্র Reational বা বুদ্ধিজীবী নয়। যদি মানুষ শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী হত, তাহলে তার সব প্রেষণাই যুক্তি আশ্রিত হত। কিন্তু মানুষের স্বভাবে তার সহজাত প্রবৃত্তি, তার ক্ষুধা, উত্তেজনা, তার আবেগ অনুভূতি এসবই সম্পূর্ণ-ভাবে ক্রিয়াশীল। বহুক্ষেত্রে আমরা জেনেশুনে অন্যায় করি ; বহুক্ষেত্রে আমাদের পরমার্থ বা Supreme Good সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্বেও আমরা সেই পারমার্থিক বস্তুকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কোন কাজই

করি না। অতএব বুদ্ধি বা যুক্তি যে একমাত্র আমাদের কর্মের প্রেষণা নয়, সেটুকু সহজেই বোঝা যায়। আমাদের কর্মের কি লক্ষ্য হবে, সে সম্বন্ধে জোরালো ওকালতি করে আমাদের আবেগ ও অনুভূতি। কি করে সেই লক্ষ্যে পেঁৗছাতে পারবো সে সম্বন্ধে যুক্তি বা বুদ্ধি নির্দেশ দিতে পারে কিন্তু মূল কর্ম -প্রেরণা আসে Passion বা আবেগ থেকে। এই লক্ষ্যে পেঁৗছাতে হলে যে উপায় অনুসরণ করতে হবে সেটিকে বলে দেওয়া যুক্তি বা বুদ্ধির কাজ। যুক্তি বা বুদ্ধি আমাদের প্রেষণার সবটুকু নয়। অতএব এই প্রেষণা পুরোপুরি যুক্তি শাসিত অথবা একেবারেই যুক্তিহীন, এই দুটোর কোনটাই বলা চলে না। আমাদের প্রেষণার মধ্যে রয়েছে কিছু আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং যুক্তি। অবশ্য আমরা কোন্ লক্ষ্যে পেঁৗছাতে চাই সেটা নির্ধারণ করে আমাদের অভাব-বোধ। ওদিকে আবার কল্যাণের বা শুভের বুদ্ধিগত যে ধারণা আমাদের কাজেকর্মে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে, পরিচালিত করে, সেটি সম্বন্ধেও আমাদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। অতএব আবেগ অনুভূতি এবং যুক্তি—বুদ্ধি এরা যুক্তভাবে আমাদের প্রেষণার বা Motive -এর গতি প্রকৃতির নির্ণায়ক। যে কল্যাণের ধারণা আমাদের অভাববোধকে পূর্ণ করে, তা একদিকে যেমন বুদ্ধি-শাসিত অন্যদিকে আবার তার মধ্যে আবেগ বা অনুভূতির স্পর্শ রয়েছে।

অভ্যাস (Habit)

অভ্যাস হল ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। বারবার একই কাজ করে আমরা অভ্যাসের সৃষ্টি করি। ঐচ্ছিক কর্মের পিছনে থাকে ইচ্ছার নির্দেশ। আমরা স্বেচ্ছায় হয়ত একটি কাজ বারবার করি। সেই কাজ করার ফলেতে ক্রমে তা অভ্যাসগত কর্মে পরিণত হয়। একবার তা অভ্যাসগত কর্মে পরিণত হলে সেই কাজ করতে আর কোনও সজ্ঞান প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং বারবার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয় না। যখন এই অভ্যাসগত কর্ম আমাদের প্রকৃতির মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে স্থাপিত হয়, তখন এটা প্রায় স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অভ্যাস বা অভাসগত কর্মের একটা নৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। ঐচ্ছিক কর্মের পুনরাবৃত্তির ফলেই এই অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। অতএব অভ্যাসগত কর্মকে আমরা নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আনতে পারি। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মতই অভ্যাসগত কর্মকেও আমরা নীতি-শাস্ত্রের আওতায় আনব। কেননা, অভ্যাসগত কর্ম হল ঐচ্ছিক ক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি। অতএব ঐচ্ছিক সমস্ত ক্রিয়াকে যদি নৈতিক মূল্যায়নের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় তাহলে অভ্যাসগত কর্মকে এই নৈতিক মূল্যায়নের

আওতায় আনতে হবে। যারা কুঅভ্যাসের দাস তাদের দোষী সাব্যস্ত ক'রে তাদের কাজের নিয়ন্ত্রণ করেতে হবে। কেননা তারা স্বেচ্ছায় এইসব কদভ্যাস দিনে দিনে সৃষ্টি করেছে। অভ্যাস আবার অন্যান্য ব্যাপারেও চরিত্রের প্রবণতার নির্ণায়ক। অতএব যদি চরিত্রকে নৈতিক মূল্যায়নের উপযোগী বিষয় রূপে গণ্য করা যায় তবে অভ্যাসকেও এই ধরনের নৈতিক মূল্যায়নের যোগ্য বলে বিবেচনা করতে হবে। মানুষের আচার–আচরণ (Conduct) তার চরিত্রের বহি:প্রকাশ মাত্র। আচার–আচরণ বা Conduct বলতে আমরা মানুষের ঐচ্ছিক অভ্যাসগত কর্মকে বুঝি। সদ্‌ধর্ম হোল মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ ; এই উৎকর্ষ মানুষ লাভ করে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অভ্যাসগত পুনরাবৃত্তিতে। সদ্‌ধর্ম বা Virtue-র মধ্যে শ্রেয়: বা Good সম্বন্ধে সম্যক ধারণা এবং এই শ্রেয়:কে সত্য করে তোলার জন্য ঐচ্ছিক ক্রিয়া সমাধানের প্রবণতাকেও বুঝতে হবে। অতএব সদ্‌ধর্ম বলতে আমরা জ্ঞান এবং অভ্যাস এই দুটোকেই বুঝি।

আচরণ (Conduct)

Conduct বা আচরণ বলতে আমরা ঐচ্ছিক এবং স্বভাবগত কাজকর্মকে বুঝি। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া আচরণের মধ্যে পড়ে না ; কেননা বিচার-বিবেচনা, লক্ষ্য নির্ণয়, সিদ্ধান্ত এবং উদ্দেশ্য নিরূপণ এই সবের কোনটাই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশ্যবিহীন ; অতএব তার কোনও নৈতিক মূল্য নেই। বলপ্রয়োগের ভয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা যদি কোন কাজ করি তবে সেই কাজও অনৈতিক বা 'নৈতিক-মূল্য-বিযুক্ত' কাজ বলে গণ্য হবে। আচরণ আমাদের ইচ্ছা থেকে জন্ম নেয় ; কর্মপন্থার নির্বাচন এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে আমরা যখন কাজ করি তখনই তাকে ঐচ্ছিক কর্ম বলা হয় এবং তা আচরণের অন্তর্ভুক্ত হয়। আচার -আচরণের বা ব্যবহারের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট ; অতএব একে উদ্দেশ্য অভিমুখী ক্রিয়া-কর্ম বলা যায়। আমাদের আচরণ আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগ রাখে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হ'লে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলেযে উপায়আমরা অবলম্বন করে থাকি তাও আচরণের অন্তর্ভুক্ত। ভিন্নধর্মী কর্মপন্থার মধ্যে একটাকে আমরা যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে আমরা তা করি। যেসব কর্মপন্থা আমরা নির্বাচন করি তা বিচ্ছিন্ন ঐচ্ছিক কর্ম মাত্র নয়। আমাদের মৌল চরিত্রের প্রভাব এইসব আচারআচরণ নির্ধারণ করে। দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছাকে এক বিশেষ পথে চালিত করলে তবেই চরিত্র গঠিত হয়। অতএব বলা চলে যে আমাদের আচার আচরণ আমাদের চরিত্রে প্রতিবিম্বিত

হয় ; এই মত ব্যক্ত করলেন নীতিশাস্ত্রবিদ্ সেথ্। অবশ্য সেথের চেয়েও ব্যাপকতর অর্থে ও ব্যঞ্জনায় Conduct বা আচরণ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন Herbert Spencer ; তিনি বললেন, মানুষের আচরণ বলতে আমরা বুঝি যে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা তাদের কাজকর্মকে সেই কর্মের সিদ্ধি অভিমুখে চালিত করে। যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অভিমুখে আমাদের সব প্রচেষ্টা ধাবিত হয়, তা অনেকক্ষেত্রেই সচেতন, আবার অনেকক্ষেত্রেই অচেতন কর্মের রূপ নেয় ; অনেকক্ষেত্রেই তা উদ্দেশ্য অভিমুখী বা Purposive ব'লে গৃহীত হ'তে পারে। বহুক্ষেত্রেই আবার তার কোন উদ্দেশ্য থাকে না (Non-purposive)। অতএব বলা চলে, উদ্দেশ্য অভিমুখী সব ক্রিয়া-কর্মই আচরণ বা Conduct-এর অন্তর্ভুক্ত। Herbert Spencer বললেন যে, আচরণ বা Conduct হ'ল ভিতরের সম্বন্ধগুলির সঙ্গে বাইরের সম্বন্ধগুলির সঙ্গতি রক্ষা করা। তাঁর মতে অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকর্মও এই আচরণের অন্তর্গত। কেননা, এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকর্মের ভিতর দিয়েও জীব তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। মানুষের আচরণের মধ্যে আমরা যদি এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকে স্থান দিই তাহলে একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আমরা আগেই বলেছি যে, আচরণ হ'ল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র ; নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সত্যটা সর্বদা গ্রহণ-যোগ্য। আচরণের মধ্যে ঐচ্ছিক ক্রিয়াকর্ম, উদ্দেশ্য-মূলক কর্ম এবং স্বভাবগত কর্ম—এসবই রয়েছে। Conduct বা আচরণ বলতে আমরা শুধুমাত্র উপায় এবং উপেয়ের সমন্বয়টুকুই বুঝব না। আমরা বুঝব যে আচরণের পিছনে আমাদের সদাজাগ্রত সচেতন ইচ্ছাশক্তি সর্বদা কাজ করছে। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলতে গিয়ে স্বাধীন এবং স্ববশ কর্মের দ্বারা তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, তখন তাকে তার আচরণ রূপে গ্রহণ করা যায়।

সঙ্কল্প ও চরিত্র (Will and Character)

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, চরিত্র হল আমাদের আচরণের, আমাদের কর্মাভ্যাসের মৌল ভিত্তি। এর মূলে আছে মানুষের ইচ্ছার বিশেষ এক ধরনের রূপায়ণ। কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অথবা আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যখন কাজ করি তখন সেই কাজ করার অভ্যাসকে চরিত্র 'আখ্যা' দেওয়া হয়ে থাকে। দার্শনিক নোভালিশের মতে চরিত্র হল 'Completely fashioned will'। তাঁকেই আমরা সচ্চরিত্র বলি, যিনি কাজ করেন কর্তব্য-বোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে। অব্যবস্থিত চিত্ত মানুষ বলতে আমরা বুঝি

সেই ধরনের মানুষকে যারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর, লক্ষ্যের বা আকাঙ্ক্ষার ঘন ঘন পরিবর্তন করে। তবে অধিকাংশ মানুষ যে একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কাজ করে, তা নয়। তার বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার জগতের মধ্যে একটা সংলগ্নতা থাকে, বা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। এই নির্দিষ্ট সম্বন্ধটি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন এবং এর দ্বারাই তাদের চরিত্রের বিভিন্নতা নির্দিষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা চরিত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারি। চরিত্র হল মানুষের অভ্যাসগত কর্মের পুনঃ পুনঃ সম্পাদনের ফল; এর মধ্য দিয়েই আমাদের মানস-প্রবণতা জন্ম নেয়; স্বেচ্ছায় আমরা যেসব মানসিক প্রবণতা আয়ত্ত করি তা এই চরিত্রের অঙ্গ। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের চরিত্র। মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতি অর্জনের অপেক্ষা রাখে না কিন্তু চরিত্র অর্জন করতে হয়। মানুষের প্রকৃতি জন্মগত, সে তা নিয়ে জন্মায়। এই প্রকৃতির মধ্যে ভাঙ্গচুর হয় অথবা মানুষ স্বেচ্ছায় তার এই প্রকৃতির ভাঙ্গচুর করে। এইভাবে তার নৈতিক জীবনের কাঠামোটি তৈরী হয়। সহজাত ক্রিয়া, মানসিক প্রবণতা, মানুষের প্রবৃত্তি এসবই আমাদের প্রকৃতি বা Nature রূপে গণ্য হয়। কিন্তু আমরা পরিশ্রম করে চেষ্টা করে আমাদের চরিত্র গঠন করি। তবে সহজাত যেসব প্রবণতা আমাদের মনের মধ্যে থাকে তারই যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ক'রে এই চরিত্রের বনিয়াদকে গড়ে তুলতে হয়। আমাদের সহজ প্রকৃতিকে ভিত্তি করেই আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। আচরণের মধ্যে সেই চরিত্রের প্রকাশ। আচরণ হল বাইরের দিকটি; ভিতরের দিকটি হল চরিত্র। অতএব বলা চলে যে আচরণ চরিত্রের প্রকাশ। এই আচরণের মধ্যে নৈতিক মূল্য প্রতিষ্ঠা পায়। আচরণের নৈতিক মূল্যায়ন করে আমরা মানুষের চরিত্রের নৈতিক মূল্যায়ন করে থাকি। চরিত্র এবং আচরণ পরস্পরের পরিপূরক; একে অপরকে প্রভাবিত করে। আমরা যেসব কাজকর্ম করি তা আংশিকভাবে চরিত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আংশিকভাবে বললাম এই কারণে যে, কাজ করার সময় আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করে থাকি। তবে বলা যায় যে, আমাদের তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছা আবার কিছু পরিমাণে আমাদের সাধারণ ইচ্ছা এবং চরিত্রের (Character) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই চরিত্র আবার স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে নেই। এরও পরিবর্তন হয়; চরিত্র ক্রম-বর্ধমান এবং আমাদের ইচ্ছাকৃত কর্ম এই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়। অতএব বলা চলে যে, চরিত্র এবং আচরণ পরস্পরের নির্ণায়ক; একে অপরকে প্রভাবিত করে।

চতুর্থ অধ্যায়

নৈতিক চেতনা

নৈতিক চেতনার স্বরূপ—Moral Sense theory—নৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও লক্ষণ—নৈতিক চেতনার উপাদান—নৈতিক অনুভূতির প্রকৃতি—নৈতিক অনুভূতি ও নৈতিক বিচার—নৈতিক অনুভূতির গুরুত্ব—নৈতিক চেতনার বিকাশ ও ক্রমপরিণতি।

চতুর্থ অধ্যায়

নৈতিক চেতনা (Nature of Moral Consciousness)

আমরা মানুষের কাজের নৈতিক মূল্যায়ন প্রতিদিনই করি। কাজটা ভালো হল কি মন্দ হল সে সম্বন্ধে সচেতন এবং সজাগ থেকেই আমরা কাজের নৈতিক মূল্যায়নটুকু করি। এই মূল্যায়ন কর্মের পিছনে ভালো মন্দ সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ, তাকেই বলা হয়েছে নৈতিক চেতনা। এটা ভালো ওটা মন্দ, এই কাজটা ভালো ওই কাজটা মন্দ, এই মানুষটি সৎ ওই মানুষটি অসৎ— এই ধরনের বিচার করে আমরা যে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় দিই তাকেই বলা হয় আমাদের নৈতিক চেতনা। আমাদের ঐচ্ছিক এবং অভ্যাসগত কাজ-কর্মের যে মূল্যায়ন করা হয় তার মূলে রয়েছে এই নৈতিক চেতনা। এই নৈতিক চেতনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই ভালোমন্দের ভেদাভেদ বিচারের মূলে আমাদের এই নৈতিক চেতনা কাজ করে। এই চেতনা পশুর মধ্যে নেই। অপরের কাজের মূল্যায়ন, আমাদের নিজের কাজের মূল্যায়ন, মানুষের চরিত্রে বিচার, এই সব আমরা করতে পারি এই নৈতিক চেতনা থাকার ফলে। এই চেতনার বলে আমরা মহৎ কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারি, সেই কাজ করার জন্য আকর্ষণ বোধ করি ; ইতর-জনোচিত কাজ করতে আমরা লজ্জাবোধ করি, এই চেতনাটি থাকার ফলে।

এই নৈতিক চেতনাকে বিবেক বলা হয়েছে। এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা বললেন যে আমাদের চোখ, কান, নাক, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যেমন সাক্ষাৎভাবে দ্রব্যের গুণাগুণ বুঝতে পারে, ঠিক তেমনিধারা নৈতিক চেতনা বা বিবেকও আলোচ্য কর্মের নৈতিক গুণাগুণ অনুধাবন করতে পারে। কাজের ভালো মন্দ ও তৎ অনুস্যূত ন্যায়-অন্যায় গুণ এসবই বিবেক সাক্ষাৎ-ভাবে বুঝতে পারে। এক কথায় বলতে পারি যে এই বোধটুকু তাৎক্ষণিক জ্ঞানলব্ধ ; এর কাজটা দেখেই বলা যায়, এটা ভালো কি মন্দ ; বিচার বিবেচনা করে এই অভিমত ব্যক্ত করতে হয় না। তার জন্য বিবেককে বলা হয়েছে Moral Sense.

এই ন্যায় অন্যায় বোধই যথাযথভাবে পরিশীলিত হয়ে পরে নৈতিক বিচারের রূপ নেয়। কিন্তু মূলত: এই ধরনের ব্যাখ্যা সাক্ষাৎ জ্ঞানলব্ধ বা Intuitive। অবশ্য এই প্রশ্ন উঠবে যে, চোখে দেখা বা কানে শোনার মত

প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের বিবেক দিতে পারে কি না ? আমরা নৈতিক বিচারকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ বললেও তার মধ্যে বিচার বিবেচনা কিছুটা এসে পড়ে। অতএব বিবেকের মধ্যে যুক্তি বিচারের অংশটা খুবই গৌণ হলেও কিছুটা যুক্তি বিচার বোধহয় তার মধ্যে থেকে যায়।

এই Moral Sense Theory-র আরেকটি রূপভেদ হল যে, আমরা যখন কোন ভাল কাজ করি বা কাউকে ভাল কাজ করতে দেখি বা কেউ ভাল কাজ করছে একথা শুনি তখন আমাদের মনে একধরনের অনুমোদনজনিত আনন্দ উপজাত হয় ; মন সেই কাজে সায় দিয়ে উঠে। এটি ঘটে ভালোমন্দ সম্বন্ধে আমাদের মজ্জাগত অনুভূতি থাকার ফলে। ওদেশের পণ্ডিতেরা একে Moral Sentiment বলেছেন। এই Moral Sentiment বা নৈতিক অনুভূতি থাকার ফলেই মন ভাল কাজে সায় দেয় ; খারাপ কাজে কিন্তু মন বিমুখ হয়ে উঠে। এই বিমুখতা বা Feeling of disapprobation—এটা উত্থিত হয় আমাদের নীতি সম্বন্ধীয় মজ্জাগত অনুভূতি থেকে। পরবর্তীকালে হয়তো এই অনুভূতিই নৈতিক বিচারের আকার নেয়।

অবশ্য এখানেও একথা বলা চলে যে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির অন্ধ বিচারের উপর নির্ভর করে হয়তো নৈতিক বিচার বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। নৈতিক বিচারকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে তার মধ্যে বিবেচনা ও যুক্তি থাকা চাই ; পরিবর্তনশীল অনুভূতির কোন সার্বিক আবেদন নেই। কোন নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসেবে আমরা অনুভূতিকে ব্যবহার করতে পারি না। অনুভূতি আমাদের কোন ধ্রুব আদর্শে পৌঁছে দিতে পারে না। চিন্তা, যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই ধরনের আদর্শে পৌঁছুতে পারি। সুতরাং বলা চলে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি যদি বিচার-বুদ্ধি থেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত হয়, তাহলে তারপক্ষে নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে কাজ করাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিবেচনা একেবারেই বিচার বুদ্ধির কাজ নয়। একথা বোধহয় বলা চলে না যে পশুর অনুভূতি থেকে মানুষের অনুভূতি বোধের একটা বিশেষ পার্থক্য আছে, মানুষের অনুভূতি যুক্তি বিচারের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যা নীতি-সঙ্গত সে সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের বিচার বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিক মনস্তত্ত্ব বলছে যে, আমাদের যে কোন মানসিক কর্ম-চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি সবকটির মধ্যেই আমাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে, আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাজ করে। তা যদি হয়, তবে বলা চলে যে এই নৈতিক অনুভূতিও বিচার বুদ্ধির দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত।

নৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও লক্ষণ (Characteristics of Moral Consciousness)

(ক) নীতিচেতনার প্রধান কাজ হোল এর দ্বারাই কোন কাজের, অবস্থার বা ব্যক্তির নৈতিক মূল্য আমরা নির্ধারণ করতে পারি। কোন্ কাজটা ন্যায়, কোন্ কাজটা অন্যায়, কোন কাজ করলে ভালো হবে, কোনটা করলে মন্দ হবে, এই সব আমরা বুঝতে পারি এই নৈতিক চেতনার প্রসাদ গুণে। এটা মানুষের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ ছাড়া অন্য কোন ইতর প্রাণীর মধ্যে এই ধরনের নৈতিক চেতনা নেই।

(খ) নৈতিক চেতনা বিচারও যুক্তিকে আশ্রয় করে। আমাদের তর্ক-শাস্ত্রকথিত বুদ্ধিগত শক্তি থেকে এই নৈতিক শক্তি খুব একটা ভিন্ন ব্যাপার নয়। আমরা যুক্তি ও বুদ্ধির সহায়তায় তর্ক করি বা তর্কশাস্ত্রসম্মত বিচার বিশ্লেষণ করি। সেই একই বুদ্ধি আবার মানুষের নৈতিক কাজকর্মের মূল্যায়ন করে। অতএব বলা চলে যে, নৈতিক চেতনার মূলে বিচার এবং যুক্তি সব সময় কাজ করে চলেছে।

(গ) নীতিশাস্ত্র আদর্শাশ্রয়ী। এই নৈতিক আদর্শের উপর দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা হল নৈতিক চেতনার অঙ্গ। আদর্শ ব্যতীত নৈতিক চেতনা কাজ করতে পারে না। এই আদর্শের আলোকেই মানুষের চেষ্টাকৃত কাজকর্ম, ঐচ্ছিক বা অভ্যস্থ আচরণ, এসবের মুল্যায়ন করা হয়। এই নৈতিক আদর্শ মানুষের নৈতিক বিচারের মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে দেয়।

(ঘ) এই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে, নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠির সঙ্গে আমাদের জীবনের প্রয়োজনটুকু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনে, সামাজিক মানুষের প্রয়োজনে এই আদর্শের রূপান্তর ঘটে। আর এই আদর্শের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠিও বদলায়। তাই রামমোহন রায়ের যুগে সতীর অবশ্য-কর্তব্য ছিল মৃত স্বামীর সঙ্গে সহ-মরণে যাওয়া। পরবর্তী যুগে সেই কর্তব্যের বদল হয়েছে। কেননা, আজ আর রমণীর জীবনে স্বামীর মরণে অনুগামী হওয়ার আদর্শ বড় বলে গৃহীত হয় না। নারীর পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতাই নারীকে সহমরণে বিরত করেছে। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকারটুকু নারী নিজের হাতে নিয়েছে। তাই আজ আর মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়া বা অনুরূপ কোন আদর্শের পরিপূর্তির দিকে তারা লক্ষ্য করে না। নৈতিক চেতনার মধ্যে এক ধরনের শাসন প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা যখন কোন কাজকে নীতি-সম্মত বলে জানি, তখন এই বোধটুকু আমার মধ্যে জাগে যে, এই কাজ আমাকে

করতেই হবে। এই শাসন মনের আগ্রহটিকে নৈতিক চেতনার মধ্যে লুক্কায়িত রাখে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই বাধ্যবাধকতাটি (Sense of obligatoriness) নৈতিক চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(চ) নৈতিক চেতনাকে আমরা ব্যক্তি বিশেষের সম্পদ বলে মনে করি না। এই চেতনা কাজ করে সমাজকে আশ্রয় ক'রে, আমার প্রতিবেশী মানুষদের অবলম্বন করে। এই চেতনাটুকু আছে বলেই সমাজ জীবনে সুস্থ এবং স্বস্থ হয়ে থাকতে পারে। বাইবেলে বলা হোল, "Love thy neighbour as thyself" অর্থাৎ তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালোবাসতে হবে। বাইবেলের এই কথাটি মানুষের নবোদিত নৈতিক চেতনার বৈশিষ্ট্যের কথা।

নৈতিক চেতনার উপাদান (Elements of Moral Consciousness)

তাহলে একথা আমরা বলতে পারি যে, নৈতিক চেতনার মধ্যে শুধুমাত্র অনুভূতি বা আবেগ নেই। এরমধ্যে বুদ্ধিগত, অনুভূতিগত এবং ইচ্ছা বা কর্মগত উপাদানও রয়েছে।

(ক) আমরা যখন কোন নৈতিক ব্যাপারে রায় দিই তখন আমরা মনে মনে নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠিটাকে তৈরী করে নিই আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি মত। অধিকার সম্বন্ধে, কর্তব্য সম্বন্ধে, ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে, কাজের গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা যেসব ধারণা বহন করি তা থেকেই কাজটা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার দায়িত্ব সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হয়ে উঠি। কাজটা করলে আমরা কতখানি নীতিগতভাবে দায়ী থাকব সেজন্যও আমাদের একটি মোটামুটি ধারণা থাকে। এইসব হল, নৈতিক চেতনার অভ্যন্তরে যে বুদ্ধি কাজ করে, তার ক্রিয়া। এগুলি সবই হোল জ্ঞানগত বা Cognitive।

(খ) কোন একটি কাজের বিচার করতে বসলে আমাদের মনে এক ধরনের আগ্রহ অথবা অন্য ধরনের বিতৃষ্ণার অনুভূতি জাগে। হয় আমরা কাজটা সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করি এবং কাজটা সম্পাদনে মন সায় দেয়, অথবা মন বিমুখ হয় (Feeling of Approbation or Dis-approbation)। কাজটাকে ভালো ভাবলে আমাদের মনে এক ধরনের আনন্দ হয়; যদি কাজটাকে খারাপ বিচার করি তাহলে মনের মধ্যে এক ধরনের বিতৃষ্ণা জাগে। যখন গরীব মানুষকে একটু সাহায্য করতে পারি তখন মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি আসে, একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। আর যদি কোন খারাপ কাজ করি তবে মনের মধ্যে এক ধরনের ক্লেশ জাগে, অনুশোচনা জাগে। নৈতিক আদর্শের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা থাকায় এই সব ক্ষেত্রে আনন্দ বা দুঃখ

বোধের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। এই যে যেসব অনুভূতির কথা বললাম, এরা আমাদের নৈতিক বিচারের নিত্য সঙ্গী। অবশ্য এই অনুভূতি দিয়ে নৈতিক বিচারের যাথার্থ্য সূচিত হয় না। এই ধরনের অনুভূতি হোল নৈতিক চেতনার অঙ্গ বিশেষ।

(গ) নৈতিক চেতনা আমাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে; নৈতিক চেতনা হ'ল বিচার বুদ্ধির নিয়ন্তা। আবার এই বিচারবুদ্ধি মানুষের সর্বোচ্চ শ্রেয় বা পরমার্থের (Highest good) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নৈতিক বিচারের মধ্যে আমাদের কর্তব্য বোধও প্রচ্ছন্ন থাকে। কোন একটি কাজকে ভালো বলে জানলেই সেই কাজটি করার জন্য এক ধরনের বাধ্যবাধকতা (obligation) আমরা বোধ করি। একে কর্তব্য বোধ বলা হয়েছে। যা কিছু ভালো তা আমাদের কর্তব্য, যা ভালো নয়, তা আমাদের কর্তব্য কর্মও নয়। অর্থাৎ ভালোকে, ন্যায়কে জানা এবং বোঝার সঙ্গে সেই ভালো বা ন্যায়সঙ্গত কাজ করার জন্য একধরনের বাধ্যবাধকতা আমরা বোধ করে থাকি। এটা হল নৈতিক চেতনার কর্মের দিক; এটা হল ইচ্ছাশ্রয়ী।

সত্য কথা বলা নীতিসম্মত, এটা আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝি। এই নীতি-সম্মত কর্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে আমরা আনন্দ পাই এবং সত্য কথা বলার জন্য আমাদের মনে একটা ইচ্ছা বা প্রেরণা জাগে। নৈতিক বিচারে, নৈতিক অনুভূতিতে এবং নৈতিক কর্মসম্পাদনে আমাদের বাধ্যবাধকতা বোধ, এগুলি হ'ল নৈতিক চেতনার বুদ্ধিগত, অনুভূতিগত এবং ক্রিয়াগত উপাদান।

নৈতিক অনুভূতির প্রকৃতি (Characteristics of Moral Sentiment)

আমাদের কল্পনা সম্পর্কিত আদর্শ থেকে নৈতিক অনুভূতি বা Moral Sentiment-এর জন্ম। কোন কাজকে ভালো বলে জানলে যে সুখ বোধ হয়, খারাপ বলে জানলে মনে যে বিতৃষ্ণা জাগে, খারাপ কাজ করলে অনুশোচনা হয়, ভালো কাজ করলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, এসবই হল নৈতিক অনু-ভূতির কাজ। নৈতিক আদর্শের জন্য যে শ্রদ্ধাবোধ, তাও এই নৈতিক অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত। নৈতিক অনুভূতি মনের ব্যাপার হ'লেও তার প্রয়োগ হ'ল সামাজিক। অর্থাৎ প্রয়োগে এর সামাজিক দিকটাই প্রধান। এই অনুভূতি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কটি নির্ণয় করে, মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। নৈতিক অনুভূতি বৈরাগ্যের দ্বারা চিহ্নিত। এই অনুভূতির জগতে আমরা আমাদের ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখি না। সামগ্রিক কল্যাণের কথাটা নৈতিক অনুভূতির কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়।

নিমজ্জমান বালকটিকে বাঁচাতে হলে আগে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার ; আমি কতখানি সাঁতার জানি, বালকটিকে জল থেকে টেনে তুলতে পারবো কি না, এইসব কথা ভাববার অবকাশ নৈতিক অনুভূতি দেয় না। ছেলেটা জলে ডুবে যাচ্ছে দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার এই কাজটা হল নৈতিক অনুভূতির কাজ। বুদ্ধিগত বিচার বিশ্লেষণ, এইসব কিন্তু নৈতিক অনুভূতির আওতায় পড়ে না। নৈতিক অনুভূতি মূলতঃ ক্রিয়া কেন্দ্রিক **(Practical)**। ভালো কাজ করতে হবে ; মন্দকাজ সর্বদা পরিত্যাজ্য নৈতিক অনুভূতি এই ধরনের নির্দেশ দেয়।

নৈতিক অনুভূতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাধ্যবাধকতা বোধ। যে কাজকে আমরা ভালো বলে জানবো, অনুভব করবো যে, এ কাজটা ভালো, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই কাজটি করার জন্য একধরনের বাধ্যবাধকতা বোধ অনুভব করব। 'সত্য কথা' বলা উচিত, এটা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য কথা বলার জন্য এক ধরনের বাধ্যবাধকতা বোধ মনের উপর চেপে বসে। আবার চুরি করা মন্দ কাজ এটা জানার এবং বোঝার সঙ্গে সঙ্গে, এই সত্যটুকু অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে, আমি চুরি করা থেকে নিবৃত্ত হই। চুরি না করার জন্য মনে মনে আমরা এক ধরনের বাধ্যবাধকতা অনুভব করি।

এই সত্য কথা বলা, চুরি না করা, দু:স্থের সেবা করা, এই ধরনের যেসব নৈতিক সৎ কাজের কথাই বলি না কেন, সবগুলিই হল সমাজাশ্রয়ী। সমাজকে ছাড়া অর্থাৎ সমাজের মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ-বদ্ধ হওয়া ছাড়া নৈতিক অনুভূতির বা Moral Sentiment-এর কোন মূল্যই নেই। একটি কাজকে ভালো বলব, তার সেই ভালো হওয়ার মাপকাঠিটা নিরূপিত হবে তা আর পাঁচ জনে ভালো বলছে কি না সেই বিচারে। অতএব, আমার কাজের সঙ্গে আর পাঁচজনার ভালো মন্দের যে আবশ্যিক সম্বন্ধ রয়েছে সেটিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। অর্থাৎ অপরের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ জীবনে ছোট ছোট জীবনের পটভূমিতে আমাদের প্রত্যেকটি কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করতে হবে। অতএব বলা চলে যে, নৈতিক অনুভূতি মুখ্যত: সমাজাশ্রয়ী।

নৈতিক অনুভূতির সঙ্গে নৈতিক বিচারের সম্বন্ধ (Relation of Moral Sentiment and Moral Judgment)

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, যখন আমরা কোন কাজকে 'ভাল' বলে বিচার করি তখনই আমাদের মন যদি সেই কাজটা ভালো মনে করে তাহলে সেই কাজের সম্পাদনে সায় দেয়। একে ওদেশের নীতিশাস্ত্রবিদেরা

Feeling of Approbation বলেছেন। অর্থাৎ কোন কাজকে ভালো বলে চেনার সঙ্গে সঙ্গে মনে একধরনের সুখোৎপাদন ঘটে। Moral Sense Theory-র প্রবক্তরা বলেন যে, আমরা আগে কোন একটি কাজকে ভালো বলে অনুভব করি তারপরে সেই অনির্দিষ্ট অনুভূতিকে এইভাবে নির্দিষ্ট নৈতিক বিচারের রূপ দান করি। অর্থাৎ আমরা আগেই কাজের ভালো বা মন্দটুকু অনুভব করি, অনুভূতির সহজ পথে সেটুকু জেনে নিই। তারপর সেই কুয়াসাচ্ছন্ন অনুভূতিকে নির্দিষ্ট বিচারের রূপ দান করি। এ হল অনুভূতি বোধের কথা। আবার বুদ্ধিবাদীরা বলেন যে, যুক্তির সাহায্যে আমরা প্রথম একটি কাজকে ভালো বলে বিচার করি। তারপর সেই কাজটিকে ভালো বলে জানার ফলে আমাদের মনে আনন্দ অনুভূতির উদ্ভব হয়; অতএব এ আনন্দ হ'ল বিচার অনুসারী অথাৎ তা যুক্তি বিচারের অনুসরণ করে। অনুভূতি-বাদীদের বিরুদ্ধে যুক্তি বিচারের অগ্রগণ্যতা হিসাবে জোরালো যুক্তি ব্যবহার করা হয়।

অনুভূতিবাদীরা (Moral Sense Theorist) বলেন যে, আমাদের নৈতিক অনুভূতি বা বিবেক কর্মের নৈতিক গুণাগুণকে দর্শন মাত্রই উপলব্ধি করে। ভালো কাজটাকে জানার ফলে আমাদের মন যে সায় দেয়, মনে যে সুখবোধ ঘটে তার ফলে আমরা বুঝি যে কাজটা ভালো। কাজটা মনের বিতৃষ্ণা ঘটালে বিবেক আর কাজটাকে ভালো বলে না; কাজটা সম্পাদনে মন সায় দেয় না। সায় দেওয়া বা না দেওয়া, এটাকে যদি আমাদের নৈতিক বিচারের পূর্বগামী ঘটনা বলে মনে করি, তাহলে বলতে হয় যে, নৈতিক অনুভূতিই হোল নৈতিক বিচারের পূর্বগামী। অবশ্য একথা বলতে চাইলেন Moral Sense Theory-বাদীরা।

কিন্তু এই তত্ত্বটিকে কি সত্য বলে গ্রহণ করা যায়? একই মন সায় দেবে কখন, আবার কখন বা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠবে? তা কেমন ক'রে হয়? এটি তখনই সম্ভব হ'বে যখন আমরা কাজের গুণাগুণ বিচার ক'রে দেখে কাজটিকে ভালো অথবা মন্দ বলে জানতে এবং বুঝতে পারব। ভালো মন্দ বোধের পূর্বেই কেমন করে এই অনুভূতি আসতে পারে মনের মধ্যে তা আমাদের বিচার বুদ্ধির অতীত। তাছাড়া নৈতিক অনুভূতি বা Moral Sentiment হ'ল একেবারে ব্যক্তি সাপেক্ষ এবং ব্যক্তি নির্ভর। আমার নৈতিক অনুভূতির সঙ্গে অপরের নৈতিক অনুভূতির অনেক তফাৎ। তা যদি হয় তবে কি ক'রে আমরা এই অনুভূতিকে নৈতিক বিচারের ভিত্তি ভূমি বলতে পারি। আবার আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের একথা বলছে যে, নৈতিক অনুভূতি বহুক্ষেত্রেই

নৈতিক বিচারের অনুগামী হয়েছে। যখন বলা হয়, সতীদাহ প্রথা বহুদিন ধরে আমাদের দেশে নৈতিক সমর্থন পেয়েছিল। রামমোহন রায়ের পরবর্তী যুগে সেই সমর্থন আর রইল না। যতদিন সমাজের নৈতিক বিচারে সতীদাহ প্রথা 'সৎ এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে ততোদিন আমাদের নৈতিক সমর্থনও তার পিছনে ছিল ; আমাদের সকলের সায় (Moral Approbation) ছিল এই প্রথার পিছনে। কিন্তু পশ্চিমী শিক্ষার আলোকে আমরা যখন মেয়েদের মর্যাদার নতুন করে মূল্যায়ন করলাম, তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে নতুন ক'রে সচেতন হলাম তখন সতীদাহের উপরে আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত উচ্চারিত হল। আমাদের নতুন নৈতিক বিচারের সঙ্গে নূতন অনুভূতি বোধও আমাদের মনে জন্ম নিল ; সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল (Moral disapprobation)।

অতএব একথা বলা চলে, নৈতিক অনুভূতি, নৈতিক বিচারের ভিত্তি-ভূমি হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। নৈতিক বিচার অন্ধ নয়। ভালো-মন্দের যাথার্থ্য বোধের উপরেই এই নৈতিক বিচার প্রতিষ্ঠিত। আবার এই ভালোমন্দ বোধের শুরুতেই রয়েছে ভালোমন্দের প্রচ্ছন্ন বিচার। সুতরাং বলা চলে যে, আগে বিচার, পরে অনুভূতি, এই অনুভতি বিচারের অনুসঙ্গী। আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত যখন পালটে যায়, বৃহত্তর জীবনবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তখন আমাদের অনুভূতিরও রূপান্তর ঘটে। সুতরাং বলা চলে যে, নৈতিক অনুভূতি নৈতিক বিচারের উপর নির্ভর করে। নৈতিক বিচারের বদল হলে তার অনুষঙ্গী অনুভূতিও পালটে যায়। যুক্তিবাদী (বা Rationalist Theory) বলে যে, যখন আমরা বুদ্ধি দিয়ে বিচারের দ্বারা কোন কাজকে মন্দ বলে বুঝি তখন আমাদের মনে এক ধরনের বিতৃষ্ণা জাগে। অতএব বলা চলে, নৈতিক অনুভূতি নৈতিক বিচারের অনুসরণ করে ; নৈতিক অনুভূতি নৈতিক বিচারের পটভূমি হতে পারে না।

তবে আমরা এই প্রসঙ্গে একথা বলব যে, নৈতিক অনুভূতির গুরুত্ব আমাদের নৈতিক জীবনে কম নয়। এই নৈতিক অনুভূতি আমাদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। যে কাজকে ভালো বলে বুঝি সেই কাজ আমরা করার জন্য উৎসাহ পাই এই অনুভূতি থেকেই। আবার যে কাজের ধারণা আমাদের মনে বিতৃষ্ণা জাগায় সেই কাজ করতে আমরা পরান্মুখ হই। তাহলে নৈতিক অনুভূতি হোল সেই লাগাম, যা দিয়ে মনের প্রবৃত্তির ঘোড়াটিকে সংযত করা যায় অথবা জোর কদমে ছুটিয়ে দেওয়া যায়।

মানুষের সভ্যতার আদিতে যখন তার নৈতিক বোধটা অনগ্রসর ছিল

তখন নৈতিক অনুভূতি হয়তো নৈতিক বিচারকে প্রভাবিত করেছিল, একথা বলা চলে। অন্ধ প্রথাকে যখন আমরা অনুসরণ করি তখন আমাদের নৈতিক বিচারকে, নৈতিক অনভূতিকে অনুসরণ করে চলে। কিন্তু মানুষ যখন শিক্ষিত হয়েছে, সভ্যতার প্রাগ্রসর অবস্থায় উপনীত হয়েছে তখন তার নৈতিক অনুভূতি আমাদের নৈতিক বিচারকে অনুসরণ করে ; বা এক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির কাজটাই বেশী। অবশ্য সমাজ স্বাভাবিক নৈতিক অনুভূতিকে বহুক্ষেত্রেই বদলে দিয়েছে। সমাজে যখন বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল তখন তৎকালীন মানুষের নৈতিক অনুভূতি তাতে সায় দিয়েছিল, বিবেকও তাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু শিক্ষার অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক অনুভূতি পালটে গেল ; বিবেকের নির্দেশ বা Voice of Conscience অনুভূতির রূপান্তর ঘটিয়েছিল। কর্তব্যবোধের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখবোধ এবং দু:খ বোধও ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হ'ল। এই অনুভূতির সঙ্গে যুক্তির এবং বিচারের সম্বন্ধটুকু পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্বন্ধ। অতএব আমাদের নূতন করে নৈতিক অনুভূতিকে গড়ে তুলতে হ'বে যুক্তি বিচারের মাধ্যমে। কেননা সঠিক যুক্তি বিচার প্রাণবন্ত অনুভূতিকে রূপায়িত করে।

নৈতিক চেতনার বিকাশ ও ক্রমপরিণতি (Development of Moral Consciousness)

মানুষের নৈতিক চেতনার বিকাশ ও পরিণতি একটি ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা। আমরা এই যুগে মানুষের মধ্যে যে পরিণত নৈতিক চেতনাকে প্রত্যক্ষ করি তা কিন্তু একদিনে অর্জিত হয় নি। দীর্ঘদিনের সাধনার ফলে এই পরিণত নৈতিক চেতনা রূপ পেয়েছে। সভ্যতার সেই আদিম যুগে মানুষের নৈতিক চেতনা ছিল অপরিপুষ্ট। নৈতিক চেতনা একেবারেই ছিলনা অসভ্য মানুষের মধ্যে একথা বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ হবে। সভ্যতার আদিম পর্যায়েও মানুষের নৈতিক চেতনা ছিল অপরিস্ফুট। সেই যুগে মানুষ গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করত। এই গোষ্ঠী বা দলের আচরণ বিধির ব্যতিক্রম ঘটলে গোষ্ঠী শাস্তি বিধান করত। অর্থাৎ সেই যুগে গোষ্ঠীর আচরণ বিধি ছিল ন্যায় নির্ধারণের মাপকাঠি। তার ব্যতিক্রম ঘটলেই সেই ব্যতিক্রমকে ক্ষমাহীন অপরাধ বলে গণ্য করা হ'ত। এই গোষ্ঠী আচরণ-বিধি আদিম মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং ন্যায়নুসারী বলে বিবেচিত হয়েছিল। সেই প্রবৃত্তির ভগ্নাবশেষ ফ্রয়েড পন্থীরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন আধুনিক শিশু ও তাদের পিতামাতার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমতার মধ্যে। বাপ-

মা যে মতে বিশ্বাস করে, যে পথে চলে, শিশু শৈশব থেকে তাকে অনুসরণ করে। এই ভাবেই পিতামাতার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গীর একাত্মতা ঘটে। বাপ-মা যাকে নিন্দা বা প্রশংসা করে, যোগ্য বলে মনে করে, শিশুও তাকে সেই ভাবেই বিচার করে। সভ্যতার আদিম যুগে, অল্প সভ্য মানুষ তার নৈতিক বিচার বিবেচনাকে গোষ্ঠীর নৈতিক বিচার বিবেচনার কাছে সমর্পন করে দিয়েছিল। গোষ্ঠীপতির কাছে যা ন্যায়সঙ্গত, সেই গোষ্ঠীর মানুষের কাছেও তা ছিল গ্রহণযোগ্য। এই যে মানুষের গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম বোধ করা, একে সমাজতত্ত্ববিদ Clifford, 'The tribal-self' আখ্যা দিয়েছেন; গোষ্ঠীর আচরণবিধির বিরুদ্ধে কোন কাজ গোষ্ঠীরভুক্ত মানুষেরা করলেই গোষ্ঠী সেই কাজের নিন্দা করত। ব্যক্তির ন্যায় অন্যায়ের বোধ সভ্যতার সেই স্তরে কেবলমাত্র যে অনুকরণ ও ইঙ্গিতের (Imitation and Suggestion) ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দিয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। গোষ্ঠীর নিরাপত্তার আদর্শ ব্যক্তি মানুষের জীবনে নৈতিক আদর্শের প্রতিরূপ বলে মনে হ'ত। নীতিশাস্ত্রবিদ Mackenzie বললেন: প্রথাগত নৈতিক ব্যবহার বিধি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবনে ক্রমেই প্রাধান্য বিস্তার করে; এই ধরনের প্রথাগত ক্রিয়াপদ্ধতি গোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করে; তাই তারা গোষ্ঠী বা সমাজ জীবনে সকলের দ্বারা অনুমোদিত এবং সযত্নে রক্ষিত হয়। সমাজের মানুষেরা যখন এই ব্যবহার বিধির অনুমোদন করে তখন তারা গোষ্ঠীর বা সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মূল্যায়ন ও বিচার করে। কিন্তু সামজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে বিচার করা হয় এ সম্বন্ধে সমাজের মানুষেরা সচেতন থাকে না; এ একধরনের অর্ধচেতন বিচার প্রক্রিয়া। এটা এই ভাবে ঘটে, তার কারণ সমাজের মানুষেরা এই সামগ্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটিকে দেখতে পারেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গীটিই তাদের একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী। ['Customary modes of action grow up in the life of a people, that those modes of action that are favourable to its welfare tend on the whole to be selected and preserved and that those modes of action also tend on the whole, to be approved. In thus approving, the individual puts himself at the point of view of his tribe, but he does so unconsciously; it does not occur to him that it would be possible for him to take up any other point of view.]*

---

*A Manual of Ethics, পৃ: ১৯

গ্রাম সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে গ্রাম্য জীবন থেকে, গোষ্ঠী জীবন থেকে ক্রমে আমরা বৃহত্তর নৈতিক জীবনে উত্তীর্ণ হলাম ; মানুষের প্রগতির ফলে মানুষ নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখল ; আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন হল। এরপরই এলো আত্ম সমীক্ষা ও আপন আপন কর্মের মূল্যায়ন। সেই সঙ্গে অপরের কর্মের বিচারও সে করতে শিখল নীতিসম্মত পদ্ধতিতে। এই বিচারে যুক্তি-বিবেচনা হল তার প্রধান সহায়। মানুষের নৈতিক বিচারে সামগ্রিক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনার কল্যাণের কথাও চিন্তা করল ; এই কল্যাণ চিন্তা তার নৈতিক যুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

অবশ্য একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না যে, ব্যক্তির নীতি-বোধের এই পরিণাম একেবারেই আকস্মিক নয়। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আমরা এই তিনটি প্রধান স্তর দেখতে পাই। প্রথম স্তর, গোষ্ঠীর আচার ও প্রথা নৈতিক মান নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড। দ্বিতীয় স্তরে এই গোষ্ঠীর প্রথা এবং আচরণগুলিকে দেশের আইন রূপে গণ্য করা হয়েছে এবং মানুষের কাজকর্ম যখন সেই আইনের সঙ্গে মিলেছে এবং তার অনুকূল হয়েছে, তখন তাকে নৈতিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গোষ্ঠীর আইনই হল নীতির মান নির্ণায়ক। অবশ্য বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, আইনের বিচারে আমরা আমাদের নৈতিক মূল্যকে যথাযথভাবে সত্য করে তুলতে পারি না। আইন যে কথাই বলে সে কথায় বিবেক সায় দেয় না। যখন ত্রুটি ঘটেছে তখন মানুষ বিবেকের আইনকে (Law of Conscience) সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অপব্যয়ের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে পিতৃঋণের বোঝা স্বেচ্ছায় বহন করতে হয়েছিল, তার জন্যই তিনি মহর্ষি আখ্যা পেয়েছিলেন। দেশের আইনের চোখে তাঁকে অধমর্ণ রূপে দাঁড় করানো চলত না। পিতৃ-ঋণের নৈতিক দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেন? এই বিবেকের আইন (Law of conscience)—তার নির্দেশ। এই বিবেক যখন জাগ্রত হয় তখন আমরা যে ধরনের নৈতিক বিচার করি, সেই বিচার হল অন্তরের দিক থেকে ; মানুষের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় এর পিছনে কাজ করে ও তার চরিত্রের প্রকাশ ঘটে এর মধ্য দিয়েই। মানুষ তখন বুঝতে শেখে যে, সাংসারিক লাভক্ষতির হিসেবের উর্ধ্বে আর একটি হিসেব আছে সেই হিসেব বিবেকের নির্দেশে চলে ; সেই হিসেব অন্তরের হিসেব, সেই হিসেবে কোন পুরস্কারের প্রলোভন, কোন তিরস্কারের ভয় একেবারেই থাকে না। বিবেকের নির্দেশ শুধুমাত্র অন্ধ হৃদয়াবেগ নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিচার-বুদ্ধি পরিমার্জিত

সংস্কৃত মানুষের নীতিবোধই হোল বিবেক। বিবেক ব্যক্তি মানুষের স্বার্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম থেকে এই বিবেক উদ্ভূত হয়। মানুষ স্ববশ্যতার বশেই বিবেক বোধের মর্যাদা রক্ষা করে। তা হলে উপসংহারে আমরা একথা বলতে পারি যে, গোষ্ঠীগত প্রথাও আচার আচরণ থেকে রাষ্ট্রীয় আইন উদ্ভূত হয়। এই আইনশৃঙ্খলা বোধ থেকেই কর্মে সার্বিক নৈতিক বোধের ধারণা জন্ম নেয়। দ্বিতীয়ত: একথা বোঝা গেছে যে, কর্মের ফলাফল দেখে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রথমাবস্থায় নৈতিক বিচারের সংজ্ঞা নির্ণীত হয়ে থাকে। অবশ্য পরে এই বিচারের মাপকাঠি হয়ে ওঠে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের বিশুদ্ধতা। অর্থাৎ বাইরের ফল দেখে কাজের নৈতিক মূল্যের বিচার হয় না। যে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় নিয়ে আমরা কাজ করি তার বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ একথা বলা যায় যে, নীতিবোধ কাল, অবস্থা ও গোষ্ঠীর আশ্রয় ভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন ধারার এবং ধরনের নৈতিক আচরণের মধ্য দিয়ে কর্মের লক্ষ্যের একটা সর্বকালীন এবং সার্বজনীন নৈতিক আদর্শের উদ্ভব হয়। এই আদর্শের মূল্যকে চিরন্তন মূল্য বলা হয়েছে। সাংসারিক সুবিধা অসুবিধা, সাংসারিক মূল্য বোধ, এসবই এই সার্বজনীন আদর্শের কাছে 'এহ বাহ্য' অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক। এই উচ্চতম নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এরা গ্রাহ্য নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিক দায় (Moral obligation)

নৈতিক দায়ের প্রকৃতির ব্যাখ্যা ; নৈতিক দায়ের উৎস ; সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ভগবদ্ বিধি—প্রেয়োবাদীদের অভিমত—বেন্থামের অভিমত—অন্তর্দৃষ্টিবাদীদের মত—যুক্তিবাদীদের অভিমত—সম্পূর্ণতাবাদীদের মত—নৈতিক বিধি, প্রাকৃত বিধি ও রাষ্ট্রীয় বিধির প্রকৃতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা—বিবেক ও সাংসারিক বুদ্ধি।

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিক দায় (Moral obligation)

এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা যে, বহুক্ষেত্রেই যে দায় আমরা পালন করে থাকি স্বেচ্ছায় সেই দায় পালন করার মধ্যে কোন বাইরের শক্তির নির্দেশ বা পুরস্কারের প্রলোভন বা তিরস্কারের ভীতি এসব কিছুই থাকে না। যে কাজকে আমরা ভালো বলে জানি বা বুঝি, সেই কাজ করার জন্য আমরা মনের মধ্যে একধরনের আকুতি বোধ করি। এই দায় বোধ, এই আকুতি এর স্বরূপটা কি? যে কোন কাজকে ভালো বলে জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা ভিতর থেকে যে প্রেরণা পাই, যে অনুচ্চারিত আদেশ (Imperative) লাভ করি তা হল, নীতিবোধের আদেশ; দার্শনিক কাণ্টের ভাষায় categorical Imperative। আবার যখন আমরা ভুল করে অন্যায় করি, পাপের পথে অগ্রসর হই তখন আমাদের বিবেক আমাদের ডেকে বলে ওই ঘৃণিত পথে আমাদের না যেতে। এইযে মানুষকে সৎ কর্মে প্রেরণা দেওয়া ও অসৎ কর্ম থেকে তাকে নিবৃত্ত করা, এটাই হ'ল বিবেকের কাজ। বিবেক এই কাজটা ক'রে মানুষের মনুষ্যত্বের মধ্যে যে নৈতিকতা লুকিয়ে থাকে তারই নির্দেশে। মানুষ হল এই নৈতিক সত্তা বা Moral Entity; এই সত্যাই মানুষের কাছে আনুগত্য দাবী করে যে যদি এই আদেশ ঈশ্বরের হয়, সে ঈশ্বরই আমার অন্তরস্থ ঈশ্বর। বেদান্তের 'সো হহং' মন্ত্র আমার মধ্যে সেই পরম ব্রহ্মের স্থাপনা করে; তারই আদেশে আমি নৈতিক জীবন যাপন করি। এই আদেশ মানুষের কর্তব্য নির্দেশ করে দেয়। অবশ্য মানুষ এই নৈতিক আদর্শের নির্দেশেই একমাত্র কাজ করে বললে ভুল বলা হবে। এই নৈতিক আদেশ আদর্শ হিসাবে থাকলেও কাজ করা বা না করার স্বাধীনতা মানুষের আছে। যদি তুমি এই কাজ না কর তবে সেই না করার দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি এই নৈতিক দায়ের উৎস কোথায়?

আইন (ভগবৎ, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক) কি নৈতিক দায়ের উৎস?

এমন কথা বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণ করাই হল নীতি-

সম্মত কর্ম ; এই মতের প্রবক্তা হলেন পেইলি (Pailey)। তিনি বললেন যে, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে মানুষ যদি কাজকর্ম করে, সেই কাজই হবে নীতি-সঙ্গত। ঈশ্বর পরম শক্তিমান ; তিনি ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেন : তাঁর ভয়েই বিশ্বজগৎ চলছে, তাঁর আদেশ অমান্য করলেই তিনি কঠিন শাস্তি দেন ; অবস্থা বিশেষে পাপের গুরুত্ব অনুসারে অনন্ত নরকবাসের ভয়ও আছে। ভগবান আমাদের একদিকে যেমন অনন্ত নরকবাসের ভয় দেখান, অন্যদিকে আবার সুখ ভোগেরও লোভ দেখান : ভালো কাজ করলে মানুষের ভাগ্যে এই স্বর্গ লাভ ঘটবে। অবশ্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই ধরনের ভগবৎ শক্তিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। বাইরের কোন শক্তির নির্দেশে মানুষ যে ভালো কাজ করবে বা মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে, এই ভাবনাটাই মানুষের পক্ষে সম্মানজনক নয়। বাইরের শাসনে কোন নৈতিক কাজ করলে সেই কাজের মূল্যের হানি ঘটে। অতএব সর্বশক্তিশালী ভগবানকে নৈতিক উৎস, ও সর্ব-কর্ম-নিয়ন্তা বলে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি আছে।

ভগবৎ বিধিবিধানের বিরুদ্ধবাদীরা অনেকে বলেছেন যে, সমাজের বা রাষ্ট্রের শাসনই হল নৈতিক বাধ্যবাধকতার মূল উৎস। সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষকে শাসন বা পীড়নের প্রভূত ক্ষমতা রাখে। অতএব সমাজ এবং রাষ্ট্র যে নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করেছে সেই আদর্শকে সামাজিক মানুষদেরও গ্রহণ করতে হবে ; গ্রহণ না করলে তিরস্কারের ভয় থাকে, গ্রহণ করলে থাকে পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা। সমাজ বা রাষ্ট্রের এই ধরনের শক্তি নৈতিক আদর্শ রক্ষার অনুকূল কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বাইরের শাসন কখনও মানুষকে নীতিবোধে, নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। বাইরের শক্তি অনিচ্ছুক বাধ্যতা আদায় করে নেয় ; কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত আন্তরিক ঔচিত্যবোধকে কখনোই মানুষের মনে সঞ্চারিত করতে পারে না। অতএব একথা বলা চলে যে, নৈতিক আচরণের পক্ষে বাইরের শক্তিকে বাধ্যতার হেতু রূপে নির্দেশ করা শ্রেয় নয়। ম্যাকেঞ্জির কথা উদ্ধৃত করে দিই : 'বিশুদ্ধ নৈতিক ব্যাপারে বলপ্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। একথা অত্যন্ত সত্য। কোন বহিঃশক্তির নির্দেশে হয়ত আমরা বাধ্য হ'য়ে কাজ করি। কিন্তু সে কাজে অন্তরের সায় থাকে না ; বাইরের নির্দেশে বাধ্য হ'য়ে আমরা যে কাজ করি তা নীতির আওতায় পড়ে-না। কিন্তু ঔচিত্যবোধ থেকে যে কাজ আমরা করি তা নীতিধর্মের আওতার মধ্যে পড়ে। এই ঔচিত্যবোধই হ'ল নীতিধর্মের মূল কথা। "In strictly moral matters...it seems clear that we can't

recognise any authority that is of the nature of force...external authority with superior power can create a must but never an ought"

প্রেয়োবাদীদের মত (Hedonistic View)

প্রেয়োবাদীরা বললেন যে, আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষা এবং সাংসারিক সাবধান-তাই মানুষকে তার সমস্ত নৈতিক কাজের প্রেরণা দেয়। এখন প্রশ্ন হবে যে, আমরা সাধারণ মানুষ বা সাংসারিক মানুষ সত্যিই কি অপরের সুখের জন্য প্রয়াসী হই? অবশ্য অপরের সুখ বিধানের জন্য অনেক সময়ই আমরা সচেষ্ট হই; কিন্তু তা হই কেন? উত্তরে নীতিশাস্ত্রবিদরা বলবেন যে মানুষ অপরের কল্যাণ করে গভীর স্বার্থ-বোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে। বেন্থাম ও তাঁর অনুগামীরা বলবেন যে মানুষ কখনও নিজের সুখের সন্ধান ক'রে সুখী হতে পারে না। অপরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করলেই নাকি আপনার স্বার্থ রক্ষা করা হয়। এছাড়াও মানুষ যদি কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য চেষ্টা করে তবে তাকে কতিপয় বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতাই তার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে।* অমিত সুখ লাভের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুঃখে পর্যবসিত হয়। তাই সবসময়ে সুখের অমিত লোভটা ভালো নয়। তাই বুদ্ধিমান মানুষ অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রে নিজের সুখের বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ অপরকে খেতে দিয়ে নিজে খায়। একলা সবটা খেলে উদরাময়ের সম্ভাবনা। এ হ'ল প্রকৃতির প্রতিশোধ। এই প্রতিশোধের ভয়ে আমরা যে সব কাজ থেকে বিরত হই তা কালক্রমে আমাদের নীতিজ্ঞানের লক্ষণ বলে গণ্য হয়। প্রেয়োবাদীরা এই শাস্তির ভয়কে Moral Sanctions বলেছেন। এই Moral Sanctions থাকার ফলেই মানুষ সৎ পথে থাকার চেষ্টা করে। অবশ্য এই ধরনের Sanction-এর বাধা এসবই হোল বাইরের বাধা। উদাহরণ দিই :—

(ক) আমরা বহির্জগতের নিয়মের কথা জানি। খুব বেশী খেলে, অপরিমিত রসগোল্লা উদরস্থ করলে উদরাময় রোগে কষ্ট পেতে হয়। তাই আমরা মিতাহারী হই। প্রকৃতিই আমাদের এই ধরনের মিতাহারী হতে বাধ্য করে, না হলে দৈহিক পীড়ার ভয় থাকে।

(খ) রাষ্ট্রশাসনের বাধা আমাদের লোভকে, আমাদের জীবন ধারণের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা দেশের স্বার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থে রাষ্ট্রের শাসনকে

*A Manual of Ethics, পৃ : ২৫৮

মেনে নিই। সেই রাষ্ট্রের শাসন আমাদের বলে, আমরা যেন গিনি সোনার গহনা না তৈরী করি। অতএব হাতে টাকা থাকা সত্ত্বেও আমরা গিনি সোনার গহনা তৈরী করা থেকে বিরত থাকি। এটাই হোল রাষ্ট্রশাসনের বাধ্যবাধকতা।

(গ) এই প্রসঙ্গে সামাজিক বাধা বা Social Sanction-এর কথা বলি। এই সেদিনও বিলেতে গেলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। আমরা সমাজে নিন্দার ভয়ে বহু কাজ থেকে বিরত হই, আবার বহু কাজ করেও থাকি। বৃদ্ধ বাপ-মায়ের যদি আমরা যথাযথভাবে ভরণপোষণ না করি, তাহলে সমাজে নিন্দা হয়। এই নিন্দার ভয়েই আমাদের সুখশান্তি বিঘ্নিত হয়, অনেক ক্ষেত্রেই অনিচ্ছুক সন্তানরাও বাপ-মায়ের ভরণপোষণ করতে বাধ্য হয়।

(ঘ) ধর্মের অনুশাসন বা Religious Sanction-এর ফলে আমরা বহু সময় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হই। যেমন বাপ-মা মারা গেলে সাহেবী ভাবাপন্ন ছেলেকেও মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি করতে হয়; অনেক অসুবিধাজনক আচার বিচারের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়, তাতে তার ব্যক্তিগত আরামের বিঘ্ন ঘটে। তবুও ধর্মের অনুশাসনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাকে এসব কাজে সম্মতি দিতে হয়।

বেন্থামের উপরোক্ত মত একটু অমার্জিত ধরনের এই স্থূল প্রেয়োবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মিলের সুসংস্কৃত প্রেয়োবাদের (Refined Hedonism) আলোচনা করতে পারি। মিলও বেন্থামের মত স্বীকার করেছেন যে, মানুষ আপন স্বার্থবশে মূলত: সৎ পথে চলতে বাধ্য হয়। মিল বেন্থাম কথিত বাইরের শাসনগুলিকে বড় করে দেখেন নি। তিনি অন্তরের বিবেকের শাসনকে (Internal Sanction) বেশী মূল্যবান মনে করেছেন। এই বিবেকের শাসনই মানুষকে সৎ পথে চালিত করে। অন্যের উপকার করবার প্রবৃত্তিও এই বিবেক থেকে উৎসারিত হয়। মানুষ যদি অসৎ পথে চলে, তখন তার মনে স্বস্তি বা শান্তি কোনটাই থাকে না; এ হোল দার্শনিক মিলের কথা। মানুষ যখন পরোপকার করে, মিলের মতে মানুষ আত্মরক্ষার মানসেই সেই পরোপকার ক'রে থাকে। আমরা যখন ভূরি ভোজন করি, তখন যদি দ্বারে দণ্ডায়মান অভুক্ত ভিখারীকে কিছু খেতে না দিই, তাহলে এক অনির্দেশ্য পীড়াবোধ আমাদের কষ্ট দেয়। বিবেকের হাত থেকে বাঁচার জন্যই আমরা যৎকিঞ্চিৎ দান ধ্যান এদিকে ওদিকে করে থাকি। অতএব বলা চলে যে, নৈতিক কর্মের দায়টুকু শুধু রাষ্ট্র বা সমাজের কাছেই আমাদের নয়, আমাদের আপন আপন অন্তরে অবস্থিত মানবতা-বোধের কাছেও আমাদের এই দায় রয়েছে। মিল বললেন: নৈতিক কর্মের সর্বশেষ উৎস হ'ল এক ধরনের তীব্র বেদনা বোধ।

এই সুতীব্র বেদনাবোধটি তখনই অনুভব হয় যখন আমরা আমাদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা করি। নৈতিক কর্ম করার জন্য বাধ্যবাধকতাবোধের অনুভূতিও এই বেদনা বোধ থেকেই উদ্ভূত হয়। ['The ultimate source of all morality and ground of obligation is the pain, more or less violent, attendant on the violation of duty.']*

বেন্থাম বললেন যে, নৈতিক দায় এবং স্বার্থ বোধের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই ; এর পিছনে রয়েছে তাড়না, ভয় ও লোভ। বেন্থামএর মতে মিলের কথা অধিকতর গ্রহণীয় হলেও সেই সঙ্গে তিনি একথাও বললেন যে, অন্তরের অস্বস্তি দূর করার আকাঙ্ক্ষাই সৎ কার্য করার মূলে এবং এরা মোটামুটি-ভাবে স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত ; একে তিনি বুদ্ধিমান লোকের স্বার্থবুদ্ধি বা Self-interest আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের নৈতিক জীবনের দায়, স্বার্থবুদ্ধি, ও তার তাড়না এবং ভয় ও লোভ এদের সমগোত্রীয় বললে নৈতিক কর্ম ও সাংসারিক লাভজনক কাজের মধ্যকার প্রভেদটুকুকে অস্বীকার করা হয়। তাই এই মত অগ্রাহ্য। নীতিবোধ অন্ধ অনুভূতির উপর নির্ভরশীল নয়। তার মধ্যে বিচার এবং আত্ম-মর্যাদাবোধ রয়েছে।

প্রেয়োবাদীদের মধ্যে ক্রম বিকাশবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেছেন, তাঁদের মধ্যে Herbert Spencer-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মতে, সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় নীতি-বোধ আসত বাইরের শাসন থেকে। শাস্তির ভয়ে আমরা কর্তব্য কর্ম করি। এক কথায় কর্তব্য বোধের প্রেরণা জাগায় শাস্তির উদ্যত দণ্ড। কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিও সমাজের স্বার্থের মধ্যে যে ব্যবধানটুকু থাকে সেটুকু ক্রমেই কমে আসতে চায়। কাজে কাজেই পূর্বে যা ছিল বাইরের শাসনে বদ্ধ তা কালক্রমে অন্তরের স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতায় পরিণত হয় : 'Because man learned his duty under the prescription of political, religious and social authorities, it is thought that fear of punishment is the real meaning of obligation'. উপরের কথাগুলি হ'ল Herbert Spencer-এর। তিনি বললেন যে, বাইরের শাসন হল শাস্তি ভিত্তিক ; তা কি করে অন্তরের স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতায় পরিণত হতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাই এই মতও পরিপূর্ণ-রূপে গ্রহণযোগ্য নয়।

*Utilitarianism, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ : ৪১

অন্তর্দৃষ্টিবাদীদের মত (The Intuitionist View)

এদের মতে নৈতিক বোধ এবং স্বার্থ বুদ্ধি ভিন্ন। বাইরের শাসন থেকে নৈতিক আচরণের দায় আমাদের উপর বর্তায় না, একথা এঁরা বললেন। আমরা যে কাজকর্ম করি তার নৈতিক দায় আমাদের অন্তরের শুভ বুদ্ধির কাছে। একেই নীতিশাস্ত্রবিদেরা বিবেক বলেছেন; বিবেক হল এক ধরনের অন্তরেন্দ্রিয়; এর সাহায্যে আমরা তৎক্ষণাৎ কোন কর্মের নৈতিকতাটুকু বুঝতে পারি এবং সেই অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হই। অর্থাৎ অন্তরের শুভ বোধ প্রত্যক্ষ-ভাবে আমাদের শুভকর্মের প্রেরণা জোগায়। অবশ্য দার্শনিক Bishop Butler বললেন যে, নৈতিকবোধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়; এ হল যুক্তি ও বিচার লব্ধ জ্ঞান। নৈতিক বিচার-লব্ধ বুদ্ধি মানুষকে সৎকার্যের প্রেরণা জোগায়। আমরা বলতে পারি, নীতিবোধ এবং নৈতিক দায়ের মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ নেই। নৈতিক কর্ম বলে যাকে স্বীকার করি তাকেই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কর্তব্য বলে গ্রহণ করে। মিল বলেছেন, যে, আমরা অন্যায় কর্ম করলে অস্বস্তি বোধ করি। এই অস্বস্তি আমাদের পীড়া দেয়, এই পীড়ার হাত থেকে বাঁচতে চাই বলেই আমরা সৎ কর্মে প্রবৃত্ত হই। Butler-এর মতে মানব প্রকৃতির পরি-চালনা ও শাসনের ভার বিবেকের উপর ন্যস্ত। এই শাসন মানুষ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে, কারণ এটা তাদের আপন স্বভাবের শাসন। বিবেকই হ'ল মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এই বিবেকের বাধ্যবাধকতা হ'ল স্বেচ্ছাবৃত বাধ্যতা। তবু বিবেক হল দুর্বল ও অসহায়। মানুষ বিবেকের শাসন শোনে না। তা যদি শুনত তবে পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হত। বিশপ বাটলার এই ধরণের মত ব্যক্ত করেছেন।

দার্শনিক মার্টিন্যু বললেন, আমাদের সমস্ত নৈতিক কর্মের ভিত্তি হল এই বিবেকের শাসন। আমরা নৈতিক কর্মের যে দায় বোধ করি সেই দায় কোন মানুষের কাছে নয়, তাহোল ভগবানের কাছে। যে কাজ নীতিসঙ্গত তা অন্তরের থেকে আদিষ্ট। অর্থাৎ ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট বলেই সেই কাজ নীতিসঙ্গত। আমরা যখন নীতিসঙ্গত পথে অগ্রসর হই তখন ঈশ্বরের নির্দেশ ঈশ্বরের আদেশ পালন করি। আমরা আমাদের সব কাজের জবাবদিহি করব ভগবানের কাছে। এই জবাবদিহি করা সম্বন্ধে যে বাধ্যবাধকতা বোধ করি, তা হ'ল নৈতিকতার দায়। মার্টিন্যু এইভাবে নৈতিক দায়ের ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য যদি ভগবানের শাস্তির ভয়ে (একথা আমরা পুর্বেই বলেছি) আমরা সৎ পথে চলি এবং সেই ভগবান যদি বাইরের কোন শক্তি হয়,

তবে নিশ্চয়ই আমাদের নৈতিক জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়বে। সুতরাং আমরা মার্টিন্যু-এর চেয়ে Bishop Butler-এর মতকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করি। আমাদের স্বভাবের কাছেই আমাদের নৈতিকতার দায় ; এর মূলে আছে অন্তরের প্রেরণা।

যুক্তিবাদীদের মত (The Rationalistic View)

যুক্তিবাদী দার্শনিক কাণ্ট বললেন যে, বিচার-বুদ্ধি হ'ল মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং এই বিচার-বুদ্ধি মানুষকে নৈতিক অনুশাসন মেনে চলতে প্রেরণা দেয়। এদিক থেকে Bishop Butler-এর মতের সঙ্গে দার্শনিক কাণ্ট প্রমুখ যুক্তি-বাদীদের মতের মিল আছে। নৈতিক বোধ বাইরের কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। নীতিবোধ মানুষের স্বভাবের পরিশীলিত রূপ। একে আত্ম-শাসন বা আত্ম নিয়ন্ত্রণ (Self determination) বলা হয়েছে। নৈতিকতাবোধের আদর্শ হ'ল স্বার্থ নিরপেক্ষ (Categorical Imperative)। আমরা নৈতিক জীবনযাপনে কোন পার্থিব সম্পদ কামনা করি না। মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তি এবং বুদ্ধির সংগে সঙ্গতি রক্ষা করে কাজ করাই হ'ল আমাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। যুক্তিবাদীরা বললেন যে, নৈতিক বিধিবিধান মানুষের কাছে নির্বিচারে বাধ্যতার দাবী করে না। এই শাসন উদ্দেশ্যাভিমুখী বা Teleological। কাণ্টের মতে এর উদ্দেশ্য হ'ল কাজ করে যুক্তি বোধের (Practical Reason) প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের কাজে তার অন্তরস্থিত Practical Reason ব্যক্তি মানুষের যুক্তি অনুসরণ ক'রে শুভ লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যের দিকে চলতে থাকে। মানুষ এইভাবে যদি নিজস্ব প্রকৃতির নির্দেশে চলে তবেই সে স্বাধীন, তখনই সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এইভাবে যুক্তি শাসনের স্ববশে কাজ করলে মানুষ সহজেই সকল মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক করে রাখে। প্রবৃত্তির তাড়নায় চললে আমরা অন্নের দ্বারা, তুচ্ছতার দ্বারা খণ্ডিত হয়ে পড়ি। তখন আমরা আমাদের স্বভাব থেকে চ্যুত হয়ে পড়ি এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব-মানবের সঙ্গে থেকেও তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমাদের নৈতিক ধর্মের হানি ঘটে। কেননা নৈতিক ধর্ম হ'ল Universal বা সার্বজনীন। সেই নৈতিক ধর্ম আমাদের পরস্পরকে যুক্ত করে। তাইতো মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের সঙ্গে এই যোগটুকু অনুভব করতে চেয়েছিলেন :

'যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে
মুক্ত কর হে বন্ধ'।

সম্পূর্ণতাবাদীদের মত (Perfectionistic View)

আমরা কাণ্ট প্রমুখ যুক্তিবাদীদের মতের কথা জানি ; এই প্রসঙ্গে অন্তত: এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে যে, যুক্তি, বিচার বোধ কি মানুষের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তি ? নৈতিক আদর্শের দাবী মানুষের এই স্বভাবের কাছে। তাইতো প্রশ্ন জাগে যে, মানুষের স্বভাবের সবটুকুই কি এই বিচার বোধ ? সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার জন্য মানুষের স্বাভাবিক আকুতি আছে। আমরা স্বেচ্ছায় সমাজের শাসন, রাষ্ট্রের শাসন এবং আপন আপন অন্তরের শাসনকে মেনে নিই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করতে পারব। সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য মানুষকে দেহের প্রবৃত্তিকেও স্বীকার করতে হবে। মানুষের সম্পূর্ণ স্বভাবকে স্বীকার করতে হলে তার প্রবৃত্তির দাবীকে উপেক্ষা করা চলে না। আদর্শ নৈতিক জীবন প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে ; যুক্তি বিচার দ্বারা তার শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ করে, তার পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়াসী হয়। মানুষের লক্ষ্য, তার নৈতিক জীবনের আদর্শ হ'ল প্রবৃত্তি ও যুক্তি বিচারের সামঞ্জস্য সাধন করা। আমাদের মধ্যেকার সেই Ideal Self বা 'আদর্শ আমি' আমাদের ছোট আমিটাকে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কাজে কাজেই বলা চলে যে, আমাদের নৈতিক জীবনের দায় হ'ল সেই আদর্শ-অনিষ্ঠ 'বড় আমি'টার কাছে। আমাদের মধ্যেকার এই বড় আমিটা, আদর্শ আমিটা, আমাদের কাছে আনুগত্যের দাবী করে। সেই আনুগত্য স্বীকার করে আমরা কর্মে ব্রতী হলে তবেই তা নৈতিক উন্নতির পরিপোষক হয় : 'It is the very essence of moral duty to be imposed by a man on himself. The moral duty to obey a positive law, whether a law of the state or of the church, is imposed not by the author or enforcer of the positive law, but by that spirit of man which sets before him the ideal of a perfect life and pronounces obedience to the positive law to be necessary to its realisation."*

অর্থাৎ দার্শনিক গ্রীণের মতে মানুষ তার নৈতিক কর্তব্য নিজে নিজেই নির্ধারণ করবে ; আপন আপন কর্তব্য নির্ণয় করা হ'ল মানুষের ধর্ম। দেশের আইন, রাষ্ট্রের আইন বা ধর্মাধিকরণের বিধি—এর কোনটাই বাইরে থেকে চাপিয়ে দিলে তা যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে না। পূর্ণতর জীবনা-

*Green : Prolegomena to Ethics, পৃ : ৩৫৪

দর্শের আহবানে মানুষ যখন স্বেচ্ছায় আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করে অর্থাৎ স্বেচ্ছাবৃত আইন মেনে চলে তখনই তার ব্যবহার নৈতিক মর্যাদায় ভূষিত হয়। এই স্বেচ্ছাবৃত বিধিবদ্ধ জীবনধারা মানুষের নৈতিক আদর্শটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার পথে একান্ত প্রয়োজনীয়।

নৈতিক বিধিবিধানের সঙ্গে প্রাকৃত বিধি ও রাষ্ট্রীয় বিধির তুলনা (Relation between Moral Law and The Law of Nature & the Law of The State)

প্রাকৃতিক নিয়ম বলতে আমরা বুঝি যে প্রকৃতির অন্তর্গত একজাতীয় সমস্ত বস্তু অনুরূপ অবস্থায় একই ভাবে কাজ করে। যেমন নিরালম্ব অবস্থায় কোন বস্তুই শূণ্যে ঝুলে থাকতে পারে না ; মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে তাকে ধরাশায়ী হতেই হবে। নিউটনের আবিষ্কৃত Law of Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ বিধির কোন রকম ব্যতিক্রম নেই। একথা শুধু মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধেই বলা চলে না ; আর্কিমিডিসের সূত্র এবং এই ধরনের যত প্রাকৃতিক বিধিবিধান আছে, তা সবই এইভাবে বাধ্যতামূলক ; এককথায় বলা চলে, প্রকৃতি নিয়মের অধীন। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার জন্য দণ্ড পেতে হয়। প্রকৃতির নিয়মের শাসন অমোঘ। স্বাস্থ্যের আইন আমরা না মানলে আমাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটবেই এবং রোগ ভোগের শাস্তি আমাদের পেতে হবেই। প্রকৃতির আইন সম্বন্ধে বলা হয় ; It is a statement of how things actually behave., এই সর্বব্যাপী প্রকৃতির আইন নীরবে কাজ করে। তার অনুশাসন কখনও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয় না কিন্তু সেই অনুশাসন না মানলে তার জন্য ফলভোগ করতে হয়। প্রকৃতির আইনের ভাষা হোল 'Is' এর ভাষা।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে জনপ্রিয় শাসনের 'Must' কথাটি রয়ে গেছে। রাষ্ট্রের আইন না মানলে তার জন্য শাস্তি আছে। এটাই হল রাষ্ট্রীয় বিধির প্রত্যক্ষ ফল; সেই আইন না মানলে অর্থদণ্ড দিতে হয়, জেলে যেতে হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে কখন কখন প্রাণ দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র ক্ষেত্র-বিশেষে প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রকৃতির বিধির নেই। অবশ্য প্রকৃতির বিধি-বিধান লঙ্ঘন করলে যে প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করলে সেই ধরনের শাস্তি পাবার ভয় নেই। শাস্তির ভয় না থাকলে আমরা সাধারণত: কোন আইন মানতে চাই না। সুতরাং নৈতিক বিধির কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হতে

গিয়ে আমরা তার ক্ষমতার উৎসটুকু বা Authority-টুকু বুঝতে চেষ্টা করি। অবশ্য প্রেয়োবাদীরা বলেন যে, নৈতিক বিধির Authority বা ক্ষমতার মূলে রয়েছে রাষ্ট্র, সমাজ বা ভগবানের শাস্তি বিধানের শক্তি। অনেক সময়ই আমরা কোন শাস্তি পাবার ভয় না থাকলেও নীতিগতভাবে কোন গর্হিত কর্ম করতে ভয় পাই। আমরা মনে মনে জানি যে, নৈতিক বিধি মানার পিছনে আছে দলবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন। এই 'Compact Majority'-কে আমরা মনে মনে ভয় পাই। নীতিশাস্ত্রবিদ সিমেল বলেছিলেন যে, আমরা নৈতিক বিধিকে মানি তার কারণ, নৈতিক বিধি দলবদ্ধ সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, বাইরের কোন শক্তির নির্দেশ অথবা শাস্তির ভয়ে যদি আমরা কোন একটা নৈতিক বোধকে গ্রহণ করি তবে তা অতিমাত্রায় অনৈতিক হয়ে পড়বে। কেননা তার মধ্যে বহিরাগত নির্দেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নৈতিক বিধি আমাদের যে শাস্তি দেয়, তা আমাদের বিবেকের দেওয়া শাস্তি। কোন একটি কল্যাণ আদর্শকে অনুসরণ ক'রে নৈতিক বিধি শাসন করে; এই শাসনের ভাষা হ'ল 'Ought' অর্থাৎ করা উচিত। আমরা শাস্তির ভয়ে কোন কাজ না করে যদি অন্তরের ঔচিত্য বোধ থেকে কাজটাকে কর্তব্য বলে গ্রহণ করি তবেই এই সমস্যার সমাধান হবে। অবশ্য শাস্তির ভয় না থাকলে আমরা কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করি কি না এই সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। ভয় না থাকলে আমরা আইন মানব কেন, এই প্রশ্নটি বড় প্রশ্ন। প্রাচীনপন্থীরা মনে করতেন যে, মানুষ নীতিধর্ম পালন করে এই শাস্তির ভয়েই। তাই আমরা দেখি যে, মানুষকে নীতিবান ও ধার্মিক করে তোলার জন্য প্রাচীন সব ধর্মেই নরকবাসের মর্মন্তুদ বর্ণনা করা হয়েছে; ধর্ম করলে, নীতি মেনে চললে স্বর্গে যাবার ব্যবস্থা আছে। মানুষকে লোভ দেখিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে এই ভাবে সৎ পথে চালিত করার জন্যই এই ধরনের স্বর্গ-নরকের ব্যাখ্যা: লোভে অথবা ভয়ে কাজ করলে তার নৈতিক মূল্য সম্বন্ধে আধুনিক নীতিবিদরা সন্দেহ প্রকাশ করবেন। বিশেষ করে ভাববাদী নীতিবিদেরা অর্থাৎ Idealist-রা বললেন যে, জোর করে ধর্ম পালন করানো হলে, ধর্ম হিসেবে তার কোন মূল্য নেই। নীতির শাসন হোল আত্মশাসন। অন্তরের শাসনই মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়। শিল্পী যেমন বাইরের কোন শাসন না মেনেও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আপন রূপের-সৃষ্টির শাসনকে অলঙ্ঘনীয় বলে মেনে নেন, ঠিক তেমনি ধারা নীতির আদর্শ প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই অলঙ্ঘনীয়। বাইরের শাসন, বাইরের তিরস্কার না থাকলেও মানুষ আত্মশাসনের গ্লানি, অনু-

ভূতির তীব্র জ্বালা থেকে সৎ পথে চলার নির্দেশ পায়। অন্তরের শাসনের মর্যাদা এবং শক্তি অনন্য সাধারণ। সেই শাসন তলে তলে মানুষের পাপকে দগ্ধ করে, আত্মগ্লানির নরক অনলে সমস্ত মালিন্যকে দগ্ধ ক'রে নিখাদ সোনায় তাকে রূপান্তরিত করে। আমরা যখন আইনকে, বিধিকে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে তাকে আপনার ক'রে তুলি তখন তার শক্তি অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তখন আইনের নির্দেশ তার আপন অন্তরের ভেতর থেকে আসে। আর যখনই আইনের নির্দেশকে বাইরের নির্দেশ বলে মনে হ'বে তখনই তার কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। ['The authority, indeed, must come home to us with a far more absolute power, when we recognise that it is our own law, than when we regard it as an alien force.]*

বিবেক ও সাংসারিক বুদ্ধি (Conscience & Prudence)

মানুষের নীতিবোধের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা বড় শক্ত কাজ। এর শক্তি অমোঘ; আমাদের নৈতিক দায়িত্বের কোন ব্যতিক্রম স্বীকার করে না আমাদের বিবেক; অর্থাৎ যাঁরা বিবেকে বিশ্বাস করেন তাঁরা বলেন যে বিবেক-নির্দিষ্ট নৈতিক কর্তব্যের কোন ব্যতিক্রম নেই এবং আমরা যখন সেই নৈতিক কর্তব্য সম্পন্ন করি তখনই এক রহস্যময় শক্তির দ্বারা আমরা চালিত হই। এককথায় বিবেকের শক্তি হ'ল ঈশ্বরের শক্তি। আমরা যখন আমাদের কর্তব্যকর্ম করি তখন ভগবৎ প্রেরণায় আমরা উদ্বুদ্ধ হই। আধুনিক মতাবলম্বীরা বলেন যে, এই বিবেকবাণী কোন রহস্যময় শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এ হ'ল আমাদের নৈতিক অনুভূতির (Moral Sentiment) ফলশ্রুতি। অবশ্য এই নৈতিক অনুভূতির সঙ্গে আমাদের যুক্তিবিচারও কাজ করে। আমাদের নীতিবোধের সঙ্গে এর অবিচ্ছিন্ন যোগ। এই নৈতিক কর্ম হ'ল সবার সুখের জন্য, সবার কল্যাণের জন্য। সাংসারিক 'লাভ-ক্ষতি', টানাটানির মধ্যে এই ধরনের কাজকর্মের নৈতিক মূল্য সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না। মন যাকে, বুদ্ধি যাকে নীতিগত ভাবে 'ন্যায়' বলে স্বীকার করে তার নিজস্ব মূল্য ও মর্যাদা আছে। আমাদের বিবেক যাকে শুভ বলে নির্দিষ্ট করে দেয় তা শুধু আমার পক্ষেই শুভ নয়, তা সকলের পক্ষেই শুভ, এই বিশ্বাস আমরা করি। আর যে নৈতিক মূলকে ব্যক্তিগতভাবে আমরা স্বীকার করি, তাকেই বস্তুগত সত্তা

*Mackenzie : A Manual of Ethics, পৃ : ২৭১

(Objectively Valid) বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু এ কথাগুলি ঠিক বিবেচক সংসারী মানুষের কথা নয়। সাধারণত: আমরা সাংসারিক সুখ-সুবিধার কথা ভেবেই আমাদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকি। 'সাবধানী-তিরস্কার, মঙ্গলশাসন'—এ হ'ল সংসারী গৃহস্থ মানুষের কথা। সেখানে আদর্শের কথা নেই, আছে সুবিধার কথা। জীবনের বহুক্ষেত্রেই আদর্শকে জেনেও আমরা আমাদের কাজকর্মে সেই আদর্শকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করি না। সংসার ধর্মে যা সুবিধাজনক তাকেই গ্রহণ করি। এটা আমরা করি আমাদের সাংসারিক বুদ্ধির নির্দেশে ; একে বলা হয় সাংসারিক সাবধানতা বা Prudence। হিসেবী মানুষ ফলের হিসেব করে কাজের ভালো মন্দ বিচার করে। ফলভোগটাই হিসেবী সংসারী মানুষের কাছে বড় কথা। যদিও গীতায় বারবার বলা হোল—'মা ফলেষু কদাচন', তবুও সেই ফলাকাঙ্ক্ষী সংসারী মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। ভোগবাদীরা বলেন যে, সেই কাজই ভাল যা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে, আমাদের ভোগের অবকাশকে বাড়িয়ে দেয়। এখন সাবধানে বিচার করে দেখতে হবে যে কিসে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, কিভাবে আমরা আমাদের ভোগের ষোলকলা পূর্ণ করতে পারি। এরজন্য প্রয়োজন এই সাংসারিক সাবধানতা ও সাংসারিক বুদ্ধির। মহাদার্শনিক সক্রেটিস এই সংসারে বুদ্ধির গুণগান করেছেন। শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ হিসেবে Prudence কীর্তিত হয়েছে। এই মতের অনুগামী Epicurean মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বললেন যে, অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে কখনও সত্যিকারের সুখ লাভ করা যায় না। অতএব প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সিজউইক্, মিল, বেন্থাম প্রমুখ পণ্ডিতেরা (প্রেয়োবাদীরা বা Hedonist) সকলেই এই সাবধানতার কথা স্বীকার করেছেন। সাংসারিক বুদ্ধি সবসময় আমাদের লাভের হিসেবটুকু হাতেহাতে মিটিয়ে দেবার বিরোধী অর্থাৎ এখুনি পাওয়া লাভ যদি ভবিষ্যৎ লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেই লাভকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা উচিত নয় ; ভবিষ্যতের সুখ ভোগ যদি বর্তমানের সুখ বোধের দ্বারা বিঘ্নিত হয় তাহলে বর্তমানে দু:খ করে ভবিষ্যতে বৃহত্তর সুখ বোধকে সফল করতে এঁরা উপদেশ দেবেন। আত্মসুখের অন্বেষণ করতে গেলে অনেক সময়ই দেখা যায় যে সুখ মরীচিকার মত মিলিয়ে যায় :

> 'সুখ সুখ বলি কেঁদো না আর
> যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে
> ততই বাড়িবে বিষাদ ভার'—

আত্মসুখের অনুসন্ধানে রত থাকলে আমরা যথার্থ সুখ লাভে বঞ্চিত হই। মিল এবং বেন্থাম এই ধরনের মতবাদ ব্যক্ত করলেন। বহুজনের সুখ যখন আমাদের কাম্য হয় তখনই আমরা সত্যিকারের সুখ লাভ করি। অপরের সুখ কামনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নিজের সুখের কামনাকে পূর্ণ করতে পারি। এই ধরনের মত ব্যক্ত হ'ল Utilitarianism শীর্ষক মতবাদে। আত্মসুখবাদ বা Egoism-এর সঙ্গে পরসুখবাদ বা Utilitarianism-এর কোন বিরোধ নেই এই অর্থে যে অপরের সুখ কামনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নিজের সুখের পরিবর্ধন ঘটাতে পারি। মিল, বেন্থাম প্রমুখ পণ্ডিতেরা বললেন যে, নৈতিকতার সাধারণ গুণ এবং সাংসারিক বুদ্ধি (Virtue and Prudence), এদের মধ্যে অর্থগত কোন বৈষম্য নেই বললেই চলে।

অবশ্য নৈতিক সাধারণ গুণ ও সাংসারিক বুদ্ধিকে এক দৃষ্টিতে দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সাংসারিক বিচক্ষণতা এক জিনিষ, তাহল ব্যবহারগত কর্মের ফলাফলাশ্রিত! নৈতিক গুণ কিন্তু আদর্শগত; প্রেয়োবাদীদের মতে অন্যায়ের অর্থ হ'ল কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিচার। চোর এবং সাধু এরা দুজনই আপন আপন বিচার অনুসারে আত্মসুখের সন্ধান করে। সাধু ব্যক্তি উপায় নির্বাচনে ভুল করে না। অসাধু বা তস্কর সেখানে ভুল করে। সাবধানতার অভাবের ফলেই একজন সাধু বলে চিহ্নিত হয় অপর জন চোর বলে নিন্দিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা Seth-এর গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই। ধর্ম ও অধর্মের ভেদটুকু সাংসারিক বিবেচনা ও সাংসারিক অবিবেচনার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাতে পর্যবসিত হয়। বুদ্ধির কাজ হ'ল বিচার বিবেচনার কাজ; কাজের পরিণতি বা ফল সম্বন্ধেও হয়ত আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকতে পারে; কিন্তু কাজের নৈতিক উৎস বা প্রয়োগগত উৎস যদি সেই একই সুখের মধ্যে নিহিত থাকে তবে কাজের আত্যন্তিক মূল্য অপরিসীম হ'য়ে উঠবে।' ['The difference between virtue and vice is reduced to one between prudence and imprudence. The intellectual process may be more or less prudent, the vision of the consequences may be more or less clear, but, in as much as the moral or practical source of the action is always found in the same persistent and dominant desire for pleasure the intrinsic value of the action remains invaluable']* এইভাবে সাংসারিক বুদ্ধি এবং সাংসারিক বুদ্ধিহীনতা

* A Study of Ethical Principles গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

যদি ন্যায় এবং অন্যায়ের স্থানটুকু জুড়ে বসে তবে বোধহয় আমরা নৈতিক বিচার প্রহসনের অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়ব। মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধ শুধু মাত্র মানুষের সুখ সুবিধা বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন কথা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ন্যায় অন্যায় কেবল মাত্র ফলাশ্রয়ী নয়। মানুষের শুদ্ধ বিবেক এই ন্যায় অন্যায় ধারণাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। বিবেক বলতে আমরা বুঝি সত্য বিচার, আত্মশাসন ও নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা। অর্থাৎ সাংসারিক সাবধানতা বলতে বুঝি আমাদের নিরঙ্কুশ স্বার্থ যুক্ত লাভকে। সুতরাং লাভ এবং স্বার্থ চিন্তা কখনই বিবেক বাণী বলে গৃহীত হতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুখবাদ

সুখবাদ—মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ ও নৈতিক সুখবাদ—মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের আলোচনা—মিল ও বেন্থামের মতের পর্যালোচনা—সাইরেনিক (Cyrenaic) নীতিদর্শন—র‍্যাসডেল (Rashdall) শিজউইক (Sidgwick) প্রমুখ নীতি-শাস্ত্রবিদদের মতামতের পর্যালোচনা—আত্মসুখ ও সর্বসুখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুখবাদ (HEDONISM)

Hedone বা সুখই হ'ল আমাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য এবং সুখের মাপকাঠিতেই মানুষের কর্মের নৈতিক মূল্যের বিচার হবে, এই ধরনের নির্দেশ দিলেন সুখবাদীরা। সুখই হ'ল মানুষের পরম পুরুষার্থ। মানুষের এই পরম পুরুষার্থের ধারণা কেমন করে সুখকে আশ্রয় করল অর্থাৎ সুখই যে মানুষের পরমপুরুষার্থ একথা সুখবাদীরা কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রচার করলেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, দুটি গৃহীত বিশ্বাসের (assumption) উপর এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরাতাত্ত্বিক বা Metaphysical assumption হ'ল এই যে, অন্তরাত্মাই ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ। আমাদের মনের অনুভূতি, আবেগ, ক্ষুধা প্রমুখ সকল সহজাত প্রবৃত্তির সমন্বয়ে আমাদের অন্তরাত্মা গঠিত। এককথায়, আমাদের অনুভূতি এবং আবেগ আমাদের যুক্তি এবং বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যুক্তি ও বুদ্ধি বলে দেয় যে কেমন ক'রে আমরা আমাদের কাজ থেকে সবচেয়ে বেশী সুখ লাভ করতে পারি। সুখ পাওয়াটাই বড় কথা। বুদ্ধি বা যুক্তি সেই সর্বোচ্চ সুখ প্রাপ্তির উপায়টুকু নির্দেশ করে ; এই ধরনের মতাবলম্বীদের মধ্যে Hume অগ্রগণ্য। তিনি বললেন, বিচার বুদ্ধি হ'ল আমাদের আবেগ অনুভূতির অনুচর মাত্র। আমাদের প্রবৃত্তির যে জীবন, সেই জীবনে সুখের প্রয়োজন মেটানোই আমাদের পরম পুরুষার্থ ; একথাই Hedonism শিক্ষা দিল। এই হল পরাতাত্ত্বিক বিশ্বাস বা Metaphysical assumption-এর কথা। এটা হল প্রথম বিশ্বাস। দ্বিতীয় বিশ্বাস হল এই যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ কষ্টকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সুখকে পেতে চায়। মিল, বেন্থাম প্রমুখ সুখবাদীরা একথা ধরে নিলেন যে, স্বাভাবিকভাবেই আমরা সুখের সন্ধান করি, দুঃখ কষ্টকে পরিহার করবার চেষ্টা করি। সুখই আমাদের কামনার ধন (Object of Desire), এই সুখ সন্ধানই হল আমাদের চরম লক্ষ্য ; আর আমরা জীবনে যা কিছু চাই, সেই চাওয়ার মূলে থাকে সুখসন্ধান। আমরা যা চাই তার মূলে এই সত্যটুকু রয়েছে যে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সুখ চায় এবং সুখই হল আমাদের কাম্য ; একথা বললেন মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদীরা। দুঃখ আমরা কখনও চাই না, যন্ত্রণাকে আমরা পরিহার করতে চাই। এসব হল স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই সত্য মানুষের

দৈনন্দিন চাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিক সুখবাদীরা বললেন যে, আমরা সুখ চাই না ; আমাদের সুখ চাওয়া উচিত। অর্থাৎ যদি প্রকৃতির নিয়মের স্বভাব বশেই আমরা সুখ চাই তবে তা প্রকৃতির ধর্মের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। আর যদি বলি, আমাদের সুখ চাওয়া উচিত, সুখই আমাদের পরমার্থ, তাহলে সেই চাওয়ার মধ্যে একটা কর্তব্য বুদ্ধির প্রেরণা এসে পড়ে। সুখ চাওয়া এবং সুখ চাওয়া উচিত—এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকা চাই। আমি সুখ চাই, এটা ঘটতে পারে প্রকৃতির নিয়মে। কিন্তু যখনই আমি বলব যে, আমার সুখ চাওয়া উচিত তখনই আর আমি প্রকৃতির নিয়মাধীন নই। আমি আমার যে আদর্শ বা লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছি, তাহল সুখের আদর্শ ; তাই সুখ আমাদের চাওয়া উচিত। এই ঔচিত্যের সঙ্গে আদর্শ বা লক্ষ্যের যোগ ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। তাহলে বলা যেতে পারে যে এটা হ'ল আদর্শের কথা, মনের কথা, এটা শুধু মাত্র অস্তিত্বের কথা নয়।

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ (Psychological Hedonism)

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ বলে যে, মানুষের সর্বকর্মের স্বভাবগত লক্ষ্য হল সুখ অর্জন করা ; মানুষের সকল কাজের লক্ষ্য বা অভিপ্রায় হিসেবে রয়েছে এই সুখ। সুখের সন্ধান করা আমাদের প্রকৃতি বা ধর্ম। আমরা সুখ চাই দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে পরিহার ক'রে। যা সুখকর তা আমাদের অভিপ্রেত। এই সুখের জন্যই মানুষ সবকিছুকে প্রত্যাশা করে। আমরা যখন কোন জিনিষ চাই তখন ভাবি যে এটা পেলে হয়তো আমরা সুখ পাবো। অর্থাৎ কোন বস্তুকে বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণের জন্য আমরা চাই না ; সেই বস্তুটি আমাদের সুখ বর্ধন করবে, এই আশায় তাকে চাই। অতএব বলা চলে, ইচ্ছার, অভীপ্সা (Desire) বা আকাঙ্খার লক্ষ্য হল এই সুখ লাভ।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বেন্থাম এবং মিল এই মতের পোষকতা করলেন। তার আগে পর্যন্ত গ্রীসে এ্যারিষ্টিপাস্ নামে এক দার্শনিক এই মতের প্রচার করেছিলেন। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ এবং কষ্টকে পরিহার ক'রে সুখ লাভের চেষ্টা করে। সুখ-দুঃখের এই সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রকৃতি মানুষকে বসিয়ে দিয়েছে ; সুখ লাভ এবং দুঃখ পরিহার—এই দুটি হ'ল মানুষের সকল কর্মের মুখ্য অভিপ্রায়। আমরা সুখ এবং দুঃখের শাসনে সব সময়ই শাসিত হয়ে আছি। দুঃখ দেখলে আমরা ভয়ে পালিয়ে যাই। তাইতো কবিকে বুক ঠুকে বলতে হয় :

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার,

এই দুঃখকে ভয় করার তথ্যটি কবির কথার মধ্যে নিহিত হয়ে আছে। আমরা স্বভাবগত ভাবে দুঃখকে পরিহার করে সুখের সন্ধান করি। বেন্থাম বললেন যে, আমাদের সকল কর্মের মূলে রয়েছে দুঃখ পরিহার করে সুখ লাভের অভিপ্রায়। তিনি শুধু সুখলাভের স্পৃহা এবং দুঃখ পরিহার করার বাসনাকে আমাদের সকল কর্মের অভিপ্রায় বলেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি আরো বললেন, এরাই হল আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য। দার্শনিক মিল বললেন যে, আমরা যখন কোন বস্তুকে পেতে চাই এবং সেই বস্তুটি পেলে আমাদের ভালো লাগে তখন এই দুয়ের মধ্যে যে কোন পার্থক্য থাকে না একথা বলা চলে। অর্থাৎ কোন জিনিস চাওয়া এবং তা পেলে যে সুখকর অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতি, এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে বলা চলে যে, কোন একটি বস্তু যখন আমাদের কাছে দুঃখজনক বলে মনে হয় তখন সেই দুঃখজনক অনুভূতির সঙ্গে সেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনে যে বিতৃষ্ণা জাগে, সেই বিতৃষ্ণার কোন প্রভেদ নেই। তারা সমার্থক। বলা যেতে পারে যে তারা একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। কোন একটি বস্তু পাব, এই প্রত্যাশায় মনে যে সুখ উপজাত হয় সেই সুখের সঙ্গে সেই বস্তুটিকে চাওয়ার একটা পরিমাণগত সাদৃশ্য বর্তমান। যে বস্তু আমাদের যে পরিমাণে সুখ দেয় ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা তাকে চাই। মিল বললেন যে, এই সুখের অনুভূতির কথা বাদ দিলে কোন বস্তুকে আমরা যখন খুব আকুল হয়ে চাই এই আকুলতাটুকুর ব্যাখ্যা করা যাবে না। সেই আকুলতার অস্তিবাদী ব্যাখ্যা বা পরাতাত্ত্বিক কোন ব্যাখ্যাই করা যাবে না যদি না আমরা তাকে প্রত্যাশিত সুখের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি। আমরা মিলকে অনুসরণ করে বলতে পারি যে আমরা সবসময়ই সুখকে চাই এবং আমাদের অভিপ্রেত বস্তু বলতে সুখ ছাড়া অন্য কিছুকেই বুঝি না। যখনই কোন বস্তুকে আমরা চাই, সেই চাওয়ার পিছনে লুকিয়ে থাকে আমাদের প্রত্যাশিত সুখের সম্ভাবনাটুকু।

অবশ্য মিল এবং বেন্থাম প্রমুখ দার্শনিকেরা Cyrenaicদের এই মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ গ্রহণ করেন নি; এই মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় :—(ক) আমরা যখন কোন একটি বস্তুকে পেতে চাই তখন সেই বস্তুটি হয় আমাদের Desire বা অভীপ্সার লক্ষ্য। এই অভীপ্সা বা আকাঙ্খা পূর্ণ হলে আমরা সুখ পাই। অতএব শুধু আমরা আকাঙ্খা করি না, আমরা আকাঙ্খা করি কোন একটি বিশেষ বস্তুকে। সেই বস্তুটি লাভ করলে আমরা

সুখ পাই। এটি হল আকাঙ্খিত বস্তু লাভের ফলশ্রুতি। সুখকে আমরা সুখলাভের জন্য কখনই চাই না। যে মানসিক পদ্ধতিতে আমাদের সুখ লাভ ঘটে তা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের মনে কোন একটি বিশেষ অবস্থার জন্য অভাববোধ থাকে ; সেই অভাববোধের ফলে কোন একটি বিশেষ বস্তু লাভের ইচ্ছা হয়। একে আমরা বলি বস্তুর জন্য আকাঙ্খা। তারপর সেই বস্তুটি পেলে আকাঙ্খা পূর্ণ হয় এবং তার ফলে মনে আকাঙ্খা পূরণজনিত সুখের উদ্ভব হয়। উদাহরণ দিই, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রোজনামচা থেকে। সকালে উঠে কিছুক্ষণ কাজকর্ম করার পরে আমাদের খিদে পায়। খিদে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খাদ্যবস্তু পেতে চাই ; তারপর খাদ্যদ্রব্য পরিবেশিত হলে আমরা তা দিয়ে উদর পূর্তি করি। উদর পূর্তি করার ফলে আমরা সুখ পাই ; কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তিজনিত এই সুখের জন্যই আমরা যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি. তা তো নয়। ক্ষুধার তাড়না থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমরা খাদ্য গ্রহণ করি এবং তারফলে ক্ষুন্নিবৃত্তিজনিত সুখ আমাদের মনে উদ্ভূত হয়। একথা স্বীকার্য যে, আমাদের ভুরিভোজন করতে ভালো লাগে, ফুটবল খেলতে ভালো লাগে, ছবি দেখতে ভালো লাগে, গান শুনতে ভালা লাগে, বই পড়তে ভালো লাগে, সিনেমায় যেতে ভালো লাগে। কিন্তু এই ভালো লাগার জন্য আমরা কাজগুলি করি না। ফুটবল খেলতে চাওয়া আর ফুটবল খেলা জনিত সুখটুকু চাওয়া এক কথা নয়। আমরা ফুটবল খেলতে চাই, ফুটবল খেলা জনিত সুখটুক জ্ঞাতসারে পেতে চাই না। ওই সুখটুকু আসে ফুটবল খেলার ফলশ্রুতি হিসেবে। শিল্পী যখন ছবি আঁকে বা পাঠক যখন বই পড়ে তখন তারা সেই পুস্তক পাঠে যে সুখ পাবে, বা ছবি এঁকে যে সুখ পাবে, সেই সুখের কথা ভেবে এই কাজগুলি করেনা। আমরা যখন একটি গরীব ভিখিরীকে অর্থ দান করি, হয়তো নিজের অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও সেই পয়সা দিই কিন্তু সেই দানটুকু করি আত্মতৃপ্তিজনিত কোন সুখের জন্য নয় ; গরীব ভিখিরীকে সাহায্য করার জন্য এই ধরনের কাজ করি।

অনেকে (এঁদের মধ্যে Rashdall আছেন) মনে করেন যে, মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ হল এমন একটি তত্ত্ব যা প্রকৃতির ঘটনার পৌর্বাপর্যকে স্বীকার করে না। এককথায়, ঘোড়াকে গাড়ীর আগে না জুতে দিয়ে ঘোড়াকে গাড়ীর পিছনে যদি জুতে দেওয়া হয় তাহলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় সেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে এই মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ। আমাদের মনের আকাঙ্খা পূরণের ফলেতে সুখ জাত হয়। তবে তার দ্বারা একথা বোঝায় না যে, আমরা কোন বস্তুকে চাই সেই বস্তুটি সুখপ্রদ ব'লে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের চাওয়াই

আমাদের আকাঙ্খার বস্তুটিকে সুখপ্রদ রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত করে ; বস্তুটি সুখপ্রদ বলে আমরা যে তাকে চাই একথা সত্য নয়। আমাদের আকাঙ্খার বস্তুকে আমরা যখন পাই তখন আমরা প্রীতি লাভ করি ; এই প্রীতি লাভ, এই সুখ লাভ করার মূলে আছে আমাদের আকাঙ্খা। আমরা যা চেয়েছি তা পেয়েছি বলেই এই সুখের অনুভূতি।

এই প্রসঙ্গে আমরা অবশ্য বলতে পারি, যে কোন অভাব পূরণজনিত তৃপ্তি লাভের পূর্বেই আমরা সেই লাভটি সম্বন্ধে সচেতন হই। যদি আমরা আমাদের আকাঙ্খাকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারতাম তাহলে বোধহয় কোনরকম তৃপ্তি লাভ করা বা সুখ লাভ করার সম্ভাবনাই থাকতো না। একথা বললেন নীতিশাস্ত্রবিদ Bishop Butler। উদারচেতা, দিলদরিয়া হওয়ার যে সুখ তা আমরা কোনদিনই অনুভব করতে পারতাম না যদি অপরের ভালো করার বাসনা বা আকাঙ্খা আমাদের মধ্যে না থাকতো। সুতরাং আমরা অপরের ভালো করতে চাই বলেই, সেটুকু করতে পারলে যে তৃপ্তি বা সুখলাভ করি সেই সুখই হল এক্ষেত্রে মুখ্য। অতএব জোরের সঙ্গে একথা বলা চলে যে, অন্ততপক্ষে এমন কতগুলি আকাঙ্খা বা বাসনা আমাদের মনের মধ্যে থাকে যেগুলি সরাসরি সুখ চায় না।

Sidgwick মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের আরও কয়েকটি দোষের কথা বলেছেন। তিনি বললেন, আমরা যখন সুখের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরি তখন সুখ আমাদের ধরা দেয় না। তিনি তাঁর Methods of Ethics গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে বললেন যে, যত বেশী আমরা সুখকে খুঁজবো ততই আমাদের দুঃখের বোঝা বাড়বে। অতএব যদি সুখলাভই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে বুদ্ধিমানের কাজ হবে এই সুখের প্রসঙ্গ একেবারে উত্থাপন না করা। যখন আমরা কোন বস্তুকে চাই তখন সেই আকাঙ্খিত বস্তুকে পেলে আমাদের মনে সুখবোধ জেগে ওঠে। তবে এই সুখলাভের জন্য সজাগ ও সচেতন হয়ে যদি চেষ্টা করি তাহলে সুখ লাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটবে না। একে বলা হয়েছে Fundamental Paradox of Hedonism এবং তাই বোধহয় উদগ্র সুখ-কামনায় সুখের পশ্চাদ্ধাবন না ক'রে সব ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

> হাল ছেড়ে আজ বসে আছি
>
> আমি ছুটিনে কাহারো পিছুতে,

Sidgwick যে কথা বললেন, (রবীন্দ্রনাথও সেই এক কথাই বললেন) তা হল ওই সুখের পিছে ছুটে চলার কথা। যে সুখকে ধরার জন্য আমরা

তার পিছু পিছু দৌড়াই সেই সুখ আমাদের করায়ত্ত হয় না। অবশ্য সব সুখ সম্বন্ধে এই কথাগুলি হয়ত সত্য নয়। Pleasure of pursuit এর জন্য অর্থাৎ ছুটে গিয়ে যে সুখকে ধরতে হয় সেই সুখের সম্বন্ধে এই Paradox হয়ত সত্য হবে। আমরা যখন নাটক দেখে সুখ পাই তখন সে সুখ পাওয়াটা আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য হল নাটক দেখাটা। যদি আমরা সজ্ঞানে সচেতন প্রয়াসে এই সুখটুকু লাভ করার চেষ্টা করি তাহলে এই সুখ আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এই সুখ আমরা পাব না। অবশ্য এই Paradox of Hedonism-এর প্রবক্তাদের সবটুকু বক্তব্য যে সত্য নয়, সেকথাটা Rashdall নিজেও স্বীকার করেছেন। আমরা সবসময় এই সুখের সন্ধানে ফিরি না। তবে একথা বলা চলে যে আমরা সুখের সন্ধান করি এবং সুখকে পেয়েও থাকি। আমরা যখন বড়দিনের ছুটিতে বনভোজনে যাবার পরিকল্পনা করি এবং সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলি তখন আমাদের সুখ লাভ এই ধরনের বনভোজনের পরিকল্পনা করার ফলে মোটেই কমে না। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে যদি আমরা প্রতি পদে কতটা সুখ লাভ করা যায় তার হিসেব নিয়ে বসে থাকি এবং সেই সুখ লাভ আমাদের প্রত্যাশার অনুরূপ হয়েছে কিনা সেই হিসেব করি তাহলে আমাদের সুখলাভের হানি হতে পারে। কিন্তু একথা বোধহয় সত্য যে সুখের আধার তার উপাদান এবং সুখের কারণটি সম্বন্ধে যদি আমরা পূর্বেই বিচার বিবেচনা করি, সে সম্বন্ধে যদি পরিকল্পনা প্রস্তুত করি তাহলে তার থেকে কম সুখ লাভ হবে না। হোটেলে খেতে গিয়ে যখন Menu card দেখে অনেক ভেবে চিন্তে আমরা 'লাঞ্চ' আনার হুকুম দিয়ে বসি; তখন কিন্তু খাদ্যতালিকায় প্রদত্ত খাদ্যাবলীর সুখদ গুণের কথা চিন্তা ক'রে খাদ্য নির্বাচন করেছি বলেই খেয়ে আমরা কম তৃপ্তি পাই না অর্থাৎ সুখলাভের ইতরবিশেষ হয় না। যদি আমরা কোন একটি বিশেষ ভোজের জন্য পূর্বাহ্ণেই বিচার বিবেচনা করে সব ব্যবস্থা করে রাখি, তাহলে পূর্বে এই বিচার বিবেচনা করার জন্য ভুরিভোজনের তৃপ্তির বা সুখের ন্যূনতা ঘটবে না। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের সুপরিকল্পিত ভোজে অংশ নিতে পারায় সুখের মাত্রা বেড়ে যাবে। সুতরাং বলা চলে যে তথাকথিত Paradox of Hedonism-এর মধ্যে সত্যের উপাদান থাকলেও তা পূর্ণ সত্য নয়। উপসংহারে আরেকটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। সুখ শব্দটা দ্ব্যর্থ-বোধক। এই শব্দটি একাধিক অর্থে অর্থবান। সুখ কথাটির দ্বারা আমরা যখন আমাদের আকাঙ্খিত বস্তুকে লাভ করার পরে মনে যে সন্তোষ বা প্রীতি উপজাত হয়, তাকে বুঝি, তখন এই শব্দটির প্রথম অর্থটি আমরা পাই। দ্বিতীয়

অর্থে সুখ বলতে আমরা সেই বস্তুকে বুঝি যা আমাদের তৃপ্তি দেয় অর্থাৎ সুখ দান করে। এক্ষেত্রে সুখ বলতে আমরা কোন অনুভূতিকে বুঝি না, আমরা বুঝি একটি বিশেষ বস্তুকে। অতএব যখন কেউ বলে যে সুখই (Pleasure) আমাদের আকাঙ্খার বস্তু, তখন প্রকৃতপক্ষে সুখ বলতে আমরা Pleasures বা Objects of Pleasure-কে সূচিত করি। সুতরাং Pleasure এবং Pleasures শব্দ দুটির ভিন্ন অর্থ থাকাতে অনেক সময় Pleasure of Hedonism'র ও তৎ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যার ভুল টিকা-টিপপনি হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, মনস্তাত্বিক সুখবাদ্ এবং নৈতিক সুখবাদ, (Psychological Hedonism and Ethical Hedonism) এই দুয়ের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে, মনস্তাত্বিক সুখবাদ ত্রুটিহীন, তাহলেও একথা বলা চলে যে, নৈতিক সুখবাদের সঙ্গে এর কোন আত্যন্তিক যোগ নেই। কেউ কেউ মনস্তাত্বিক সুখবাদের সমর্থক হয়েছেন নৈতিক সুখবাদকে বর্জন ক'রে। আবার কেউ কেউ বা নৈতিক সুখবাদকে সমর্থন করতে চেয়েছেন মনস্তাত্বিক সুখবাদকে বর্জন ক'রে। মনস্তাত্বিক সুখবাদের যে প্রান্তিক রূপ তার সঙ্গে নৈতিক সুখবাদ একেবারেই অসঙ্গত। যদি আমরা সকলেই সুখের অন্বেষণ করি তবে সুখের অন্বেষণ করা উচিত, এই মতবাদ একেবারে হাস্যকর হয়ে পড়ে। অবশ্য যদি কেউ বলেন যে, মনস্তাত্বিক সুখবাদ বলতে চাইছে যে আমাদের যে কোন ধরনের সুখই হোক না কেন তা চাওয়াই আমাদের ধর্ম। তা যদি হয়, তাহলে নৈতিক সুখবাদ বলবে যে আমরা আমাদের সবচেয়ে মহত্তম সুখকে চাইব ; এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইভাবে এই দুটি আপাত : বিরোধী মতের মধ্যে সঙ্গতি দেখানো যেতে পারে। মনস্তাত্বিক সুখবাদ নৈতিক সর্ব সুখবাদের সঙ্গে (Ethical Altruistic Hedonism) সঙ্গতি রাখতে পারে যদি আমরা এইভাবে আত্মসুখ ও সর্বসুখকে পরস্পরের পরিপূরক বলে গ্রহণ করি। অপরের সুখ বিধান করলে তার মধ্যদিয়েই আমি আমার নিজের সুখ পাব, এই তত্ত্বে বিশ্বাস করলে তবেই মনস্তাত্বিক সুখবাদের সঙ্গে নৈতিক সুখবাদের সমন্বয় ঘটানো যাবে। অতএব বলা চলে যে, মনস্তাত্বিক সুখবাদ হল একটি অমনস্তাত্বিক বিবেচনা ; আমরা আমাদের আকাঙ্খিত বস্তুকে পেলে তার ফলশ্রুতি হিসেবে সুখ লাভ ঘটে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, সুখ বা Pleasure-এর দুটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। চিন্তার দ্বারা আমরা মানসিক অনুভূতিকে বুঝি, এবং ঐ অনুভূতির দ্বারা কোন একটি বিশেষ বস্তুকে বুঝি যা থেকে ঐ মানসিক অনুভূতির উদ্ভব হয়েছে। আমরা সুখের বস্তুকে

কামনা করতে পারি। সেই বস্তুটিকে কামনা করার মধ্যে সেই প্রার্থিত বস্তুটির লাভজনিত সুখের কোন হানি ঘটেনা। অর্থাৎ এই সুখকর বস্তুটির কামনা সুখের হানি ঘটায়না এবং এর ফলে Paradox of Pleasure তত্ত্বের উদ্ভবও হয়না। কিন্তু সুখকর বস্তুটির পরিবর্তে যদি আমরা সুখকে চাই তাহলে সেই সুখের হানি ঘটবে; একথা শিজউইক বলেছেন; তার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি এবং এই প্রসঙ্গে শিজউইকের সেই সাবধান বাণী স্মরণীয়।

সপ্তম অধ্যায়

স্থূল নৈতিক সুখবাদ

স্থূল নৈতিক সুখবাদের ব্যাখ্যা—স্থূল আত্মসুখবাদ ও তার সমালোচনা—মার্জিত আত্মসুখবাদ—আত্মসুখবাদের সমালোচনা—মার্জিত ভোগবাদের ব্যাখ্যা—উপযোগবাদ—বেন্থামের স্থূল উপযোগবাদ ও তার সমালোচনা—মিলের উপযোগবাদ ও তার পর্যালোচনা—শিজউইকের উপযোগবাদ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

সপ্তম অধ্যায়

স্থূল নৈতিক সুখবাদ (Gross Ethical Hedonism)

এমন কথা বলা হয়েছে যে [মানুষের পক্ষে সুখই জীবনের পরম আদর্শ। আমাদের সকল কর্মের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখ লাভ। এই সুখ লাভই হল আবার আমাদের আচরণের নৈতিক মাপকাঠি।] এই তত্ত্বমতে সেই কাজই ন্যায় ও কল্যাণকর ব'লে বিবেচিত হবে, যদি তা থেকে আমরা আনন্দ পাই। যা সুখ দেয় তা-ই ভালো, যা দুঃখ দেয় তা মন্দ এবং সর্বথা পরিত্যজ্য। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে এই সুখ বা আনন্দ, কি শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুখ না উচ্চতর কোন প্রবৃত্তির তৃপ্তিজনিত আনন্দ? যাঁরা বলেন যে, এই সুখ হল ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিত তাঁদের বলা হয় স্থূলসুখবাদী বা Gross Ethical Hedonists।) অবশ্য সবাই যে এই স্থূল ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকে আনন্দের উৎস বলে মনে করেন, তা নয়। (যাঁরা বলেন যে সূক্ষ্মতর আত্মিক তৃপ্তি হ'ল আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তাদের বলা হয়েছে মার্জিত সুখবাদী বা Refined Hedonists।) অবশ্য গোড়াতেই একথা বলা দরকার যে, মার্জিত সুখের সঙ্গে স্থূল সুখের প্রভেদ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে, এইযে আমরা সুখের কথা বলছি, এই সুখ কার? (যদি আমরা বলি যে আমরা সবাই নিজের নিজের সুখের জন্য কাজ করব এবং অপরের সুখের দিকে দৃষ্টি দেবার কোন প্রয়োজন নেই, তাহলে যে মতবাদের উদ্ভব হবে, তাকে বলা হয়েছে আত্মকেন্দ্রিক ভোগ-বাদ অর্থাৎ Egoistic Hedonism) নিজের সুখ, আপনার কল্যাণ, এতো সবাই চায়। তাই আত্মসুখকেই সকল নৈতিক কর্মের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বলে গ্রহণ করলে সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই বলা হ'য়েছে, 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' অর্থাৎ বহুলোকের সুখ এবং বহুলোকের কল্যাণের জন্যই আমাদের কর্ম করা উচিত। (যারা অপরের সুখকে নৈতিক জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেন, তাদের বলা হয় Alturistic Hedonists বা পরসুখবাদী।) এই পরসুখবাদীরা আবার দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন। একদলকে বলা হয় স্থূল প্রেয়োবাদী, অন্যদল হলেন মার্জিত প্রেয়োবাদী। [এই প্রসঙ্গে আমরা সুখবাদী এবং প্রেয়োবাদীকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছি]

স্থূল আত্মসুখবাদ (Gross Egoistic Hedonism)

সুপ্রাচীন গ্রীক দার্শনিক **Aristippus** আমাদের বলেছিলেন যে, ইন্দ্রিয় সুখই মানুষের চরম এবং চরম কাম্য। মানুষের জীবনের চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে যে ব্যবধানটি থেকে যায়, সেই ব্যবধানকে আবিষ্কার করে বুদ্ধি। বুদ্ধি আমাদের প্রবৃত্তিকে ইন্দ্রিয় সংযমের আদর্শের দিকে চালিত করে। আমরা ইন্দ্রিয়-অনুভূতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করি না। কেননা আমরা মনে করি যে, আমাদের বিচার বুদ্ধি আমাদের যে পথে চালিত করে সেই পথই প্রেয় এবং শ্রেয়। এ্যারিষ্টিপাস্ বললেন যে, এইসব কথার খুব বেশী সারবত্তা নেই কেননা, জীবন অস্থায়ী ; সেই অস্থায়ী জীবনের মধ্যে যতটুকু সম্ভব আপনার সুখ আহরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। হিসেব করে বুদ্ধি বিবেচনা করে চলতে গেলে জীবনের বহু সময়েরই অপব্যয় ঘটে, সুখের অপচয় হয়। সুতরাং ভারতীয় লোকায়ত দর্শনের অনুরূপ মত প্রকাশ ক'রে এ্যারিষ্টিপাস বললেন যে, বর্তমানের সমস্ত সুখকে আহরণ ক'রে সেই সুখ আকণ্ঠ ভোগ কর। এ্যারিষ্টিপাস সুখের মধ্যে কোন গুণগত বিভেদ স্বীকার করেন নি। সক্রেটিস্ বলেছিলেন যে, চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ, ধ্যান-ধারণা থেকে আমরা যে সুখ পাই তা দীর্ঘস্থায়ী হয় ; সেই সুখ মনুষ্যত্বের সুখ। কিন্তু এ্যারিষ্টিপাস্ এই মত গ্রহণ করেন নি। তিনি বললেন যে, দূরাশ্রিত আদর্শের জন্য বর্তমানে আমি যে ইন্দ্রিয় সুখ পাচ্ছি, সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন অর্থই হয় না। যে মানুষ তা করে, যে মানুষ এই আত্মবঞ্চনা করে, সে নির্বোধ। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক Seth-এর মত উদ্ধৃত করে দিই ; আমরা অনন্তের সন্তান নই। আমরা হলাম কালাশ্রিত এবং কালের কুক্ষিতেই আমাদের জন্ম ; তাই আমাদের ওপর বর্তমান কালের দাবিটা (পলাতক এই মুহূর্তের দাবিটাও) অত্যন্ত বেশী সক্রিয়। আবেগ অনুভূতিকে সাইরেনিক জীবনাদর্শ প্রাধান্য দিয়েছে ; যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনার প্রাধান্যকে অস্বীকার করেছে সাইরেনিক জীবনাদর্শ। ["The very fact that we are children of time, not of eternity, makes the claim of the present, even of the momentary present, imperious and supreme...A life of feeling, pure and simple, heedless and unthinking, undisturbed by resaon—such is the cyrenaic ideal.]*

* A Study of Ethical Principles, পৃ: ৮৪ দ্রষ্টব্য।

Cyrenaic আদর্শ ও এই স্থূল আত্মসুখবাদকে প্রচার করেছিল। এ্যারি-ষ্টিপাস্ এই মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা।

এই ধরনের কথা শুধুমাত্র যে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে বলা হয়েছিল তা নয়। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, ভারতীয় লোকায়ত দর্শনে (চার্বাক মতবাদে) এই ধরনের কথা বলা হয়েছিল। এই মত অনুসারে ঋণ করেও ঘি খাওয়া উচিত এই উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা যতক্ষন বাঁচব, ততক্ষন সুখের মধ্যে বাঁচার চেষ্টা করব। অর্থাৎ স্থূল সুখ লাভই আমাদের জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য। এই মতের অনুরণন শুনেছি পারস্যদেশের কবি ওমর খৈয়ামের কবিতাতে। Fitzerald ওমর খৈয়ামের যে সব কবিতার অনুবাদ করেছেন তার থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করছি:

'আহা, নগদ মূল্যে আস্থা রাখ, রাখো
বাকীটাকে দাওনা জলাঞ্জলি;
দূরের ঢাকের বাদ্যি বাজে বাজুক্
কান দিওনা, শোন শোন বলি,
জীবনটা যে নিত্য পলাতক
সত্য ইহা, আর সবই যে ফাঁকি
যে ফুল ফোটে একটি বারের তরে
মৃত্যু তাহার নিত্যকালের সাথি।'*

["Ah ! take the cash, and let the credit go
Not heed the rumble of the distant drum
... ...
One thing at least is certain
This life flies ;
One thing is certain and the rest is lie ;
The flower that once has blown for ever dies']

আমরা ওমর খৈয়ামের মুখেও শুনেছি যে, ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের আনন্দকে পরিপূর্ণ রূপে ভোগ করাই হোল বুদ্ধিমানের কাজ। ইন্দ্রিয় সুখই সর্বপ্রথমে কাম্য এবং সহজলভ্যও। বিচার-বিবেচনা আমাদের জীবনের সুখলাভের পথে বাধা স্বরূপ। অতএব ওমর খৈয়ামের মতের সঙ্গে চার্বাক, Cyreniac প্রমুখ

* গ্রন্থকার কৃত বঙ্গানুবাদ।

দার্শনিকদের মতের একটা গভীর মিল রয়েছে। কবি Horace'র কাব্যে আমরা এই স্থূল ভোগবাদের, আত্মসুখবাদের কথা পড়েছি ও ইংরেজ কবি বায়রণের কবিতায়, জার্মাণ কবি হাইনের কাব্যেও এই তত্ত্ব পেয়েছি। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্নের কমল চরিত্রের মধ্যে এই স্থূল ভোগবাদকে লক্ষ্য করেছি। অবশ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সাহিত্যে এই স্থূল ভোগবাদকে স্বীকার করতে পারেন নি। তার যুক্তিযুক্ত কারণও আছে। এই প্রসঙ্গে ভোগসুখবাদের উপযোগিতা আমাদের জীবনে কতটুকু, এই নিয়ে ভাববার অবকাশ যথেষ্ট আছে। মানুষের অভিজ্ঞতাই যদি সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হয়, মূল্যায়নের শেষ কথা হয়, তাহলে এই প্রশ্ন খুব যুক্তিযুক্ত ভাবেই আসবে যে, যারা চিরজীবন আত্মসুখের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা কি শেষপর্যন্ত সুখের সন্ধান পেয়েছে? গীতায় বলা হয়েছে যে, আমাদের কামনা আমরা যতই পূরণ করি, তা ততই বেড়ে ওঠে। অগ্নিতে ঘৃত সংযোগ করলে তা যেমন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি ধারা আমরা আমাদের কামনাকে যতই তৃপ্ত করি, ততই কামনা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ইন্দ্রিয় সুখের তৃপ্তির মধ্যে আমাদের পরম এবং চরম কল্যাণ নিহিত নেই। একথা হয়তো পশুদের জীবনে এবং পশুদের জগতে সত্য হতে পারে; মানুষের জগতে একথা সত্য নয়। শুধুমাত্র সুখের অন্বেষণ, ভোগবৃত্তির লালসা মানুষকে সত্যিকারের সুখ দিতে পারে না। অসংযত প্রবৃত্তির ঘোড়ার সওয়ার হলেও আমাদের সংযমের লাগামটাকে দৃঢ়হাতে ধরতে হয়। উপনিষদকার 'ঈশাবাস্য' মন্ত্রে বললেন যে, ভোগের পূর্ণতা হয় ত্যাগের পথে। নীতিবিদ Seth মন্তব্য করলেন: 'অতএব আমরা বলতে পারি যে সাইরেনিক নীতিবাদীদের মতে সাংসারিক বিবেচনা ছাড়া সুখলাভ সম্ভব নয়। তাঁরা এই তত্ত্ব স্বীকার করতে একরকম বাধ্য হলেন।' ['Accordingly we find even the cyrenaics admitting in spite of themselves that prudence is essential, to the attainment of pleasure.'] অতএব দেখা গেল যে, স্থূল আত্মসুখবাদ নৈতিক মত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। ভোগবাদকে দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। যারা এই ভোগবাদে বিশ্বাস করেছেন, তাঁদের মূল দর্শন মত হল জড়বাদ। জড়বাদে মানুষ সুখের স্বাভাবিক আকর্ষণকে স্বীকার করেছে। আমরা যখন আদর্শকে অনুসরণ করে পদে পদে জীবনের লড়াইয়ে হেরে যাই তখন ভোগবাদের সহজ পথটাকে বেছে নিই। এ একধরনের escapism; আমরা যখন সংসারের রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করে অন্ধকার চোরা পথে জীবনের সার্থকতা পাবার চেষ্টা করি তখনই

এই পলায়নী বৃত্তিটা আমাদের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। আমাদের ভীরুতা, কাপুরুষতা এই পলায়নী বৃত্তিকে আশ্রয় করে। আমরা প্রবৃত্তির স্রোতে গা াসিয়ে দিই। জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য পূরণ আয়াসসাধ্য এবং কঠোর সাধনার পথেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই তত্ত্বে যারা বিশ্বাস করেন, তাদের মধ্যে চরিত্রের দৃঢ়তা ও মন্ত্র সাধন করার একনিষ্ঠতার প্রয়োজন আছে। যাদের মধ্যে তা থাকে না, তারাই স্থূল সুখবাদের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে তাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে। যিনি জীবনকে স্বীকার করেন এক মহত্তম জীবন সৃষ্টির প্রতিফলন রূপে, তিনি এই ধরনের আত্মসুখবাদে বিশ্বাস করতে পারেন না। তাঁর কাছে জড়বাদী দর্শনের এই মুহূর্তের অস্তিত্বটুকু সত্য নয়। তিনি আত্মা, পরলোক, ধর্ম, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। সুখবাদের বনিয়াদ জড়বাদে তিনি বিশ্বাসী নন। তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী কবি রবীন্দ্রনাথের মত বলতে পারেন—

'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়
এই শেষ কথা ব'লে,
যাব আমি চলে।'

কবি টেনিসন রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কথা বলেছিলেন :

তুমি ধুলোর ধুলো,
ধুলোয় তোমার হ'বে চরম গতি ;
এমন কথা বলল নাকো ওরা
আত্মাকে ; তার মৃত্যুজয়ী জ্যোতি।*

['Dust thou art and to dust returnest
Was not Spoken of the soul.']

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, যাঁরা এই ধরনের স্থূল আত্মসুখবাদে বিশ্বাস করেন, তাঁরা জড়বাদী দার্শনিক। এই শ্রেণীর দর্শন-শাস্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন, Thomas, Hobbes, Mandeville এবং Helvetius : আত্মসুখবাদী Helvetius বললেন যে, আত্মা বা Soul বলতে আমরা আমাদের মস্তিষ্ক বা স্নায়ু ছাড়া অন্য কিছু বুঝি না। মানুষের সব কাজই হল স্নায়ুগত কর্ম এবং মানুষ সাধারণত: জৈবিক প্রয়োজনে সব কাজ করে। জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে সে সুখের সন্ধান করে। আমরা যখন অপরের ভালো করি, অপরকে

* গ্রন্থকার কৃত কাব্যানুবাদ।

সহানুভূতি দেখাই, অপরকে দয়া করি, এসবই হল এক ধরনের আত্মরতি ; নিজেকে যে আমি ভালোবাসি তারই রূপভেদ আমাদের এইসব বহু প্রশংসিত গুণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু Helvetius স্থূল আত্মসুখবাদের যে ধরনের গুণকীর্তণ করেছেন, সেটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। Helvetius নিজেও জানতেন যে, এই ধরনের স্থূল আত্মসুখবাদ কখনই যুক্তি-সিদ্ধ মত রূপে গ্রাহ্য হতে পারে না। তাই তিনি বললেন যে, মানুষের প্রবৃত্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ করলে তবেই মানুষের পক্ষে যূথবদ্ধ জীবন, সামাজিক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে। অতএব বলা যেতে পারে যে, Helvetius-এর লক্ষ্য হল Modificd go বা স্থূল আত্মসুখবাদের পরিশীলিত রূপ। মানুষের ব্যক্তিগত সুখলাভের ইচ্ছা যখন রাষ্ট্র-আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই যথার্থ গ্রহণযোগ্য নৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। Mandeville ও Helvetius-এর মতই মনে করতেন যে, আমাদের সকল কর্মের উৎস হল আমাদের নিজের নিজের স্বার্থ। এঁরা দুজনেই ব্যক্তিগত সুখবাদের প্রবর্তক। Mandeville-এর মতে আমরা নিজেকেই শুধু ভালো-বাসি ; কখন কখন অপরকে যে ভালোবাসি এবং কখন বা অপরকে যে ঘৃণা করি তাহল আমাদের নিজেকে ভালোবাসার রূপভেদ। অর্থাৎ আমি আমাকে ভালোবাসি বলেই আমার সঙ্গে যার স্বার্থ মেলে না, তাকে ঘৃণা করি। আর আমার স্বার্থের সঙ্গে যার স্বার্থ মেলে তাকে ভালোবাসি। অতএব Mandeville যে কথা বললেন, তার প্রতিধ্বনি পাই Helvetius-এর মতবাদে। Helvetius বললেন যে, আমার নিজের সুখই হল আমার পরমপুরুষার্থ। যাকে আনন্দ বলছি, তাহল আমার দেহগত সুখবোধের বৃহত্তম প্রকাশ।

মার্জিত আত্মসুখবাদ (Epicureanism)

মানুষ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। তাই সে আপনার স্থূল সুখকে কখনই তার নৈতিক জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ রূপে গ্রহণ করতে তৎপর হয় না। প্রাচীন গ্রীস দেশের মহাদার্শনিক এ্যারিস্টটলের স্থূল আত্মসুখবাদের কথা আমরা আলোচনা করেছি। এই স্থূল আত্মসুখবাদের বিরুদ্ধে মার্জিত ভোগবাদ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই মতের প্রবক্তা হলেন Epicurus ; তিনি বললেন যে, ব্যক্তির সুখই নৈতিক আদর্শ বটে, কিন্তু ব্যক্তির সুখ বলতে তিনি অন্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির শাসনকে বোঝেন নি। জীবনকে যদি আমরা সম্যক্ দৃষ্টিতে না দেখি, তার বিচার বিশ্লেষণ ক'রে, ইন্দ্রিয় সংযম না করি, তাহলে আমরা কখনই সুখ পেতে পারি না। প্রবৃত্তির তৃপ্তি করা দরকার,

কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের যুক্তি, আমাদের বিচার সেই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত হরে। বুদ্ধির এই সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা যদি আমরা প্রবৃত্তিকে স্ববশে রাখতে পারি তাহলে আমাদের ভাগ্যে যে সুখ ঘটবে তা নৈতিক আদর্শ অনুমোদিত। সক্রেটিস যে সংযম এবং Prudence বা সাবধানী বিচার বুদ্ধির কথা বলেছেন, তা সর্বতোভাবে গ্রহণ-যোগ্য। Epicurus বললেন যে, আদর্শ (কাম্য) জীবনের (The blessed life) উদ্দেশ্য হল সুখ লাভ। যা সুখকর তা জীবের পক্ষে শুভ। অতএব বিচার বিবেচনা করে সুখের পশ্চাদ্ধাবন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই বিচার বিবেচনার ফলেই আমরা সংযম শিখি এবং বহুক্ষেত্রেই সুখকে স্বেচ্ছায় পরি-ত্যাগ করি। আপাত: সুখের পরিণাম হল দুঃখ ও অশান্তি; তাই আমরা সংযত জীবনে ধীর চিত্তে ও শান্ত বিচারের দ্বারা আমাদের কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করি। আমাদের সাবধানী বুদ্ধি বা Prudence আমাদের নির্বিচারে ইন্দ্রিয়-ব্যসনে লিপ্ত হতে নিষেধ করে; জীবনের যত সৎ গুণ তা সুখের সঙ্গে যুক্ত। এবং সুখের জীবন সংযম বোধের ও সাবধানতার দ্বার চিহ্নিত। অতএব বিচার বিবেচনা প্রসূত যে সুখ, তা নির্বিচার ইন্দ্রিয় ভোগবাদের উপরে একথা Epicurus ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এই বুদ্ধিগত আনন্দকে ইন্দ্রিয়গত আনন্দের উপরে স্থান দিলেও তিনি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেন নি যে, বুদ্ধিগত সুখের গুণগত উৎকর্ষ রয়েছে; তবে সেই উৎকর্ষ যে প্রবৃত্তিজাত আনন্দের মধ্যে নেই এই ধরনের মত তিনি ব্যক্ত করেছেন। Epicurus বললেন, 'যদি আমরা জীবনে অভাব বোধ কমাতে পারি, তাহলে দুঃখের লাঞ্ছনা আমাদের কমবে। আমাদের ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য দমন করতে হবে। কেননা মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে অশান্ত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। এপিকিউরস এ্যারিষ্টটলের মতো বলেছিলেন, ভগবানের মঙ্গল বিধানের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত নয়; পৃথীবী কোন একটি নির্দিষ্ট শুভ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছে না। অতএব এই ক্ষুদ্র এবং খণ্ডিত জীবনে আমাদের সুখের সন্ধান করতে হলেও সেই সুখলাভের অর্থ উদ্দাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা নয়। প্রবৃত্তির সংযম ও নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাম্য। যদি আকাঙ্খাকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি তবেই আমাদের আকাঙ্খা পূরণ হতে পারে। এপিকিউরাসের মত Stoic-রা ও একথা বললেন। জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে, নৈরাশ্যবাদে আস্থা স্থাপন ব্যাপারে তাঁরা এপিকিউরাস-পন্থী ছিলেন। অবশ্য Stoic রা নিরাসক্তির কথা বলেছিলেন। যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন এবং সুখে বিগতস্পৃহ সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সর্ববিষয়ে উদাসীন। তিনিই

সুখী। প্রবৃত্তির দাস নন বলেই তিনি নিজেকে স্বাধীন এবং সুখী বলে ভাবতে পারেন। এপিকিউরাস দর্শনে সূক্ষ্ম ভোগবাদ যে স্থূল ভোগবাদ থেকে উচ্চতর, সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মানুষের দেহমনের সুখটাই সবচেয়ে বড়। কিন্তু এই সুখ অন্ধ প্রবৃত্তির অনুসরণজনিত সুখ নয়। এই আদর্শ অনুযায়ী আমাদের বিচার বিবেচনা, আমাদের যুক্তি বুদ্ধি প্রবৃত্তির দাবী পূরণের সহায়ক হয়ে উঠে। আমরা সুখ চাইলেও সেই সুখের চাওয়ার মধ্যে যুক্তির আলো এসে পড়ে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এপিকিউরাস বিচার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকার করেছেন।

একথা বলা চলে যে, এপিকিউরাসের মার্জিত সুখবাদ একথা বলতে চেয়েছে, দুঃখ নিবারণই হল মানুষের কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। এপিকিউরাস সুখের আদর্শের সঙ্গে সুবিচার, মর্যাদা এবং সংযমকে যুক্ত করেছিলেন। শুধুমাত্র সুখই আমাদের আদর্শ নয়। এই সুখকে পাবার পথ হল, কঠোর কর্তব্য পালন। কর্তব্য পালনের মধ্যে যদি সুখের উপাদান এবং প্রতিশ্রুতি না থাকে তবে তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এপিকিউরাস তাঁর মতবাদে দুঃখ এড়ানোর কথা বলতে গিয়ে দুঃখ এড়ানোকেই জীবনের আদর্শ এবং লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই আদর্শে উদ্যম এবং কর্মের স্থান সঙ্কীর্ণ এবং অতিমাত্রায় এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সমাজের হিতের সঙ্গে, বৃহত্তর কল্যাণবোধের সঙ্গে আমরা ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ কামনাকে যুক্ত করে দিতে পারি না। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি—এই দুইয়ের কল্যাণের একটি মিলন বিন্দু আছে। সেই মিলন বিন্দুটি সম্বন্ধে স্থূল সুখবাদ যেমন অজ্ঞ, তেমনি মার্জিত সুখবাদও উদাসীন।

এই প্রসঙ্গে আমরা আত্মসুখবাদীদের সমালোচনা করে বলতে পারি যে, আত্মসুখবাদ মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সবই আত্মসুখবাদের মধ্যে অনুস্যূত। হবস্ বলেছিলেন যে, আমরা সবাই আত্মকেন্দ্রিক এবং আমাদের অনুভূতির এবং আবেগের জীবন মূলত আমাদের আত্মরতির (Self-love) প্রকাশ মাত্র। একথাটা বোধ হয় সত্য নয়। উদাহরণ দিই—আমরা যখন পূজোর সময় পুত্র-কন্যা, ভাইপো ভাইজি, ভাগিনেয় ও আত্মীয় পরিজনের জন্য নূতন কাপড় কিনে দিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ি, তখন কিন্তু নিজের জন্য কোন কিছু কিনতে পারি না বলে মোটেই দুঃখ বোধ করি না। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যেমন আত্মরক্ষার জন্য সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই করেছে তেমনি সে স্বাভাবিক ভাবেই আত্মাহুতিও দিয়েছে অপরের কল্যাণের জন্য। নিজেকে ভালোবাসা যেমন

মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম তেমনি আবার অপরকে ভালোবাসাও কম স্বাভাবিক ধর্ম নয়। অপরকে ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসার একটা মূল (Root) আছে। সেই মূল হল altruistic Instinct বা অপরকে ভালোবাসার, অপরের ভালো করার প্রবৃত্তি। নিজেকে ভালোবাসার মৌল প্রবৃত্তিও মানুষের মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে আছে। সুতরাং এই দুয়ে মিলেই মানুষের প্রকৃতি গঠিত হয়েছে। কেবলমাত্র আত্মস্বার্থই মানুষের প্রকৃতির উপাদান নয়। কেন না, এই আত্ম-বুদ্ধি কখনই আমাদের নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠি হতে পারে না। আমার কাছে যা সুখকর তোমার কাছে তা সুখকর নয়। অতএব আমার সুখই যদি নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠি হয়, তাহলে নৈতিক মূল্যের জগতে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যবাদের সৃষ্টি হবে। সর্বজন-গ্রাহ্য নেতিক মূল্যায়নের কোন মাপকাঠি নির্ধারণ করা যাবে না।

আমার মনে যেসব সুখ উপজাত হয়, তার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা অসম্ভব কাজ। আত্মসুখবাদে এই ধরনের মূল্যায়ন মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই বিচারের অযোগ্য।

অতএব বলা চলে যে, স্থূল বা ইন্দ্রিয়গত সুখবাদ কোন নৈতিক দায়িত্বের মর্যাদা দাবী করতে পারে না। স্থূল আত্মসুখবাদ আমাদের উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। অসংযমের দ্বারা কখনও জীবনে কোন মূল্যের প্রতিষ্ঠা করা বা জীবনকে ফলবান করা যায় না। তাই এরিষ্টিপাস (Aristippus) আমাদের স্থূল প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছিলেন। মার্জিত সুখ-বাদে (Epicureanism) অবশ্য স্থূল ইন্দ্রিয় পরায়ণতার সুযোগ নেই ; তা বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাময়িক, ক্ষণিক সুখকে জীবনের মহত্তম লক্ষ্য বলে এপিকিউরাস স্বীকার করেন নি। এই প্রসঙ্গে আমরা এপিকিউরাসকে সমর্থন করি। কিন্তু এপিকিউরাস যে ধরনের নিবৃত্তিকে আমাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য বলে স্বীকার করলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া শক্ত। কেন না, এই প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি অভাবাত্মক বা Negative। সুতরাং সক্রিয় নৈতিক জীবনের পক্ষে এই ধরনের মতবাদ হানিকর। আমাদের মধ্যে অপরের কল্যাণ সাধন করার, বা মঙ্গল করার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, স্বাভা-বিক প্রবণতা আছে, Egoistic Hedonism বা আত্মসুখবাদ তার ব্যাখ্যা করতে পারে নি। এখানেই আত্মসুখবাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

মার্জিত ভোগবাদ বা Altruistic Hedonism

মার্জিত ভোগবাদ বলে যে সবার সুখই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত।

তবে সবার সুখ বোধ হয় এক ভগবান ছাড়া অন্য কোন মানুষই তার কর্মের দ্বারা সম্পাদন করতে পারে না। কেননা জগতে কোন একটি কাজ বহুলোকের সুখ-শান্তির কারণ হলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজনের তা দুঃখের কারণ হবেই। উদাহরণ দিই—হিরোসিমায় ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা না ফেললে হয়তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান অতো তাড়াতাড়ি ঘটত না। যুদ্ধের অবসানের অর্থ হল বহু জীবন রক্ষা পাওয়া, বহু ধ্বংসের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো এবং বহু ক্ষতির নিবৃত্তি করা। পৃথিবী জুড়ে এই ভয়াবহ ক্ষতিকে থামাতে গিয়ে হিরোসিমা ও নাগাসাকির অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক মানুষের উপরে যে অত্যাচার হল তার ভয়াবহতা বিস্ময়কর। ওই দেশের মানুষেরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, আমরা বলতে পারি যে মিত্র পক্ষ আনবিক বোমার ব্যবহার করে যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিল ব'লে বহু মানুষের কল্যাণ হয়েছে। কিন্তু সকলের কল্যাণ তো হয়নি; বোধহয় সকলের কল্যাণ করা যায় না। তাই মার্জিত ভোগবাদ চাইল, বহুসংখ্যক লোকের বৃহত্তম সুখ বা আনন্দ সম্পাদন করতে। এঁদের মতে সেই কাজই ভালো যা বহুজনের সুখ, বহু-জনের হিত বা কল্যাণ সাধন করে। এই তত্ত্ব আধুনিক মননের তত্ত্ব। দার্শনিক মিল এবং বেস্থাম এই মতের অনুসারী। অবশ্য বেস্থাম এবং মিলের মতের মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য রয়ে গেছে। বেস্থাম সুখের পরিমাণগত বিভেদকে স্বীকার করেছেন এবং মিল সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করেছেন। আমরা বেস্থামকে মার্জিত ভোগবাদের স্থূল রূপ (যাকে quantitative altruism বলা হয়েছে) তার প্রবক্তা রূপে গ্রহণ করব—এটা হল গুণীজন স্বীকৃত মত। মার্জিত ভোগবাদের একটি সূক্ষ্মরূপ আছে; মিল এই মতের প্রবক্তা। মহাদার্শনিক এ্যারিষ্টটল এই ধরনের মতকে utilitarianism আখ্যা দিয়েছিলেন।

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা এ্যারিষ্টটল ও এপিকিউরাসের মতের আলোচনা করেছি। এঁরা উভয়েই সুখবাদী। কিন্তু এঁদের একজন স্থূল সুখবাদ আরেকজন সূক্ষ্ম সুখবাদের উপাসক। এই মার্জিত সুখবাদ অপরের আনন্দ সম্পাদন করতে চেয়েছে। এই আনন্দই ভারতীয় দর্শন মতে সমগ্র সৃষ্টির মূলে রয়েছে। উপনিষদ বললেন:

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দম্ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

এই আনন্দতত্ত্বই সমগ্র সৃষ্টির মূলে। ঋগ্বেদের মধুবাতা মন্ত্রে এই আনন্দের কথা বলা হয়েছে। উপনিষদে একদিকে যেমন আনন্দের তত্ত্ব আছে, তেমনি ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদের ও অসদ্ভাব নেই। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের দুঃখবাদ উল্লেখ্য। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ স্বীকৃত, দুঃখের নিবৃত্তি, করুণার কল্যাণস্পর্শ, দুঃখ নিরোধের অস্তিত্ব এবং সেই নিরোধ সম্বন্ধীয় পথের নির্দেশ আছে। গ্রীক দর্শনেও দুঃখবাদ প্রকট। আধুনিক যুগে মানুষ আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে উঠেছে; তাই আধুনিক প্রেয়োবাদ এক বলিষ্ঠ জীবন দর্শনের জন্ম দিয়েছে। বহুজনের সুখ, বহুজনের হিতের দিকে লক্ষ্য রেখেই মার্জিত ভোগবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আধুনিক প্রেয়োবাদকে সর্বজন সুখবাদ বা Universalistic Hedonism এবং পরসুখবাদ বা altruistic Hedonism আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে মিল যে ধরনের পরসুখবাদকে গ্রহণ করেছেন তাকে বলা হয়েছে utilitarianism। উপযোগ (utility) বলতে আমরা বুঝি মানুষের সৃষ্ট এমন একটি ব্যবস্থা যা বৃহৎ জনসাধারণের উপকারে আসে। মিল প্রমুখ উপযোগবাদীদের মতে যা মানুষের পক্ষে আনন্দদায়ক বা অনেকের পক্ষে কল্যাণকর তাকেই মঙ্গলজনক বলা যেতে পারে। মিল, বেন্থাম এবং সিজউইক এই মতের প্রবক্তা। মিল ও বেন্থাম একথা বলতে চাইলেন যে, বহুজনের সুখ ও এবং কল্যাণ সম্পাদন ক'রে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখ ও আনন্দটুকু পেতে পারি। ম্যাকেঞ্জির কথা উদ্ধৃত করে দিই: 'বেন্থাম এবং মিল এঁরা উভয়েই আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে পার্থক্যটুকু করেন নি। তাই তাঁদের পরসুখবাদী অর্থাৎ সর্বজনের সুখ কামনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ ব'লে মনে হ'লেও অনেক সময় দেখা যায় যে তাঁরা আত্মসুখবাদকে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করছেন। [Bentham and Mill did not clearly distinguish between egoistic and the Universalistic hedonism, and consequently, though in the main supporting only the latter often seemed to be giving their adhesion to the former]* অর্থাৎ মিল ও বেন্থাম ব্যক্তিগত কল্যাণ ও বহুজনের হিতের মধ্যে ভেদরেখা স্পষ্ট করে টানতে পারেন নি। তাঁদের যুক্তি অনুসরণ করে আমরা ব্যক্তি সুখের আদর্শ এবং বহুজনের সুখের আদর্শ, এই দুটির যে কোনটিকে গ্রহণ করতে পারি। তবে ব্যক্তি মানুষের সুখের ধারণা থেকে সমস্ত মানুষের সুখের ধারণার দিকে ধীরে ধীরে যে বিবর্তন চলেছে তার নিদর্শন আমরা পাই Paley-র মতবাদে। তিনি বলেছিলেন, 'ভগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ

* A Manual of Ethics, পৃ: ২১১

এবং চিরস্থায়ী সুখের জন্যই আমাদিগকে সর্বমানবের সুখের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। Paley-র উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হ'ল আত্মসুখ বা নিজের সুখ এবং এই আত্মসুখ লাভের উপায় হচ্ছে, বহু মানবের হিত সাধন করা ; অতএব Paley-র মতে আমরা আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের এক সমন্বয়ের চেষ্টা দেখছি।

উপযোগবাদ বা Utilitarianism.

আধুনিক প্রেয়োবাদের প্রবক্তা হিসেবে হিউম, বেন্থাম, মিল, সিজ্‌উইক প্রমুখ যুক্তিবাদীদের গ্রহণ করা যায়। এঁদের মতে সুখলাভই মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অর্থাৎ মানুষের সকল ক্রিয়াকর্মের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হিসেবে আমরা সুখকে গ্রহণ করি। অতএব আমাদের কর্তব্য হল সেই ধরনের কাজ করা যার দ্বারা আমরা সবচেয়ে বেশী সুখলাভ করতে পারি। এখন প্রশ্ন উঠবে যে, এই সুখ কি ব্যক্তি মানুষের সুখ মাত্র, না বহুজনের, বহুমানুষের সুখ ? আর আমরা আমাদের কাজকর্মের দ্বারা আমাদের সুখলাভের জন্য চেষ্টা করব না সমাজের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ব্যক্তির সুখের জন্য চেষ্টা করব ? এই প্রশ্নের সহজ ও স্বাভাবিক উত্তর হবে যে, আমাদের সেই কাজই করা উচিত যে কাজের দ্বারা আমরা সকলের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারি। অবশ্য সকলের সুখের ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। তাই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের সুখের পরিপোষক যে কাজ সেই কাজই আমাদের করা উচিত। অর্থাৎ এক অর্থে আমরা নৈতিক বিচারে ও গণতান্ত্রিক নীতিকে স্বীকার করছি। গণতন্ত্রে যেমন সেই মতই গ্রহণযোগ্য যে মত সংখ্যা গরিষ্ঠের মত, তেমনি এই ধরনের নৈতিক বিচারে ও সেই কাজকেই আমরা নীতিসম্মত বলব যা সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানুষের সুখ বিধান করে। দার্শনিক বেন্থাম এই ধরনের মতের পোষকতা করলেন। বেন্থামের এই মতের প্রতিধ্বনি শুনি দার্শনিক মিলের কণ্ঠে। বেন্থাম বললেন যে, প্রত্যেকটি মানুষ তা সে সামাজিক মর্যাদায় যতই বড় হোক না কেন, সে একজন মানুষই। তার সুখের পরিমাণ তার প্রতিবেশী মেহনতী মানুষটির সুখের পরিমাণের সমগোত্রীয় এবং সমানধর্মা। অর্থাৎ রাজা মহারাজার সুখ, রাম-শ্যাম-যদু-মধু-হরির সুখের থেকে পৃথক নয়। কোনো কাজকে যদি ভালো বলি তা রাজা মহারাজার পক্ষে যদি সুখকর ব'লে, তবে অন্য আরেকটি কাজ যা রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মত সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখকর, তাকেও ভালো বলতে হবে। বেন্থাম বললেন, 'Each to count as one, and no one as more than one'. অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ

ব্যক্তির সামাজিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্য নৈতিক ক্ষেত্রে তাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া চলবে না। মিল এই প্রসঙ্গে যে অভিমত ব্যক্ত করলেন, তা বেন্থামের মতের অনুরূপ। উপযোগবাদ বা Utilitarianism কোন ব্যক্তি মানুষের সবচেয়ে বেশী সুখের কথা ভাবে না ; এই তত্ত্বে সমাজের সমস্ত মানুষের সম্মিলিত সুখের পরিমাণ নিয়ে বিচার করা হয়। উপযোগবাদ এক কথায় আত্মসুখ ও পরসুখের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করছে না। সামাজিক সমস্ত মানুষের সুখের কথাই উপযোগবাদ চিন্তা করেছে। সেকথা আমরা পড়েছি সদ্‌গ্রন্থ বাইবেলে, শুনেছি যীশুখ্রীষ্টের মুখে : 'Love thy neighbour as thyself'—তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালবাস, অর্থাৎ অপরকে আত্মবৎ মনে কর। উপযোগবাদের আদর্শ মানুষের মনুষ্যত্বের ব্যবহারিক দিকটাকে আমাদের চোখের সামনে বেশী করে তুলে ধরেছে। এই আদর্শ আমাদের ব্যবহারগত এই শিক্ষা দেয় যে অপরের কাছে আমরা যে ব্যবহারের প্রত্যাশা করি যেন সেই ব্যবহারই আমরা অন্যের সঙ্গে করি। অর্থাৎ এককথায়, আত্মপর ভেদ বিশেষ ক'রে উপলব্ধি না করার দিকেই উপযোগবাদের নির্দেশ রয়েছে। তার ফলে উপযোগবাদ বলতে পারল যে সর্ব মানবের সুখ সম্পাদন করাই হল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমরা পূর্বেও একথা বলেছি যে, সর্ব মানবের সুখ সম্পাদন করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আমরা এমন কোন কাজ করতে পারি না যার দ্বারা আমরা সকলের সুখ উৎপাদন করতে পারি। তাই এই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় আমরা বলি যে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সুখ সম্পাদন করতে পারে যে কাজ, সেই কাজই হল নীতিশাস্ত্র সম্মত। আধুনিক মননশীল মানুষের কাছে, উপযোগবাদের এই তত্ত্ব গ্রহণীয় হয়েছে। মিল, বেন্থাম যে কথা বললেন, প্রায় তারই প্রতিধ্বনি করে দার্শনিক সিজউইক বললেন যে, আমরা যদি ধীরস্থিরভাবে সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে একথা আমাদের বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, সুখ ছাড়া অন্য কাজের জন্য আমাদের আকর্ষণ নেই। আর যদি সুখই আমাদের কাম্য হয়, তবে আমাদের উচিত সবচেয়ে বেশী সুখকে কামনা করা ; অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী সুখলাভের জন্য আমাদের তৎপর হওয়া উচিত। তবে সুখ-বিচারের বিভিন্ন দিক আছে। মৃদু এবং তীব্র এই দুই প্রকার সুখের মধ্যে যে সুখ তীব্রতর তাকেই আমাদের কামনা করা উচিত। আবার সুখ কখন কখন খণ্ডিত হয়। আবার কখনও বা তা দীর্ঘ হয়। তাহলে ক্ষণিক সুখের চেয়ে দীর্ঘ সুখই আমাদের কামনা করা উচিত। আবার যে সুখ হাতে হাতে এখনই পাচ্ছি অর্থাৎ বর্তমানকালের সুখ, আর যে সুখ

ভবিষ্যতে পাওয়ার আশা থাকে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালের সুখ—এই দুয়ের মধ্যে কালভেদে উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রভেদ করা চলবে না। অবশ্য, বেন্থাম এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বললেন, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সুখের চেয়ে বর্তমানে আমরা যে সুখটুকু পাচ্ছি তার মূল্য অনেক বেশী। এই তত্ত্বকে অনুসরণ করে বোধহয় বলা হয়েছে, 'One on hand is better than two in the bush.'

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিভেদের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে ; সেটা হল নিজের সুখ ও অপরের সুখের কথা। অবশ্য আমরা উপযোগবাদে নিজের সুখ ও অপরের সুখের মধ্যে প্রভেদ না করেও সুখের পরিমানগত বিচার ক'রে কাজের ভালোমন্দ, নৈতিক-অনৈতিক গুণাগুণের পরিমাপ করতে পারি। অপরের সুখ সম্বন্ধে এই ধরনের নৈতিক মূল্যায়নই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই সিজউইক বললেন, যে, অপর মানুষের সুখের পরিমাণ যদি আত্মসুখের পরিমাণের চেয়ে বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে পরের সুখ অনুসন্ধান, করাই যুক্তিসঙ্গত।* কিন্তু সিজউইক সবসময় এই তত্ত্বকে আশ্রয় করে থাকেন নি। তিনি ব্যক্তিগত সুখকে একেবারে পরিত্যাগ করে উপযোগবাদের পরসুখের আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে সকল মানুষের মধ্যে ব্যবহারিক আচরণের মূলে রয়েছে আত্মসুখ সন্ধান এবং এই আত্মসুখের তত্ত্বকে য [illegible] জ্উইক মুখ্য স্থান দিলেন, তখন তিনি মিলের অনুবর্তী না হয়ে বেন্থামের স্বগোত্রীয় হয়ে উঠেছেন।

বেন্থামের স্থূল উপযোগবাদ (Gross altruistic hedonism of Bentham)

[মানুষের স্বভাব-সুখান্বেষণ প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে বেন্থাম তার উপযোগবাদকে গড়ে তুলেছেন। আমরা স্বাভাবিকভাবেই সুখের কামনা করি ; কেউই দুঃখ চায় না। অতএব দুঃখের পরিহার এবং সুখের অন্বেষণ আমাদের সর্ববিধ কর্ম প্রেরণার উৎস। যে কাজ ক'রে আমরা সবচেয়ে কম দুঃখ পাই, (অথবা দুঃখ একেবারেই পাই না) এবং সবচেয়ে বেশী সুখ পাই, সেই কাজই হল ভালো কাজ এবং নীতিশাস্ত্রসম্মত। বেন্থামের মতে সুখের বিচার করতে হবে অঙ্কের নির্ভুল হিসেবে এবং একে বলা হয়েছে Hedonistic Calculus.] এই ন্যূনতম দুঃখ ও বৃহত্তম সুখ এই দুটিকে লক্ষ্য হিসেবে রেখে আমরা যেসব কাজ করব, তাকে Hedonistic Calculus-এ নৈতিক (বা Moral) বলে স্বীকার করা হবে।[যে কাজে দুঃখের চেয়ে সুখের দিকেই ভারের ঝুঁকতি,

* Sidgwick এর 'Methods of Ethics' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সেই কাজকে ভালো বলেছেন বেন্থাম : 'দুঃখ এবং সুখের পরিমাপ কর ; যেদিকে নিক্তি ঝুঁকবে সেই ঝুঁকিটা ভালো বা মন্দ নির্ধারণ করবে।' 'Weigh Pleasures and weigh pains and as the balance stands, will stand the question of right or wrong'* বেন্থাম বিভিন্ন ধরনের সুখের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন নি; সুখের পরিমাপ করেছেন অনুভূতির তীব্রতার দ্বারা। অতএব বিভিন্ন ধরনের সুখের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে তবে তা হ'ল পরিমাণগত। আমরা ফুটবল খেলে যে আনন্দ পাই এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা প'ড়ে যে আনন্দ পাই, এই দুই আনন্দের পরিমাপ যদি সমান হয় তবে বেন্থাম বলবেন যে, এই দুই আনন্দ একই আনন্দ ; এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। অতএব দেখা গেল যে, স্থূল উপযোগবাদে বেন্থামের মত কেবলমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ স্বীকার করেছে।

এখন প্রশ্ন হবে যে, বিভিন্ন ধরনের সুখের মধ্যে যদি গুণগত প্রভেদ না থাকে, কেবলমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ থাকে, তাহলে কি করে আমরা এই সুখের পরিমাণের পরিমাপ করব? এই প্রসঙ্গে বেন্থাম কয়েকটি নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন : (ক) তীব্রতা—তীব্র সুখ অপেক্ষাকৃত মৃদু সুখের চেয়ে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। যে তীব্র সুখে আমরা আত্মহারা হয়ে পড়ি তা যে মৃদু সুখ আমাদের স্বস্থ করে রাখে তারচেয়ে অধিকতর কাম্য। (খ) এই সুখকে দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে। যে সুখ স্বল্পস্থায়ী তার চেয়ে যে সুখ দীর্ঘস্থায়ী, সেই সুখই আমাদের কাম্য। অতএব দেখা গেল, বেন্থামের মতে যে সুখ যত তীব্র এবং যে সুখ দীর্ঘতর সেই সুখকে লক্ষ্য করে আমাদের কাজকর্ম করা উচিত। অবশ্য এই তীব্রতাও দীর্ঘতার সঙ্গে আরও কয়েকটি গুণের কথা বেন্থাম বলেছেন। সেগুলি হল, (গ) নিশ্চয়তা (ঘ) নৈকট্য (ঙ) উর্বরতা (চ) বিশুদ্ধতা। আমরা সেই সুখকে খুঁজবো যে সুখের প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমরা অনেকখানি নিশ্চিত। যে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা অল্প সেই সুখেরচেয়েযে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী তা আমাদের কাছে অধিকতর কাম্য। আবার যে সুখ আমাদের নিকটেই রয়েছে অর্থাৎ যে সুখ আমরা বর্তমানকালে পেতে পারি সেই সুখই আমাদেরকাম্য হওয়া উচিত। ভবিষ্যতের বৃহত্তর সুখের আশায় বর্তমানের ক্ষুদ্রতম সুখকেও জলাঞ্জলি দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নগদ বিদায় ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির চেয়ে অনেক বেশী দামী, একথা বললেন বেন্থাম। তারপরই তিনি বললেন উর্বরতার কথা। যে সুখকর কার্য বর্তমানে সুখ দিয়ে শেষ হয়ে যায় না এবং যার মধ্যে ভবিষ্যতেও সুখ বা আনন্দ পাবার

* Principles of Morals and Legislations.

সম্ভাবনা থাকে, সেই ধরনের কাজ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সবসময় করে থাকেন। বেন্থামের নৈতিক তত্ত্বে এই ধরনের কাজকে বেশী মূল্য দেওয়া হয়েছে। বেন্থাম যখন বিশুদ্ধতার কথা বলেছেন, তখন তিনি একথা বোঝাতে চেয়েছেন, যে কাজ করে অবিমিশ্র সুখ পাওয়া যায়, এবং দুঃখের মিশ্রণ যার সঙ্গে থাকে না বললেই চলে, সেই কাজই আমাদের কাম্য। অর্থাৎ অবিমিশ্র সুখ যে কাজে পাওয়া যায়, সেই কাজই নীতিগতভাবে বাঞ্ছনীয়। সংসারে সব সুখকর কাজের মধ্যে দুঃখকর অবস্থা, বেদনার মিশ্রণ থাকে। তাই আমাদের সুখকর কাজের মধ্যে দুঃখের অংশ যত কম থাকে তা আমাদের কাছে ততো বেশী গ্রহণযোগ্য। সবশেষে বেন্থাম উপযোগবাদে বললেন, যে সুখ বহুজনের মধ্যে বণ্টনযোগ্য সেই সুখ অধিকতর কাম্য। বেন্থাম বিশ্বাস করেছেন যে, মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ; সে নিজের সুখটুকুই কামনা করে ; অবশ্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের কাছে তার নিজের সুখ বিধান করাই হল তার প্রধান লক্ষ্য। সবাই নিজেকে যেমন ভালবাসে অপরকে তেমন ক'রে ভালবাসে না। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই তার আপন নিকটতম আত্মীয়। অবশ্য যুক্তিবাদী বেন্থাম একথা স্বীকার করেছেন যে, যুক্তির দিক থেকে নিজের সুখ এবং অপরের সুখের মধ্যে কোন রকমের পার্থক্য করা সম্ভব নয়। অতএব একথা বলতে হয়, এবং বেন্থাম একথা বলেছেন যে, যে সুখ বহু সংখ্যক মানুষের সুখ সেই সুখই আমাদের নৈতিক জীবনের আদর্শ। আমাদের কর্মের দ্বারা সেই বহু মানুষের সুখকেই সত্য করে তুলতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে, আত্মসুখ যদি কাম্য হয় তাহলে আমরা পরোপকার করি কেন? বেন্থাম বলেন যে, নৈতিক চাপ বা Moral Sanction-এর পাল্লায় পড়ে আমরা পরোপকার করতে বাধ্য হই। লোকমতের চাপ, রাষ্ট্রসংবিধানের নির্দেশ, এবং ধর্মের অনুশাসন—এরা সবাই আমাদের স্বার্থত্যাগ করতে বাধ্য করে ; এগুলিকেই বেন্থাম Moral Sanction বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি Natural Sanction বা প্রাকৃতিক চাপের কথা ও বলেছেন। আমি যদি প্রয়োজনীয় আহারের থেকে বেশী ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করি তাহলে আমাকে অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগতে হয়। অতএব প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ না করে আমি আমার উদরপূর্তির পরে উদ্বৃত্ত খাদ্য অপরকে দিয়ে থাকি। সমাজে বাস করে, সামাজিক সহৃদয় হিসেবে আমি অপরের সুখ-দুঃখের খবরদারি করি, প্রয়োজন বোধে কিছু কিছু আত্মত্যাগও করে থাকি। প্রতিবেশীর অসুখ করলে ডাক্তার ডেকে দিয়ে আমি আমার কর্তব্য করে থাকি ; এটুকু না করলে সমাজে নিন্দিত হই। একেই Social Sanction বা সামাজিক চাপ

বলা হয়েছে। রাষ্ট্র-নীতিবোধ আমাকে কিছু কিছু আত্মত্যাগ করতে শেখায়। নানা ধরনের ট্যাক্স দিয়ে আমি অপরের জন্য কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করি। রামের কলম দেখে শ্যামের সেটিকে নিতে যতই লোভ হোক না কেন, সেই লোভ তাকে সংবরণ করতেই হয়। না করলে রাষ্ট্র-নীতি-বিধানে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে। একে আমরা মানুষের নৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রীয় চাপ বা Polical Sanction বলতে পারি। বেন্থাম এদের Political Sanction আখ্যা দিয়েছেন। অতএব প্রাকৃতিক চাপ, সামাজিক চাপ—এইসব বিভিন্ন চাপের মধ্যে পড়ে আমাদের নৈতিক বৃত্তিগুলি ক্রমেই শাণিত হয়ে ওঠে। অবশ্য এই ধরনের চাপগুলির সঙ্গে আরেকটি খুব শক্তিশালী চাপ এসে যুক্ত হয়েছে ; সেটা হল ধর্মীয় চাপ বা Religious Sanction ; বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে স্বর্গের লোভ দেখানো হয়েছে এবং নরকের ভয় দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আমরা যদি ভালো কাজ করি, তবেই স্বর্গে যাবো, এবং মন্দ কাজ করলে নরকে আমাদের অধোগতি হবে। অতএব আমরা এমন কাজ করব, যার ফলে আমরা স্বর্গে যেতে পারি। সেই ধরনের ভালো কাজ হল ধর্মীয় চাপের ফলশ্রুতি।

এই প্রসঙ্গে আমরা বেন্থামের বহুজন সুখবাদের সমালোচনা করতে পারি। মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ আমাদের শিখিয়েছে যে আমরা স্বভাবতই সুখের অনুসন্ধান করি ; এই হল মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ। এই তত্ত্বের উপরই বেন্থাম তাঁর নীতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখন প্রশ্ন হবে এই যে, আমরা যদি ক্ষণিক সুখের পশ্চাদ্ধাবন করি তাহলে কি সুখ খুঁজে পাব ? একথা যদি সত্যও হয় যে আমরা সবসময় সুখের আকাঙ্ক্ষা করি (অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদে বিশ্বাস করি), তবে একথা কি বলা যায় যে, সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমাদের সব সময় কাজ করা উচিত। সুখের আকাঙ্ক্ষা করা এক কথা আর সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকে কাজ করা উচিত, একথা বলা হ'ল অন্য তত্ত্ব। একটি হল বস্তুগত সত্য, অন্যটি হ'ল আদর্শগত সত্য। বেন্থাম সুখ এবং দুঃখের তুলনা-মূলক পরিমাণের যে ফরমূলা বা গাণিতিক সূত্র দিয়েছেন সেই ফরমূলা মানুষের জটিল জীবনে মোটেই কাজ করে না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখের হিসেব নিকেশ করা এতো সহজ নয়। আমরা নিজের সুখের পরিমাণই নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না। অপরের সুখের পরিমাণ নির্ণয় করাতো প্রায় অসাধ্য হলে মনে হয়। সুখদুঃখের হিসেব Hedonistic Calculas-এর কর্ম নয়। নিজের সুখের পরিমাপ করাই দুরূহ কর্ম, অপরের সুখের পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বেন্থাম এই সব বাধাবিপত্তির কথা জানতেন ;

তিনি External Moral Sanctions বা বহির্জগত নৈতিক চাপের কথা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বেন্থামের আদর্শ অনুসারে যে নৈতিক জীবন আমাদের কাছে গ্রাহ্য তার বনিয়াদ রয়েছে লোভ এবং ভয়ের মধ্যে। এটা নিশ্চয়ই স্বতোৎসারিত। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই নীতিবোধ বাইরে থেকে চাপানো জিনিস নয়।

সুখের গুণগত প্রভেদকে অস্বীকার করে বেন্থাম যুক্তিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে সবাই যে একই ধরনের আনন্দ পাই, তা নয়। এক কাপ চা খাওয়ার আনন্দ এবং 'গীতা পাঠ করার আনন্দ যে এক নয়, সেই সত্যটুকু আমরা বুঝি আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। সুখের মধ্যেও উৎকৃষ্ট সুখ বা নিকৃষ্ট সুখ রয়েছে। এই ধ্রুব সত্যটাকে স্বীকার করেছিলেন দার্শনিক মিল। মিল বলেছিলেন যে, সুখই শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। আমাদের উচ্চতর মূল্য বোধের আলোতে এই সুখের উৎকর্ষের বিচার হওয়া উচিত। অবশ্য মিল যে সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করেছেন, সেই গুণগত প্রভেদের স্বীকৃতি সুখবাদের ভিত্তিভূমি; একথা সমালোচকেরা বলেছেন। উপযোগবাদীদের মধ্যে যারা বহু জন সুখায়, বহুজন হিতায় তত্ত্বের সমর্থক, তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে সুখ ছাড়া সুখ বণ্টনের নীতিকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ যে কাজ শুধু সুখ বিধান করে না, বহুজনের সুখবিধান করে, সেই কাজ ভালো। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সুখের বিধানই কেবল মাত্র কাম্য নয়; সেই সুখ কতজন মানুষের উপভোগ্য হল, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। অতএব, সুখ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত নীতি সম্বন্ধেও আমাদের ওয়াকিবহাল হতে হবে; সেটিরও প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ কোন কাজকে 'নৈতিক' এই আখ্যা দিতে হলে সেই কাজ যে শুধু অপরের সুখবিধান করবে তাই-ই নয়, সেই কাজ যাতে বহুলোকের সুখ বিধান করতে পারে সেটুকুও দেখতে হবে। অতএব, ন্যায়সঙ্গতভাবে 'বহুজন সুখায়, অর্থাৎ বহুলোকের সুখের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমরা শুধু সুখকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করছি না, আমরা সেই সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতা বা Justice-কেও স্বীকার করে নিচ্ছি। অতএব বলা চলে, অবিমিশ্র সুখবাদ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নৈতিক তত্ত্ব বলে বিবেচিত হতে পারে না।

মিলের উপযোগবাদ (Mill's Utilitarianism or Refined Universalistic Hedonism)

মিলের উপযোগবাদকে প্রচলিত বহুজন সুখবাদ বলা হয়েছে। বেন্থাম

সুখের গুণগত প্রভেদকে অস্বীকার ক'রে সুখবাদের মধ্যে যে স্থূলতাকে এনে দিয়েছিলেন মিল তার নিরসন করলেন। James Mill গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করলেন। মিল সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার ক'রে একে গুণী-জন গ্রাহ্য করে তুললেন। মিলের আদর্শকে আমরা 'সুখের সন্ধান', না বলে 'আনন্দের সন্ধান', বলতে পারি। মিলের মতে 'Aiming at Pleasure' বড় কথা নয়, 'Aiming at Happiness'-ই হল আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, উপরে যে জেমস্ মিলের কথা বলেছি, সেই জেমস্ মিলের পুত্র John Stuart Mill উপযোগবাদের অন্যতম প্রখ্যাত প্রবক্তা। আমরা এই জন ষ্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদকে বিশ্লেষণ করে তাকে পাঁচটি মুখ্য সূত্রে নিবদ্ধ করতে পারি :—

(ক) মানুষের পক্ষে সুখই একমাত্র কাম্য।

(খ) মানুষের কাছে যা আকাঙ্ক্ষিত তা-ই বাঞ্ছনীয় ; অর্থাৎ আমরা যা কিছু চাই তাকেই আকাঙ্ক্ষা বা বাঞ্ছার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করি।

(গ) প্রত্যেক মানুষের সুখই যদি তার কাছে মঙ্গলের হয় তবে সর্বসাধারণের সুখই সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে।

(ঘ) মানুষ আপন সুখ ছাড়া যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করে তা সে সুখ প্রাপ্তির উপায় হিসেবেই করে। অর্থাৎ উপায় যাই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে সুখই উপেয় বা লক্ষ্য।

(ঙ) সব সুখের মূল্য সমান নয়। যিনি দুটি ভিন্নধর্মী সুখের আস্বাদ করেছেন, তাকেই কোন্ সুখটা শ্রেষ্ঠ সেই বিচারের ভার দিতে হবে।

আমরা প্রথমেই বলে রাখি, মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের ভিতের উপরেই মিলের উপযোগবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিল বললেন, 'Pleasure and freedom from pain are the only things desirable as ends'; মানুষের স্বভাবই হল সুখের অনুসন্ধান করা। কিন্তু একথা কি সত্য? আমরা কি শুধু সুখকেই চাই? না, সুখ আমাদের ইচ্ছা পূর্তির অনুষঙ্গ হিসেবে মনের মধ্যে এসে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, বহুক্ষেত্রে আমরা অপরের সুখকেও চাই। এই যে অপরের সুখকে চাওয়া, এটা সকলের পক্ষে সত্য না হলেও কারো কারো পক্ষে নিশ্চয়ই সত্য এবং সেই সত্যটুকু মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের ভিত্তিভূমিতে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। এছাড়া একথাও স্বীকার্য যে, সুখের সন্ধান করলে সুখ আলেয়ার মত মিলিয়ে যায়। অতএব সুখলাভ নৈতিক কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে না। তৃতীয়ত, যে কাজ আকাঙ্ক্ষিত তাই-ই ভালো, একথা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। আমরা যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করি তাকেই কি আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য

বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? যা দেখি তাকে যদি দর্শনীয় না বলা যায়, তবে যা আকাঙ্ক্ষা করি, তাকেই কী কাঙ্ক্ষনীয় বলা চলে?) G. E. Moore তাঁর Principia Ethica গ্রন্থে এই ধরনের ভ্রান্তিকে Naturalistic Fallacy আখ্যা দিয়েছেন। আমরা যা চাই তাই-ই আমাদের চাওয়া উচিত একথা বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ করা হবে।] মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কবি-কথায় যে সত্যের অবতারণা করলেন, তা মিলের দর্শন মতেরখণ্ডন করেছে, আবার মিলের মতের সমর্থনও করেছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন :

'বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।'

কবি তাঁর জীবন-দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করে বললেন যে, আমার উপর তোমার অসম্ভব কৃপা ; আমি যা চেয়েছি, তা আমি পাইনি। অর্থাৎ কবি বোঝাতে চাইলেন যে, আমি যা চেয়েছি সর্বক্ষেত্রে তা কাঙ্ক্ষনীয় নয়। অতএব প্রকারান্তরে কবি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক মিলকে সমর্থন করলেন। চতুর্থতঃ, সার্বিক সুখ অর্থাৎ সকলের সুখ আমাদের সকলের কাম্য হওয়া উচিত। এই মতবাদটি সুষ্ঠু তার্কিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমার সুখ আমার কাছে কাম্য ; এই সত্যটি সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাহলে সমস্ত মানুষের যোগফল এবং সমস্ত মানুষের সুখের যোগফল, এই দুটি নিয়ে কি আমরা বলতে পারি যে, সমস্ত মানুষের সুখই হল, সমস্ত মানুষের কাম্য। যদি এমন কথা বলা যায় যে প্রত্যেক মানুষের সুখই তার নিজের কাছে শুভ বা কল্যাণকর ; অতএব সর্বমানবের সুখ হল সামগ্রিক কল্যাণ বা সর্ব মানবের কল্যাণ। এই যুক্তি ভ্রান্ত যুক্তি। এর মধ্যে এক ধরনের অনুপপত্তি অনুস্যূত হয়ে গেছে। তাকে তর্কশাস্ত্রে বলা হয়েছে Fallacy of Composition ; ম্যাকেঞ্জি মিলের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :)এতদ্ব্যতীত দার্শনিক মিল এই প্রসঙ্গে একথা ভুলে গেছেন যে মানুষের সুখের যেমন যোগফল করা যায় না, তেমনই ব্যক্তি মানুষগুলিকে এক করে তাদের সমষ্টিবদ্ধও করা চলে না। সমষ্টিগত হিত বা কল্যাণ বলে বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নেই। কোন একটা কাজ, কোন একটি বিশেষ মানুষের পক্ষে হিতকর বা কল্যাণকর হতে পারে। সুতরাং 'সকলের সুখ', এই ধারণাটি বিভ্রান্তিকর।] মিল এই সার্বিক সুখের ধারণার পরিবর্তন ক'রে সমস্ত সমস্যাটির আলোচনাটিকে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছেন।) (মিল এর মধ্যে একটা বড় রকমের ভ্রান্তি ঘটালেন ; সেটি হল বেন্থামের মতই তিনি ধরে নিলেন যে সুখের পরিমাপ করা চলে। Hedonis-

tic Calculus বা সুখের আঙ্কিক হিসেব নির্ভুলভাবে করা যায় ব'লে তিনি বিশ্বাস করেছেন। মিলের মতে যাঁরা সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করেছেন, তাঁদের পক্ষে এই Hedonistic Calculus-এ বিশ্বাস করা অসমীচীন। বেন্থাম সুখের পরিমাণগত প্রভেদকে স্বীকার করে Hedonsitic Calculus বা সুখের গাণিতিক হিসেব রক্ষার একটা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেন নি। মিলের পক্ষে তা করা আরও অসম্ভব হবে কারণ, তিনি সুখের মধ্যে গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করেছেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, বেন্থাম বলেছেন, প্রকৃতির শাসন, রাষ্ট্রের শাসন, এবং ধর্মের অনুশাসন এরা মানুষকে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আত্মসংযম ও পরোপকারী হতে বাধ্য করে। এই বাহ্য নৈতিক চাপের কথা মিলও স্বীকার করেছেন। মিল বললেন যে মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ থাকার ফলে মানুষ পশুর মত আচরণ করে না। তাছাড়া, মিলের মতে মানুষ মানুষের প্রতি একটা সহজ মমত্ববোধ অনুভব করে। এর ফলেই সে আত্মসুখের কথা ভুলে গিয়ে বহুক্ষেত্রেই পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়। মিল বললেন যে, কর্তব্যকে অবহেলা করলে মানুষ আপনার অন্তরে গ্লানির দংশন অনুভব করে।

এই প্রসঙ্গে দার্শনিক মিল সুখতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমের কথা বললেন ; সুখই মানুষের একমাত্র কাম্য নয়। আমরা বহু সময়ই অপরের প্রতি মমত্ববোধ থেকে, কর্তব্য বোধ থেকে এবং আত্মসম্ভ্রম বোধ থেকে এমন সব কাজ করে থাকি যেগুলি ঠিক আমাদের ব্যক্তিগত সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত হয় না। এই ধরনের কর্তব্য বোধ, আত্মসম্মান-জ্ঞান, এগুলি সবই মানুষের বিচার বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত হয়। সুতরাং সুখই যে আমাদের একমাত্র কর্মের প্রেরণা, তা বললে ভুল বলা হবে। যুক্তির, বুদ্ধির দাবীতে আমরা অনেক সময়ই সুখের আশা না করে অনেক কাজ করে থাকি। মিল, একথা ব'লে স্থূল প্রেয়োবাদে এই ধরনের পরিবর্তন সাধন করলেন।

পঞ্চমত, আমরা মিলের চিন্তাধারাকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ ক'রে বলতে পারি যে, মিল আপনার সুখের ভিত্তির উপরেই বহুজনসুখবাদের ইমারতকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে এই ধরনের নিজের সুখ চাওয়াকে যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা পরিমার্জিত করে আমরা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বহুজনের সুখকে কামনা করতে পারি। একে মিল বলেছেন, 'Intelligent-Self-Interest'। আমরা সমাজবদ্ধ জীব, সমাজেরই অঙ্গ ; অতএব সমাজের কল্যাণ সাধন করলেই আমাদের নিজেদেরও কল্যাণ সাধন করা হবে। তাই অপরের সুখকে প্রাধান্য দিলে নিজের সুখেরও ব্যবস্থা করা যায়। লোক-কথায় বলা

হয়েছে যে, অনুদারচেতা মানুষের চোখেই আপন এবং পরের ভেদটুকু স্বীকৃত হয়েছে ; উদারচরিত ব্যক্তির পক্ষে সারা পৃথিবীই কুটুম্ব স্বরূপ। আমরা মিলের মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় লোককথার 'অয়ং নিজ পরোবেত্তি' তত্ত্বটিকে উদ্ধার করে বলতে পারি যে, মিলও অনুরূপ কথা বলেছেন। পৃথিবীকে আপন বলে ভাবতে পারলেই অন্যের সুখে সুখী হওয়া যায়। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী যিনি অপরের সুখে সুখী হন : এ কথা বলা যেতে পারে যে, আমরা যদি সাধারণের সুখবিধানের জন্য যত্নবান হই তবে আমরা আপন আপন সুখবিধানও সহজেই করতে পারব ; অপরের সুখবিধানের মাধ্যমে আত্মসুখবিধান সহজ হয়। তাই দূরদর্শী আত্মসুখবাদীরা এই যুক্তিটাকে গ্রহণ ক'রে নিয়ে সর্বসাধারণের সুখ বিধানের জন্য যত্নবান হয়। ['It may be argued that a man, devoting himself to the pursuit of general happiness for himself, and far sighted egoists convinced by this argument, would set themselves to seek the happiness of others']* সুতরাং আমরা সত্যের অপলাপ না করেই বলতে পারি যে, পরসুখবাদ বা Altruistic Hedonism হ'ল এক ধরনের কল্পনাবিলাস এবং তথাকথিত উপযোগ হ'ল আত্মসুখবাদের এক ধরনের পরিমার্জিত রূপ।)

মিলের মতের সমালোচনা

আমরা মিলের প্রেয়োবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, তিনি সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করে প্রেয়োবাদের মধ্যে একটা নতুন ধারণার সংযোজন করেছেন। মানুষের সুখের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর সুখবোধের যে একটা পার্থক্য আছে সে কথা অনস্বীকার্য। তাছাড়া বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধরনের সুখের অভিজ্ঞতার মধ্যেও গুণগত বৈষম্য থাকে। তবে সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে যে, মিল মানুষের সুখবোধকে সর্বোচ্চ মূল্য দান ক'রে মানুষের বিচারবুদ্ধির উপরেই বেশী আস্থা স্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় দর্শনের মত আপ্ত বাক্যকে মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর মতে 'অভিজ্ঞ-বিদগ্ধ জনের মত' সর্বদাই গ্রাহ্য। অতএব এক্ষেত্রে বলা চলে যে, মিল প্রকৃতপক্ষে সুখবাদকে পরিত্যাগ ক'রে আরেক ধরনের নৈতিক মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ডে আস্থা স্থাপন করেছেন। মিল বলেছেন যে, নির্বোধ মানুষ একান্ত একদেশদর্শী হয়ে যখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সুখের উপর আস্থা

* Lillie : An Introduction to Ethics, পৃ: ১৭১

স্থাপন করে তখন তার বিচার কখনই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না। মর্যাদা, যুক্তি এবং রুচিবোধের অভাবই তার বিচারকে বিভ্রান্ত করে। এই প্রসঙ্গে মিলের মত খুবই প্রশংসনীয় হলেও একথা বলতে হবে যে এই অভিমতের দ্বারা মিল আত্মসুখবাদের মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করেছেন। মানুষের রুচি, মানুষের বিচার, মর্যাদাবোধ, এই সবের কাছে মানুষের সুখের আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব করা হয়েছে। মিল স্বীকার করলেন, যে সুখ বিচার বুদ্ধির দরবারে গ্রহণযোগ্য সেই সুখই যথার্থভাবে গ্রাহ্য। অথচ গুণগত বিচারে যে সুখ উচ্চতর সেই সুখকর অবস্থাকে মিল গ্রহণ করেছেন। দার্শনিক Rashdall (র‍্যাসডাল) মিলের এই অসঙ্গতিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মিলের উপযোগবাদকে স্বীকার করলে প্রকৃতপক্ষে সুখবাদকে অস্বীকার করা হয়। দার্শনিক গ্রীণ মিলের মতের অনুপন্থী হয়েছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মিল প্রকৃতপক্ষে প্রেয়োবাদকে বর্জন করেছেন। মিলের এই অসঙ্গতিটির দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যুক্তিবাদী দার্শনিক Seth যথার্থই বলেছেন: 'সুখের গুণাগুণ বিচার করা সুখবাদীর কাজ নয়। এটা তার এক্তিয়ার বহির্ভূত। সুখবাদীরা কেবলমাত্র সুখের পরিমাণ বা তীব্রতার কথাই বলতে পারে। ['Quality is an extra Hedonistic, creed. The only Hedonistic criterion is the quantity i.e., the intensity of Pleasure'.]* অতএব মিল সুখবাদের প্রাধান্যকে খর্ব করে যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না।

ষষ্ঠত, আপ্তবাক্য বা জ্ঞানীজনের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে মিল প্রকৃতপক্ষে বিবেকের বাণীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

বস্তুত আমরা যদি সুখবাদকেই গ্রহণ করি তাহলে পরসুখবাদকে গ্রহণ করা যায় না। যুক্তিবাদী মার্টিন্যু যথার্থই বলেছেন, আত্মসুখবাদ থেকে পরসুখবাদে যাবার কোন পথ নেই। আমরা যখন সুখের সন্ধান করি তখন সবসময়ই আত্মসুখেরই সন্ধান করি। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের এই তত্ত্বকে গ্রহণ করলে পরসুখবাদের মূলোচ্ছেদ করা হয়। অতএব মিল এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে ভ্রান্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন।

সপ্তমত, অপরের কল্যাণের ইচ্ছাকে কখনই আত্মসুখলাভের ইচ্ছার সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে যুক্ত করে দেওয়া যায় না। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যেমন আত্মসুখের জন্য বাসনা আছে, তেমনি পরের মঙ্গল সাধনের এষণাও

* Ethical Principles পৃ: ১২৫

রয়েছে। আমাদের মধ্যে শুধু আত্মসুখ অন্বেষণ প্রবৃত্তি নেই। পরসুখ সাধনের ইচ্ছাও আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে। ওরা প্রতিবেশী, পাশাপাশি বাস করে। অতএব মিল যখন বললেন যে, আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষা থেকেই পর-সুখের আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয় তখন তিনি মনস্তাত্ত্বিক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করলেন।

অষ্টমত, মিলের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা চলে যে, আমরা যে নৈতিক দায়িত্ব বোধ বা কর্তব্যবোধের দ্বারা সময়ে সময়ে চালিত হয়ে থাকি, তার ব্যাখ্যা তাঁর উপযোগবাদে মেলে না। শাস্তির ভয় কখনই আমাদের কর্তব্য বোধের মধ্যে যে ঔচিত্যবোধ রয়েছে, তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। মনে মনে মানুষ যে নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা Moral Obligation বোধ করে, তার ব্যাখ্যা বোধহয় শাস্তির ভীতি বা এই ধরনের কোন তত্ত্বের দ্বারা করা সম্ভব নয়। কর্তব্যের আহ্বানে আমরা যে কাজ করি তা হল বিবেকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এবং বিবেকের কর্তৃত্বকে স্বীকার ক'রে; এই মত ব্যক্ত ক'রে মিল প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবাদকেই গ্রহণ করেছেন; সুখবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে।

নবমত, সুখবাদের প্রসঙ্গে Hedonistic Calculas বা সুখের গাণিতিক পরিমাপ পদ্ধতির যে কথা বলা হয়েছে, মিলের মতে তা নির্ভরশীল নয়। কেন না, বহুজনের হিত সাধন করতে হলে আত্মসুখের বদলে অপরের সুখের বিচার করতে হয়। আমি আমার সুখের কথাই জানি। অপরের সুখের কথা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি সুখের গুণগত প্রভেদের কথা স্বীকার ক'রে সুখবাদ, Hedonistic Calculas ও উপযোগবাদের ভিত্তি মিল একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। সমালোচনার উপসংহারে একথা অবশ্যই উল্লেখ-যোগ্য যে, বহু ত্রুটি সত্ত্বেও মিলের উপযোগবাদ ইংলণ্ডের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি সংস্কারের আন্দোলনকে বেগবান করেছে। মিলের উপযোগবাদ থেকে সামাজিক সুবিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে বহুজনের সুখ ও বহুজনের হিতের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। অতএব, মিলের সমালোচকেরা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক আন্দোলনে মিলের অবদানকে অস্বীকার করতে পারেন না। মিলের উপযোগবাদকে আমরা যদি অবিমিশ্র প্রশংসা বা অবিমিশ্র নিন্দা না করে যুক্তি দিয়ে তার বিচার করি তবে বোধহয় ঠিক কাজ করা হবে।

সিজ্‌উইকের উপযোগবাদ (Sidgwick's Utilitarianism)

সিজ্‌উইক মিলের উপযোগবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই বললেন যে, আমরা আপন বিচার বুদ্ধির দ্বারা অন্তরের মধ্যে বুঝতে পারি যে কোন কাজ ন্যায় এবং কোন কাজ অন্যায়। এই জ্ঞান

তাৎক্ষণিক। এই ভাবে আমাদের অন্তর যখন কোন একটি কর্মপন্থাকে গ্রহণ-যোগ্য বলে নির্দেশ করে তখন সেই নির্দেশ অত্যন্ত সহজবোধ্য ; এই নির্দেশ বহু মানুষের সুখ সাধন বা হিতসাধনের জন্য। এই ভালোমন্দ সম্বন্ধে তাৎক্ষণিক জ্ঞান, এই জ্ঞানের ধারণাই হল সিজ্‌উইকের উপযোগবাদের বৈশিষ্ট্য। যে কোন কাজের গ্রহণ-যোগ্যতা সম্পর্কে যখন আমাদের সন্দেহ থাকে তখন আমরা জানি যে সেই কাজ বহুজনের সুখসাধন বা হিতসাধন করবে কিনা সেই সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কাজের ন্যায্যতা এবং অন্যায্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ যখন থাকে তখনই সেই কাজের দ্বারা বহুজনের হিতসাধন হবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়। অতএব বহুজনের হিতসাধনের বিচারটি সেই কার্য সম্বন্ধে ন্যায় বিচারের নামান্তর। অর্থাৎ সেটি ন্যায় হলে এই ধরনের বহুজনের হিত সাধিত হবে। সুতরাং সিজ্‌উইক বললেন যে, মিল যে সচেতন যুক্তি এবং বিচারের কথা বলেছেন, সেই ধরনের সচেতন যুক্তি ও বিচারের স্থান উপযোগবাদের মধ্যে নেই। তিনি মানুষের নীতিবোধের ক্রমবিকাশের কথা বলেছেন। আমাদের নীতিবোধের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অপরের সুখকে কাম্য বলে গ্রহণ করি। বহু-জনের সুখ সাধনের অভিমুখে আমাদের নৈতিক চেতনা প্রধাবিত বলেই সিজ্‌উইক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন যে, আপন আপন সুখের অনুসন্ধান করাই হল মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি। অবশ্য সেই প্রবৃত্তির সঙ্গে তার অন্তরে দয়া-দাক্ষিণ্য-করুণা এই সব বৃত্তিও থাকে। আত্মসুখের ধারণা থেকে পরসুখের ধারণায় উপণীত হওয়া মানুষের সহজ অনুভূতির কাজ নয়। তাহ'ল তার বিচারবুদ্ধির কাজ। আত্মসুখ এবং পরসুখের মধ্যে যে দ্বৈতবাদ রয়েছে তাকে সিজ্‌উইক 'dualism of Practical Reason' আখ্যা দিয়েছেন। এই Dualism বা দ্বৈতবাদের সমর্থন করতে গিয়ে তিনি দুটি বিচার বিবেচনার কথা বলেছেন। একটি হল মনস্তাত্ত্বিক বিধান, অন্যটি দার্শনিক বিচার। প্রথমটির কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, পরের হিতসাধনের ভিতর দিয়েই আমাদের নিজেদের সুখ আমরা পেতে পারি। অপরের সেবা করে আমরা যে তৃপ্তি পাই, তা অস্বীকার করা যায় না। উপকার করলে আমরা আনন্দ পাই, আমাদের সুখ লাভ ঘটে। অবশ্য আমাদের অভিজ্ঞতায় এই সত্যটা প্রকট হয়ে ওঠে যে যারা যত সাধু, নৈতিক কাজকর্মে যতবেশী বিশ্বাসী, তাদের কপালে দুঃখ বিপদ এসে ততো বেশী করে জোটে। অবশ্য কর্মফল ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করলে, এই জন্মে সাধু হয়ে দুঃখ লাভের তত্ত্বটিকে ভাল করে ব্যাখ্যা করা যায়। যারা দুষ্টু হয়েও এই জগতে বিত্ত-

সম্পত্তি ও সুখের অধিকারী হয়েছে তারা পরজন্মে নিশ্চয়ই দুঃখ-যন্ত্রণা পাবে। সিজ্‌উইক বললেন যে, মানুষের অন্তরের প্রেরণাই হল পরসুখবাদের ভিত্তি। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আমরা যে পন্থায় সুখের কামনা করি তা আত্মসুখ কামনা এবং তা পরসুখ কামনা থেকে পৃথক নয়। এই সমস্যা সমাধানের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিলি (Lillie) বললেন: 'সত্যিকারের সমাধান হ'ল আত্মসুখবাদের সম্পূর্ণ বর্জন ; সাধারণ ভাবে আমরা যে সব নৈতিক আদর্শকে স্বীকার করি তারা সকলেই এই আত্মসুখবাদের পরিপন্থী। অতএব পরসুখবাদকে যদি কোনভাবে গ্রহণ করতে হয়, তবে তা কখনই সিজ্‌উইক কথিত আত্মসুখবাদের রূপভেদ হিসেবে নয়। পরসুখ-বাদকে অন্য কোন যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে হ'বে। ['The real solution appears to be the complete rejection of egoistic Hedonism as wholly inconsistent with our common sense intuitions so that if utilitarianism in some form or other is to be accepted, it must be on some other ground than that of Sidgwick's premise of egoistic hedonism.]*

* Lillie প্রণীত An Introduction to Ethics. পৃ: ১৭৯

অষ্টম অধ্যায়

ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ (Evolutionary Hedonism)

ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদের ব্যাখ্যা—হার্বার্ট স্পেন্সারের ব্যাখ্যা ও তাঁর মতের সমালোচনা—লেজলি ষ্টিফেনের ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদের ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা—আলেকজাণ্ডারের ব্যাখ্যা ও তাঁর মতের আলোচনা—প্রেয়োবাদের মূল্যবিচার।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ বা Evolutionary Hedonism.

ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ (Evolutionary Hedonism) বলতে আমরা বুঝি Herbert Spencer, Leslie Stephen এবং Alexander-এর প্রেয়োবাদকে। হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ The Data of Ethics-এ বিবর্তনবাদকে নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। এই ব্যাপারে তিনিই পথিকৃৎ। ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ ইউরোপের ধ্যানধারণায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই প্রভাব হার্বার্ট স্পেনসারের নীতিদর্শনেও আমরা লক্ষ্য করেছি। হার্বার্ট স্পেন-সার নৈতিক আদর্শ নির্ধারণের ব্যাপারে এই ক্রমবিকাশ তত্ত্বকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করলেন। নৈতিক আদর্শ স্থাবর নয়, জঙ্গম, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। নৈতিক আদর্শের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সেই নিত্যপরিবর্তনশীল জীবনধারার মতই আমাদের নৈতিক আদর্শও পরিবর্তন-সাপেক্ষ। মানুষের পূর্ব পুরুষের অভিজ্ঞতায় যে কাজ ব্যক্তি-জীবন এবং গোষ্ঠী-জীবনের অনুকূল বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, প্রাচীন সমাজ সেই কাজগুলিকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিল। যেসব কাজ-কর্মের দ্বারা সমাজ জীবনের হানি ঘটেছিল সেই কাজগুলি নিন্দিত হয়েছিল প্রাচীন সমাজে। এই সামাজিক শুভ এবং অশুভ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নীতিবোধ বা নীতি বিচারের ভিত্তি নির্ধারিত হয়েছিল। যেসব কাজের ফল শুভ হয়েছিল, মানুষ তাদের আচার আচরণে তার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল এবং ক্রমে যে কাজগুলিকে ভালো বলে তারা প্রথম গ্রহণ করেছিল সেই কাজ-গুলি পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে তাদের সকলের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। একসময় যেগুলি আমরা আদর্শ ব্যবহার বলে গণ্য করতাম, নিয়ত চেষ্টা এবং আচরণের ফলে সেগুলি বংশপরম্পরায় আমাদের অভ্যাসে পরিণত হল। এই অভ্যাসজাত কাজকর্মের জন্য কোন সজ্ঞান প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। তাই বলা চলে যে এগুলি অচেতন অভ্যাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, অতীতে আমাদের যে আদর্শ ছিল, কালক্রমে তা আমাদের কর্মে সত্য হয়ে উঠল। অবশ্য অতীতের আদর্শকে বর্তমানে যখন আমরা কথায় এবং কাজে সত্য করে তুলি তখন আবার বর্তমানের জন্য নতুন নতুন নৈতিক আদর্শের সৃষ্টি হয়। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আবার মানুষের সাধনা

চলে। সুতরাং সমাজ জীবনে প্রাচীন আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটেছে। হার্বার্ট স্পেনসার বললেন যে, মানুষের নৈতিক চেতনার মধ্যে রহস্যময় বলে কিছু নেই। ভগবান অজ্ঞাত এবং দুর্জ্ঞেয় হলেও মানুষের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে এই দুর্জ্ঞেয় ভগবানের কোন ঐকান্তিক সম্বন্ধ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। যে কাজ আমাদের প্রয়োজন সাধন করে, আমাদের সাংসারিক জীবন ধারণের পক্ষে সহায় হয়, সমাজের সকলের পক্ষে সুখকর হয়, এবং আনন্দদায়ক হয়, তা হল নৈতিক আচরণ। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেনসার নৈতিক আদর্শের পরিবর্তনশীলতার ওপর জোর দিলেন। তিনি মানুষের নীতি, বুদ্ধি এবং আদর্শের ক্রমবিকাশকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। নৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কোন রহস্যের আশ্রয় নেন নি। অপ্রমাণিত কোন সত্তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে তার দ্বারা মানুষের নীতিবুদ্ধিকে ব্যাখ্যাত করার চেষ্টা করেন নি। তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় আমাদের বললেন, মানুষের সাধারণ ব্যবহারের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হল আমাদের নৈতিক ব্যবহার; নীতিবোধ মানুষের অন্যান্য বোধের মতই একান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই নীতিবোধেরও একটা ক্রম পরিণতি আছে। এই ক্রম পরিণতিকে তিনি ক্রমবিকাশবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। নীতিবিদ্যাকে তিনি একটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রূপে গণ্য করেছেন। হার্বার্ট স্পেনসার এই ক্রমবিকাশ ভিত্তিক সুখবাদকে 'A natural Science of Morals' বলেছেন। হার্বার্ট স্পেনসার, মিল ও বেন্থামের মত Inductive Method বা আরোহ প্রণালী প্রয়োগ ক'রে নৈতিক বিধিগুলিকে নির্দেশ করার চেষ্টা করেন নি। আবার দার্শনিক হেগেলও গ্রীণকে অনুসরণ করে তিনি কতকগুলি উদ্দেশ্য বা আদর্শের দ্বারা এই নৈতিক বিধানগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন নি। জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা থেকে তিনি নৈতিক বিধিগুলি চয়ন করতে চেয়েছিলেন অবরোহ প্রণালী প্রয়োগ করে। তাঁর তত্ত্বের নাম দেওয়া হল Evolutionary Hedonism; তিনি বললেন যে, অবরোহ প্রণালী প্রয়োগ ক'রে জীবনের নীতি থেকে আমাদের নীতিগতভাবে নির্ধারন করতে হবে কোন্ কাজ স্বভাবতই দুঃখদায়ক এবং কোন্ কাজ স্বভাবতই সুখপ্রদ। সুখের অন্বেষণই যদি নৈতিক আদর্শ হয় তাহলে যে কাজ স্বভাবতই সুখপ্রদ তার আচরণই হবে নীতিগতভাবে আমাদের লক্ষ্য। ব্যবহারিক জীবনে কোন কাজ কতটা দুঃখ দেয় এবং কোন্ কাজ কতটা সুখ দেয় তা হিসেবনিকেশ ক'রে নৈতিক আদর্শের নির্ণয় হবে না। এইভাবে জীবনের নীতি থেকে বিভিন্ন ধরনের কাজের সুখদায়ক এবং দুঃখ-দায়ক চরিত্রটক্ নির্ধারণ ক'রে তবেই আমরা আমাদের নৈতিক আদর্শকে

নির্দিষ্ট করতে পারবো। হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর The Data of Ethics গ্রন্থে বললেন যে, জীবনের নীতি হল বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে অন্তরের সম্বন্ধটুকুকে সতত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা। 'The continuous adjustment of internal relations to external relations'; কোন কাজেই অবিমিশ্র সুখ পাওয়া যায় না, আবার কোন কাজই অবিমিশ্র দুঃখের আকর নয়। সুতরাং যে কর্মের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশী সুখ পাওয়া যায় সেই কর্মই শুভ কর্ম। যা বেশী মাত্রায় দুঃখ দেয়, তা অশুভ বা অকল্যাণকর। স্পেনসার সুখের ও দুঃখের মাপকাঠিতে আমাদের ভালোমন্দের আদর্শকে নির্দিষ্ট করে দিলেন। তাঁর নৈতিক আদর্শ পরিপূর্ণরূপে প্রেয়োবাদী আদর্শ। তিনি বললেন, প্রাণী জগতের ছেদহীন অস্তিত্বের মূলে রয়েছে সুখকর কর্মের প্রতি তার আকর্ষণ। এই সুখ, এই কল্যাণ সম্ভব হবে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। ক্রম-বিকাশের অর্থ হল, বাহ্য ও অন্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এই সমন্বয় সাধনই হল কর্ম ক্রমবিকাশবাদের মূল সূত্র। অন্তরের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আচরণের ফলা-ফলের যখন সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তখন আমরা সুখ বোধ করি এবং সেই সুখকর কাজই শুভ ও কল্যাণকর বলে গৃহীত হয়। উচ্চতর আদর্শের অর্থ হল, অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান। জীবন দীর্ঘতর হয়, তার বিস্তারও ঘটে তখনই যখন আমরা অন্তরের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাইরের আচরণের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি। এই সামঞ্জস্য বিধানের পথে মানুষ বা প্রাণীরা তাদের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে। সেই চরম উদ্দেশ্য হল সুখ লাভ: 'The ultimate aim of life is happiness'। ক্রমবিকাশ মূলক প্রেয়োবাদ আমাদের কাছে প্রমাণ করেছে যে, আত্মসুখবাদের আদর্শ উপযোগবাদের আদর্শের চেয়ে হীন। কেননা, যে আচরণ একেবারে স্বার্থান্ধ, তা বাহ্য ও অন্তরের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। আবার বিশুদ্ধ পরার্থপরতা ও আত্মসুখ বিসর্জনের নীতিও জীবন ধর্মের পরিপন্থী। অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরার্থ-পরতার দ্বারা মানুষ বা প্রাণী জগতের কেউই তাদের পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আত্মসুখ বা পরসুখবাদের সমন্বয়ের পথে আমাদের পরিপূর্ণ সুখের আদর্শ একদিন সত্য হয়ে উঠবে আমাদের জীবনে। ক্রমবিকাশবাদের প্রথম পর্বে আমরা দেখি যে মানুষের নৈতিক জীবনে বাইরের শাসনের প্রয়োজন আছে। বাহ্য ও অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব এই স্তরে অনুভূত হয়। তাই এই অবস্থায় কর্তব্যকে কঠোর এবং শুষ্ক বলে মনে হয়। সমাজের উচ্চতম বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষকে তার কর্তব্য পালনে আর বাধ্য করা হবে না। কর্তব্য পালনে মানুষের আপন বোধটা বড় হয়ে ওঠে না: কর্তব্যবোধ

ও নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধ ক্ষণস্থায়ী ; মানুষকে নৈতিক ক'রে তোলার জন্য চেষ্টা করলে কর্তব্যবোধ ও নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধ এরা উভয়েই ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে। অবশ্য নৈতিক হ'য়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করলে হয়ত তার মধ্যে একটা বহিরাগত জোর খাটানোর ব্যাপার থাকে। অবশ্য কালক্রমে এই জোর খাটানোটা উহ্য হ'য়ে ওঠে এবং নৈতিক কাজটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। ('The sense of duty and Moral obligation is transitory and will diminish as far as moralisation increases while at first motive, contains an element of coercion, at last the element of coercion dies out and the act is performed without any consciousness of being obliged to perform it.') Herbert Spencer—The Data of Ethics.] অর্থাৎ স্পেনসার বললেন যে নৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবন যাপনের জন্য সব রকমের বাইরের চাপ বা প্রভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে। ব্যক্তি মানুষের আচরণ তখন নিয়ন্ত্রিত হয় দূরাশ্রিত আদর্শ এবং সুখ প্রাপ্তির লক্ষ্যের দ্বারা। বৃহত্তর সমাজ জীবনে, সমাজের কাজেকর্মে তৎকালীন সমাজ জীবনের উপযোগী আদর্শগুলি গৃহীত হয়। স্পেনসারের মতে মানুষের নৈতিক আচরণে তিনটি উদ্দেশ্য আছে :—

১। আয়ু বৃদ্ধি বা Prolongation of Life

২। জীবনের পরিধির বিস্তার বা Fullness of Life এবং

৩। সুখলাভ বা Attainment of pleasure

অবশ্য স্পেনসার বললেন, তিনটি উদ্দেশ্য মূলতঃ একই। এই মূল উদ্দেশ্য সাধনে যে আদর্শ যতখানি সফল হয়েছে সেই আদর্শ ততো বড় বলে বিবেচিত হয়েছে।

হার্বার্ট স্পেনসারের মতের সমালোচনা

মানুষের নীতিবোধকে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দিয়ে হার্বার্ট স্পেনসার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনি নীতিবোধকে মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। নৈতিক আদর্শেরও একটি ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে না বুঝে নৈতিক আদর্শের বিচার সম্ভব নয়। আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করাই আমাদের মৌলিক ধর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে। সঙ্গতির দ্বারাই আমরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে চেয়েছি।

আমাদের সুমিতি বোধ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুসঙ্গতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মানুষ মানুষের সঙ্গে অধিকতর সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। আমাদের নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য হল, মানুষে মানুষে এই সুসমঞ্জস বা সুসঙ্গত সম্বন্ধ স্থাপন করা। পশু জগতে এই সঙ্গতির যে অর্থ মনুষ্য জগতে সেই অর্থ ভিন্নধর্মী হয়ে উঠেছে। পশু জগতে এই সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা হল অবচেতন মনের চেষ্টা। ভিতরকে বাইরের সঙ্গে খাপ-খাওয়াবার প্রচেষ্টা করতেই পশুদের সব প্রয়াসের অবসান হয়। একে পশুদের জীবন-ধর্ম বলা হয়। অবশ্য বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার ফলেই আমরা নীতিবান হয়ে উঠি না। আমরা আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যখন আমাদের আচরণের সঙ্গতি রক্ষা করি তখনই আমরা নীতিবান হয়ে উঠি। পশু জগতে এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য নেই। আদর্শ ও উদ্দেশ্য নেই বলেই সেক্ষেত্রে নীতি প্রয়োগের প্রশ্নটা অবান্তর। মানুষ সঙ্গতি খুঁজে পায়, তার কারণ সে আদর্শ ও নীতির দ্বারা পরিশীলিত হয়ে জীবনে নীতিকে অনুসরণ করে; নীতি জীবনকে অণুসর করে না। তাই Herbert Spencer যখন নীতিকে জীবনের উপরে স্থান দিলেন তখন তার সমালোচনা প্রসঙ্গে ম্যাকেঞ্জি বললেন, 'A little reflection seems to show that Spencer's Theory involves a kind of Hysteron Proteron or putting the cart before the horse'; যদি আমরা সঙ্গতির একটা আদর্শ মনে মনে স্থির না করে নিই এবং সেই লক্ষ্যে পেঁাছাবার চেষ্টা না করি, তাহলে adjustment বা সঙ্গতি সাধনের কোন অর্থই হয় না। লক্ষ্যের প্রতি চোখ রেখে অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে আমরা আমাদের নৈতিক আচার আচরণ যথার্থভাবে করতে পারি। এই ঘোড়ার আগে গাড়ী জুতে দেওয়ার যে সমালোচনা ম্যাকেঞ্জি করলেন, তার বিরূপ সমালোচনা করেছেন দার্শনিক Lillie; তিনি বললেন, স্পেনসারের মতে (১) আয়ু বৃদ্ধি (Prolongation of life) (২) জীবনের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি (Increased Wealth of life) (৩) সুখলাভ মানুষের সকল কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। অবশ্য এই তিনটি আদর্শকে আদৌ নৈতিক আদর্শ বলা যায় কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সুখ বৃদ্ধির সঙ্গে আয়ু বৃদ্ধির কি কোন ঐকান্তিক যোগ আছে? নৈতিক জীবনের সঙ্গে জীবনের ঐশ্বর্য বিস্তার কি সমার্থক? একথা কি সত্য নয় যে, নৈতিক জীবন হল সরল ও অনাড়ম্বর। স্পেনসার বললেন যে, তাঁর ক্রমবিবর্তনবাদ অনুযায়ী কাল-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক যুক্তি ও আদর্শ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু সত্য সত্য কি তাই হয়েছে? এই যুগে আমরা কি জঘন্যতম মানবিক অপরাধকে সঙ্ঘটিত হ'তে দেখিনা? যুদ্ধ,

জাতি-বিদ্বেষ, ও সর্বনাশা ধর্ম বিরোধ কি এই যুগের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে নি? এইভাবে কি জীবনের বিস্তার করা যায়? উপসংহারে একথা বলা চলে যে, যদিও মানুষ বড় হয়েছে, পশুর স্তর ছেড়ে অনেক উচুঁতে উঠেছে, তবুও মানুষ সুখকে শ্রেষ্ঠ মূল্য বলে স্বীকার করে নি; ঐশ্বর্য, বীর্য, ত্যাগ ও মহত্বের জন্য নিঃশেষে সুখকে বিসর্জন দিয়েছে। মানুষ সুখকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে কখনই গ্রহণ করেনি। তাইতো এদেশে উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', তত্ত্বটির এতো সমাদর।

লেজলি ষ্টিফেনের ক্রমবিকাশবাদী প্রেয়োবাদ (Evolutionary Hedonism of Leslie Stephen)

নৈতিক আদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেনসারের সঙ্গে আমরা লেজলি ষ্টিফেন ও আলেকজাণ্ডারের নামও করতে পারি; এঁরাও নীতির ক্ষেত্রে স্পেনসারের মতই দার্শনিক ক্রমবিকাশবাদের ধারণার যথোপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। আমরা পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখেছি যে, হার্বার্ট স্পেনসার ক্রম-বিকাশ ধারার একটি শেষ পরিণতির কথা স্বীকার করেছেন; তিনি একটি চরম নৈতিক আদর্শের কথাও বলেছেন। এই আদর্শটি শুধু চরমই নয়, পরমও বটে। এই অবস্থায় অন্তরে ও বাহিরে, ব্যক্তি ও সমাজে, কর্তব্য ও আনন্দের সমন্বয় ঘটে। আমরা তখন স্বেচ্ছায় সাগ্রহে নৈতিক জীবনকে গ্রহণ করি। শাসনের তাড়নায় কোন নীতি মানার প্রয়োজন হয় না। আমরা যা কিছু মানি, তা মানি অন্তরের প্রেরণার তাগিদে; তার সঙ্গে আনন্দ এসে যুক্ত হয়। হার্বার্ট স্পেনসার এই ধরনের একটি সমন্বয়ী শান্তিময় নৈতিক জীবন যাপনের কল্পনা করলেন। লেজলি ষ্টিফেন কিন্তু এই ধরনের কোন সমন্বয়ের স্তর বা পর্যায়কে স্বীকার করেন নি। হার্বার্ট স্পেনসার ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। লেজলি ষ্টিফেন বিশ্বাস করলেন সমাজের জৈবিক (Organic) সংগঠনে। এই সমাজ-রূপ সংগঠনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। নৈতিক জীবনের একক বা unit হল সমাজ, ব্যক্তি নয়। সমাজদেহ জীব দেহের মতই একটি প্রাণবন্ত সুসংহত সংস্থা, যার মধ্যে ব্যক্তি সমাজদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিসেবে সুসঙ্গত উপায়ে কাজকর্ম করে। জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন আপন আপন সত্তাকে, প্রয়োজনকে, উদ্দেশ্যকে জীবদেহের সামগ্রিক সত্তা প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে লীন করে দেয়, তেমনি ধারা ব্যক্তি মানুষ আপন আপন স্বার্থ, প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যকে সমাজের স্বার্থ, প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য সাধনে বিনিয়োগ করে। ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ সমাজের

সমগ্র কল্যাণ-অকল্যাণের উপর নির্ভরশীল। সমাজের মৃত্যু হলে ব্যক্তি মানুষেরও মৃত্যু ঘটে। সমাজের ক্ষয় বৃদ্ধি হয় সমাজের উপর তার পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়ার ফলে। ব্যক্তি মানুষকে সমাজ জীবনের সঙ্গে নিয়ত সঙ্গতি রেখে চলতে হয়। লেইজলি ষ্টিফেন বললেন যে, এই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক হল, আত্যন্তিক এবং আন্তর সম্পর্ক। জীবদেহের সঙ্গে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ঠিক তেমনিধারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ব্যক্তি মানুষ ও সমাজের মধ্যে। সমাজ হল একধরনের Organism অর্থাৎ সমাজ হল জীবদেহের মতই একটি জটিল ব্যাপার। নানান ধরনের কাজ-কর্মের চাপ জীবদেহের কোষগুলিতে পারিপার্শ্বিক চাপে রূপান্তরিত হয়; ঠিক এমনি করেই সমাজদেহের পরিবর্তন ঘটে। এই বিবর্তনের পথেই সমাজ ধীরে ধীরে উন্নততর সমাজে পরিণত হয়। সমাজের ব্যক্তিমানুষের কর্মেই উন্নততর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয় এবং তাদের কর্মক্ষমতা ক্রমেই বেড়ে যায়। সমাজ বিবর্তনের পথে তারা অধিকতর ক্রিয়াশীল এবং কার্যকরী হয়ে ওঠে। বেন্থাম এবং মিলের মত লেইজলি ষ্টিফেন কিন্তু বলেননি যে নৈতিক জীবনের মুখ্য লক্ষ্য হল, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সুখ সম্পাদন করা; তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের মতও বলেননি যে জীবনের প্রসার এবং বিস্তার করাই হল নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। পরন্তু তিনি বললেন যে, সামাজিক সংস্থার স্বাস্থ্য এবং 'ক্তি (Efficiency) বৃদ্ধি করাই হল সামাজিক উদ্‌বর্তনের লক্ষ্য। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন যে, আমাদের নৈতিক আদর্শ সুখ নয়; তাহ'ল সমাজদেহের স্বাস্থ্য। সমাজের কল্যাণ বলতে ষ্টিফেনসাহেব বুঝলেন সমাজের স্বাস্থ্যকে। যে কাজ সামাজিক স্বাস্থ্যের হানি করে, সেই কাজ মন্দ, যে কাজ সামাজিক স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় সেই কাজ ভালো। অবশ্য লেইজলি ষ্টিফেন এই সুখের স্থানে স্বাস্থ্যকে এনে ফেলে, হার্বার্ট স্পেনসার, বেন্থাম্ বা মিলের থেকে যে খুব দূরে সরে গেছেন, তা নয়। কেননা, স্বাস্থ্য এবং সুখ এরা পরস্পরের থেকে খুব বেশী দূরে নয়; এদের পার্থক্যটুকুও খুব বেশী নয়। সামাজিক শক্তির অনুকূল হলো নৈতিক বিধি-বিধানগুলি। আমরা যখন বিবেকের কথা শুনি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা সমগ্র সামাজিক জীবনের কথাই শুনি অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষেয বিবেকের বাণীর সঙ্গে সামাজিক নির্দেশের বিশেষ পার্থক্য নেই। আমরা আমাদের প্রতিবেশীর জন্য যখন দুঃখ বা সমবেদনা বোধ করি তখন আমি তা করি সামাজিক জীব হিসেবেই, যে সামাজিক সংস্থার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি, যার মধ্যে সমাজের মানুষের একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধের ধারা যুক্ত হয়ে থাকে সেই

সহানুভূতি সামাজিক সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য একান্তভাবে উপযোগী। সামাজিক বিবর্তনের পথে সামাজিক মানুষেরা শুধুমাত্র যে তাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটায় তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চরিত্র সংগঠিত হয়। এই বিবর্তনের গতিপথ হল 'করা', থেকে 'হওয়ার', দিকে। বাইরের প্রয়োজনের চেয়েও অন্তরের প্রয়োজনটাই ক্রমেই বড় হয়ে দেখা দেয়। হার্বার্ট স্পেনসার যে Absolutist Ethics-এর কথা বলেছেন লেইজলি ষ্টিফেন সেই তত্ত্বে বিশ্বাস করলেন না। হার্বার্ট স্পেনসারের মত তিনি কর্মে নির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্যের কথা বলেন নি। সমাজ যে সেই লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে এই তত্ত্বেরও তিনি বিরোধিতা করেছেন। তিনি সমাজকে গ্রহণ করেছেন ; এই সমাজের বাস্তব রূপ এবং সমাজের স্বাস্থ্য, শান্তি এবং কর্ম ক্ষমতা যাতে অটুট থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্ম (Virtue) বলতে তিনি বুঝেছেন সামাজিক শান্তি রক্ষার জন্য সামাজিক মানুষের ক্রিয়াশীলতাকে। হার্বার্ট স্পেনসার ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী হওয়া সত্ত্বেও তিনি Altruism-কে আত্ম-স্বতন্ত্রবাদ বা Egoism-এর মতই সহজাত মানুষের আন্তর মত বলে গ্রহণ করেছেন। হার্বার্ট স্পেনসারের কথা উদ্ধৃত করে দিই, 'Evolution tending over towards self preservation reaches its limit when individual life is the greatest both in length and breadth', কিন্তু লেইজলি ষ্টিফেন বললেন যে, ব্যক্তি মানুষেরা সমাজবদ্ধ হয়েও পরস্পরের উপর নির্ভর করে। আমরা যাকে নৈতিক বিধি-বিধান বলি, তা সমাজ কল্যাণের অস্ত্র-স্বরূপ : 'A moral rule is a statement of a condition of social welfare'. ষ্টিফেনের মতে নৈতিক ক্রমবিকাশের লক্ষণ হল এই যে, সমাজের সহজাত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের সঙ্গে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের একাত্মতা ক্রমেই পরিলক্ষিত হবে। বাইরের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, নৈতিক আইনগুলি হল সমাজের স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধির উপযোগী ব্যবস্থা। ভিতরের বা আন্তরিকতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, ব্যক্তির মনে সমাজের স্বাস্থ্যের অনুকূল অনুভূতি গঠনে সহজ পথের সৃষ্টি করাই হল নৈতিক আইনকানুনের কাজ। বিবেক হল ব্যক্তি মানুষের অন্তরে সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে আকুতি রয়েছে, তার প্রকাশ। বিবেক ব্যক্তি মানুষকে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী যেসব প্রাথমিক স্বার্থ আছে সেগুলিকে পূর্ণ করতে নির্দেশ দেয়। ব্যক্তির অন্তরে সামাজিক মমত্ববোধ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সমতাবোধ জাগ্রত হয়, তাকেই নৈতিক চেতনা বলা হয়েছে। সমাজ ও ব্যক্তি এতদ্‌উভয়ের স্বাস্থ্যের যতই শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, ততই

তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় গভীরতম নৈতিক অনুভূতিগুলি ব্যক্তি ও সমাজের মনে সহজাত ও স্থায়ী হয়ে আছে।

সমালোচনা

লেইজলি ষ্টিফেন অত্যন্ত নিপুণভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন যে, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কটা অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। সামাজিক মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও শান্তি যে সামগ্রিক সমাজ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের জীবনের পারস্পরিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে, এই তত্ত্বটি তিনি প্রচার করলেন ; মানুষের নীতি-বোধ এবং নৈতিক আদর্শের ধারণা যে ব্যক্তিগত ধারণা নয়, একথা ষ্টিফেন সাহেব বললেন। সমাজের সুস্থ বিকাশের উপরেই ব্যক্তি মানুষের পরিচ্ছন্ন নীতিবোধ একান্তভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু একথা বোধহয় বলা দরকার যে, লেইজলি ষ্টিফেনের জীবদেহের উপমা একটি ভ্রান্ত উপমার উদাহরণ। জীব দেহের সঙ্গে জীবের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্বন্ধের যে ধারণা সেই ধারণা কিন্তু ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের ধারণার সমার্থক নয়। ব্যক্তি মানুষ সমাজ দেহের অংশ মাত্র নয় ; তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, অনুভূতি ও উদ্যাম আছে এবং তার নৈতিক সমস্যাও সবটাই সমাজগত নয়। তার আত্মমর্যাদার ধারণা, সম্ভ্রমবোধের ধারণা, আত্মবিকাশের ধারণা, এগুলি সবসময় সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য নয়। সামাজিক কল্যাণ ও ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ সকল ক্ষেত্রেই সমার্থক নয় ; বহুক্ষেত্রেই তা ভিন্ন। একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির জন্যই সমাজ।

লেইজলি ষ্টিফেন বললেন যে, সামাজিক স্বাস্থ্যই হল সুখ এবং এই সামাজিক সত্যকে নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ক'রে ষ্টিফেন সাহেব আমাদের চাওয়াকে, আমাদের চিন্তাধারাকে ভিন্নতর পথে পরিচালিত করতে চাইলেন। তিনি সামাজিক স্বাস্থ্য ও সুখের সমন্বয় ঘটালেন। তাঁর মতে মত দিয়ে সামাজিক স্বাস্থ্যকে সুখ বলা চললেও সব সুখই কিন্তু সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। সামাজিক স্বাস্থ্যকে এইভাবে নির্দিষ্ট ক'রে Leslie Stephen প্রেয়োবাদকে ত্যাগ করলেন ; এটা প্রেয়োবাদ বিরোধী ধারণা। কিন্তু আদর্শের সন্ধান ক'রে চলায় লেইজলি ষ্টিফেনের সঙ্গে হার্বার্ট স্পেনসারের আংশিক মিল দেখা যায়। হার্বার্ট স্পেনসার বলেছিলেন, অন্তরের ও বাইরের জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করাই হল কল্যাণের উৎস। প্রকৃতপক্ষে লেইজলি ষ্টিফেন ও হার্বার্ট স্পেনসার, এঁরা উভয়েই পরিপূর্ণ বিকাশতত্ত্ব বা Perfection-ism-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ষ্টিফেন-কথিত সামাজিক স্বাস্থ্যই

নৈতিক বিকাশের শেষ কথা নয়। হার্বার্ট স্পেনসারের সুসঙ্গতির ধারণায় সামাজিক স্বাস্থ্য শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ বলে গ্রাহ্য নয়। আর যে পরিপূর্ণ বিকাশ-বাদের (Perfectionism) দিকে এঁরা ইঙ্গিত করছেন সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা বোধহয় বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে লেইজলি ষ্টিফেন সমাজকে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই তুলনাটি বোধহয় খুব সমীচীন হয়নি। কেননা জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কোন স্বাধীন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। সামাজিক মানুষেরা কিন্তু তা পারে। মানুষের মূল্যবোধ আছে; সমাজের মূল্যবোধ নেই। মূল্য সবসময়ই ব্যক্তি মানুষের; সমাজের মূল্যবোধ বলতে আমরা ব্যক্তিমানুষের মূল্য-বোধকেই বুঝি। সামাজিক জীবনেও আমরা ব্যক্তি মানুষের জীবনের ছবি দেখি। প্রকৃতপক্ষে সমাজের কোন অনুভূতি নেই, বেদনাবোধ নেই, আনন্দবোধও নেই; যা ঘটেছে তা পশুর অথবা মানুষের জীবনেই ঘটেছে। অতএব আমরা পূর্বে যে "সামাজিক জীবদেহের" উপমা ব্যবহার করেছি, সেই উপমা ন্যায়সঙ্গত উপমা নয়। তর্কশাস্ত্রবিদেরা বলেছেন যে, 'Analogy is no Logic', এই সাবধান বাণী স্মরণ ক'রে যদি আমরা লেইজলি ষ্টিফেনের তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করি তাহ'লে বোধহয় তাঁর মতের যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে। আমরা উপরে যে Perfectionism বা পরিপূর্ণ বিকাশের উচ্চতম আদর্শের কথা বলেছি, সেটাও ব্যক্তিমানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। সমাজের পক্ষে সেই ধরনের কোন আদর্শের রূপায়ণ করা সম্ভব কিনা তা বিতর্কের বিষয়।

আলেকজাণ্ডারের ক্রমবিকাশভিত্তিক প্রেয়োবাদ (Evolutionary Hedonism of Alexander)

আলেকজাণ্ডার বললেন যে, আমাদের প্রত্যেকটি কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করতে হবে নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে। মানুষের উদ্দাম প্রবৃত্তি-গুলিকে সুসংহত এবং সঙ্গত ক'রে মানুষ যখন আপনার ইচ্ছা ও কাজকর্মের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন ক'রে তাকে সামাজিক প্রয়োজন ও আদর্শের সঙ্গে সুসঙ্গত করে তোলে, তখনই তা যথার্থ নীতিসম্মত হয়ে ওঠে। আদর্শের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার ভারসাম্য স্থাপন করাই হল শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ। আলেকজাণ্ডার বললেন: নৈতিক আদর্শ হল আমাদের যুধ্যমান প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে এক ধরনের সাম্য স্থাপন করা; সমগ্র মানসবৃত্তের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে যে সামগ্রিক সমন্বয় সাধন করা যায়

তা হল শুভ বা কল্যাণ : [This Moral ideal is an adjusted order of conduct, which is based upon contending inclinations and establishes an equilibrium between them. Goodness is nothing but this adjustment in the equilibrated whole.]* আলেকজাণ্ডার জৈব ক্রমবিকাশবাদের মতই 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ও 'যোগ্যতমে'র উদবর্তন' তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন, নৈতিক আদর্শের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। তার মতে, জীব জগতে এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই দুর্বল প্রাণের ধ্বংস ও বিনাশ ঘটে। কিন্তু নীতির ক্ষেত্রে মানুষের বিকাশ ঘটে না। বিনাশ ঘটে দুর্বল আদর্শ বা জীবনধারার। যে আদর্শ দুর্বল, যে মূল্যবোধ অকিঞ্চিৎকর তা অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই দুর্বল আদর্শ, অকিঞ্চিৎকর মূল্যবোধ এরা সমাজের কল্যাণের সঙ্গে সুসঙ্গত নয়। নীতির ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই হয় না। সুতরাং সেখানে লড়াই হয় অসম্পূর্ণভাব বা আদর্শের সঙ্গে, পরিপূর্ণভাব বা আদর্শের লড়াই। যখন যে মত যত সুসঙ্গত হ'বে সেই মতের জয়ী হবার সম্ভাবনা ততই বেশী। এমনি করে অধিকতর বলশালী বা শক্তিশালী মতাদর্শ মানুষকে নীতির ক্ষেত্রে বারবার জয়ী করেছে; কারণ সেই আদর্শ সত্য এবং নিষ্ঠাকে আশ্রয় ক'রে থাকে। কাজেই যুক্তির দ্বারা সে উন্নততর মতবাদকে মানুষের আছে গ্রহণযোগ্য ক'রে তুলতে খুব বেশী সময় লাগে না। চিন্তাশীল মানুষ কালক্রমে এই নতুন মত-বাদকে গ্রহণ করে। আলেকজাণ্ডারের কথা উদ্ধৃত করে বলি : প্রকৃতির রাজত্বে যেমন প্রজননের মাধ্যমে বংশ বা জাতি বিস্তার ঘটে, ভাবের ও নীতির জগতে তেমনি শিক্ষা ও বিচার-আলোচনার মাধ্যমে পুরাতন নৈতিক ভাব ভাবনাগুলি দূরীভূত হয়ে নতুন নৈতিক ভাব ভাবনা জন্ম নেয়। ['Persuasion and education in fact, without destruction replace here the process of propagation of its own species and destruction of the rival ones, by which in the natural world species become numerically strong and persistent.'] এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন যে, নীতির ক্ষেত্রে আমরা যে আমাদের বিরোধী মতবাদীদের সঙ্গে আলোচনা করি, তাদের আমাদের মতাবলম্বী ক'রে তুলি, তাহ'ল জৈব বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শ্রেণীর ধ্বংস সাধনের সমতুল্য। নীতি হল বুদ্ধি বিবেচনার ব্যাপার। অতএব বিবেচনার ক্ষেত্রে হনন এবং ধ্বংসের কোন প্রয়োজন নেই। সে ক্ষেত্রে বড় জোর মতের

* Alexander : Moral Order and Progress, Bk III, Ch IV দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তন ঘটতে পারে। আলেকজাণ্ডার ওইভাবেই নীতি-আদর্শকে ব্যাখ্যা ক'রে বললেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী মতের রূপান্তর ঘটানো হল প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতই একটি ঘটনা।

আলেকজাণ্ডারের সমালোচনা

আলেকজাণ্ডারের ক্রমবিকাশভিত্তিক প্রেয়োবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে একথা বলতে পারি যে, লেইজলি ষ্টিফেনের মতের সঙ্গে তাঁর মতের খুব একটা গুণগত পার্থক্য নাই। সামাজিক সাম্য অবস্থাকে (Equilibrium) নৈতিক আদর্শের চূড়ান্ত বলে স্বীকার করার মধ্যে খুব যে একটা যৌক্তিকতা আছে, তা আমরা মনে করি না। সমাজের সাম্যাবস্থায় নানান ধরনের সুবিধা বা কায়েমী স্বার্থ আত্মগোপন ক'রে থাকে, সমাজদেহকে বিষাক্ত ক'রে তোলে। অতএব সামাজিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠার অর্থ হল যে, সামাজিক ক্রটি-বিচ্যুতিকে চিরকালের মত জিইয়ে রাখা। সেই অবস্থা সকলের পক্ষে কখনই কল্যাণকর হয় না। এছাড়া আলেকজাণ্ডার প্রাকৃতিক নির্বাচনকে যেভাবে নীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেন তার যৌক্তিকতাও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। নৈতিক আদর্শের বিবর্তনের ধারাকে বর্ণনা করার কাজ নীতিশাস্ত্রের নয়। উচ্চতর আদর্শ কেন উচ্চতর বলে গৃহীত হয়, এটাকে ব্যাখ্যা করাই হল নীতিশাস্ত্রের যথার্থ কাজ। আলেকজাণ্ডার একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন একটি নৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলেই যে তাকে ভালো বলে গ্রহণ করতে হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তবে যদি কোন নৈতিক মতবাদ গ্রাহ্য হ'য়ে থাকে তাহলে বোধহয় একথা বলা চলে যে সেই মতবাদটা ভালো। আলেকজাণ্ডার আরও বললেন যে নৈতিক আদর্শের উৎকর্ষ, অপকর্ষ, জীবনাদর্শের শুভ-অশুভ এসবই সামাজিক অবস্থার সংগে সঙ্গতি রক্ষা করার উপর নির্ভর করে। যেখানেই সঙ্গতিটুকু থাকে, সেখানেই বিরোধ দূরীভূত হয়। সমাজ ও ব্যক্তি সুসঙ্গতভাবে পরস্পরের কল্যাণে সুসংহতভাবে আত্মনিয়োগ ক'রে পরস্পরের কল্যাণ সাধিত করে। এই ভাবে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কিন্তু আলেকজাণ্ডার কখন ব্যাখ্যা করলেন না যে, সমাজের সাম্যাবস্থা গঠন শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ রূপে গৃহীত হবে কেন? ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সঙ্গতি, ব্যক্তিস্বাস্থ্যের সঙ্গে সমাজের স্বাস্থ্যের সঙ্গতিই বা কাম্য হবে কেন? যদি তা কোন মহত্তর উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে তবেই তা কাম্য হতে পারে। আলেকজাণ্ডার ক্রমবিকাশবাদের যে ধরনের Positive ব্যাখ্যা

করেছেন তার অনুসন্ধান পদ্ধতি হল অতীত অবস্থাগুলির বিশ্লেষণ করে বর্তমান অবস্থার নৈতিকতা নির্ধারণ করা। এই ব্যাখ্যা হল, যান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Mechanistic Explanation)। নীতির ক্ষেত্রে এবং জীবনের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা কতটুকু গ্রাহ্য সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। নৈতিক জীবনকে নৈতিক আদর্শের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে হয় এবং সেই ব্যাখ্যা অতীতের প্রাকৃতিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে গ্রহণ করলে সেই আদর্শ-লক্ষ্য ধরে পথকে সংহতির পথ বলে প্রচার করা হয়েছে। আলেকজাণ্ডার আরও বললেন যে, এই সঙ্গতির লক্ষণ হল সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ এবং তার পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ। অতএব দেখা যায় যে, অতীত ঘটনার আলোতে (বর্তমানকে অগ্রাহ্য করে) নৈতিক আদর্শের মূল্যায়ন করা খুব একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাপার নয়। এঁরা আদর্শকে সুসঙ্গত তত্ত্ব রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। আলেকজাণ্ডারের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই সত্যটির উদ্ধার করে Mackenzie এই কথা বললেন: নৈতিক জীবনকে যবনিকার অন্তরালের কোন ভাব ভাবনা দিয়ে ব্যাখ্যা করলে সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। আমাদের সম্মুখে যে নৈতিক আদর্শ থাকে তা দিয়েই আমাদের নৈতিক জীবনকে ব্যাখ্যা করা দরকার। ["The attempt to explain the moral life from behind cannot be of much avail. We must explain it rather by what lies in front of us, by the ideal or end that we have in view]*

প্রেয়োবাদের মূল্য বিচার (An evaluation of Hedonism.)

মানুষের জীবনে অনুভূতির যে একটা বিশেষ স্থান আছে সেটাকে স্বীকার ক'রে প্রেয়োবাদ বা Hedonism যুক্তিযুক্ত কাজই করেছে। তবে মানুষের এই অনুভূতি কেন্দ্রিক জীবনকে আদর্শ বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। আমরা অনুভূতিকে যুক্তির অধীনস্থ বলে ভাবলেও ঠিক ভাবা হবে না। অনুভূতি প্রবণতা (Sensibility) মানুষের একটি মৌল বৃত্তি। নৈতিক জীবনের বস্তু উপাদান বলে আমরা অনুভূতি প্রবণতাকে গ্রহণ করতে পারি। মানুষের গ্রহণ যোগ্য সব নৈতিক আদর্শের মধ্যেই সুখ বা আনন্দের স্থান থাকে। প্রেয়োবাদ সুখ লাভকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেছে। একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে, মানুষের নৈতিক আদর্শ মানুষের পক্ষে রুচিকর ও আনন্দদায়ক

* A Manual of Ethics, পৃ: ২৪

হওয়া চাই। অতএব সুখকে আদর্শ বলে গ্রহণ ক'রে প্রেয়োবাদ ঠিক কাজই করেছে।

কিন্তু আমাদের এই অনুভূতি কেন্দ্রিক জীবনে আমাদের এই সুখের আকাঙ্ক্ষা, এটাইতো আমাদের স্বভাবের বা প্রকৃতির সবটুকু নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের সবটা যুক্তির মধ্যে অথবা সুখের আকাঙ্ক্ষাতে বিরাজ করে না, প্রভুত্বও করে না। আমরা সুখ চাই বলেই সুখই যে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হওয়া উচিত একথা প্রমাণিত হয় না। সুখকে সুখের জন্যই চাওয়ার ঘটনা মানুষের জীবনে বিরল। যে যেমন ধরনের মানুষ তার সুখও সেই ধরনেরই হওয়া উচিত। যে মানুষ রুচি সমন্বিত, বিদগ্ধ মনের অধিকারী, তার সুখ, আর যে মানুষ সুরাসক্ত, শুঁড়ির দোকানে যার নিত্য গতায়াত, তার সুখ এক নয়। অতএব সুখের সঙ্গে উচ্চতর মূল্য বোধের সম্বন্ধ সব সময়ই থাকা চাই। সুখ কোন কাজকে নৈতিক বা অনৈতিক বলে ভিন্ন করে না। ভিন্ন করে রাখাটা হ'ল মূল্য বোধের কাজ, এটি সুখের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তি মানুষের তৃপ্তি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সুখ, সমাজের স্বাস্থ্য প্রমুখ ধারণার দ্বারা প্রেয়োবাদীরা তাদের কাজের নৈতিক মূল্যের বিচার করেন। বাইরের ফলাফল দেখে কাজের নৈতিক গুণাগুণ যখন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তখন একথা বলা সমীচীন হবে না যে, সুখই কাজের নৈতিক গুণাগুণকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। কোন কাজ নীতি-সম্মত কিনা সেটা নির্ভর করে সেই কাজের অন্তর্গত গুণের ওপর। যদি তা বাইরের ফলাফলের উপর নির্ভর করে তবে সেই ফলাফলই কাজের নৈতিক মূল্যের যথার্থ নির্ণায়ক। সুখের উৎকর্ষ সুখের পরিমাণ এদের দ্বারা সাধারণ কাজের নৈতিক গুণাগুণ বিচার করা হয়। অতএব এক্ষেত্রে সুখই কাজের নৈতিকমূল্যের চূড়ান্ত নির্ণায়ক নয়। 'সুখের উৎকর্ষ' 'সুখের পরিমাণ' এইসব কথা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সুখ দিয়ে কাজের নৈতিক মূল্যের বিচার হয় না। তার পরিমাণ দিয়ে, তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ দিয়ে কাজের নৈতিক মূল্যের বিচার হয়। আবার যদি বলি মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের ব্যক্তিগত সুখের প্রকৃতিকে নির্ধারণ করতে হবে তাহলে বুঝতে হবে যে, মর্যাদা সুখের চেয়ে উচ্চতর আদর্শ। যদি বলা যায় যে, 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়', আমাদের কাজকর্ম করতে হবে, তাহলে বুঝতে হবে যে, 'বহুজনের সুখই নৈতিক মূল্যের চূড়ান্ত নির্ণায়ক। সেক্ষেত্রে সুখটাই বড় কথা নয়। যে সুখ বহুজনের অর্থাৎ সংখ্যা গরিষ্ঠের কাছে সুখ বলে গ্রাহ্য, সেটাই গ্রহণযোগ্য। সুখকে মানুষের নৈতিক জীবনের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা গেলেও যুক্তি বা বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মানুষের নৈতিক

জীবনে সুখের কোন প্রভাব নেই। সুখ হল অনুভূতির কাজ এবং মানুষের এই অনুভূতির জীবনকে সুবিন্যস্ত এবং সুসংহত করে তুলতে হলে প্রয়োজন যুক্তি এবং বিচারের। অতএব সেই অনুভূতির যথাযোগ্য পর্যালোচনার ভার যুক্তি-বিচারের হাতে তুলে দিতে হবে। এই যুক্তির অধিনায়কত্ব ছাড়া অনুভূতির সৈন্য বাহিনী শৃঙ্খলাহীন বেপরোয়া হয়ে উঠবে ; তার দ্বারা মানুষের অকল্যাণই সাধিত হবে। এই প্রসঙ্গে আমরা নীতিবাদী Seth-এর কথা উদ্ধৃত করে দিতে পারি : আমাদের জীবনে অনুভূতি এবং যুক্তির টানা পোড়েনের ঠাস বুনানি ; সুখবাদীরা জীবনকে বিশ্লেষণ ক'রে তা থেকে অনুভূতির সুতোগুলো টেনে টেনে বার করে এবং তৈরী কাপড়টাকে ছিন্ন বিছিন্ন করে ফেলে ; সে আর কাপড়ের পুরানো নকশাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। ['The threads of which our life is woven are threads of feeling, if the texture of the web is reason's work. The Hedonist unweaves the web of life into its threads and having unwoven it, he cannot recover the lost design.]*

প্রেয়োবাদ একদেশদর্শী। মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলেছি : 'Man is a rational animal.' মানুষ শুধু প্রাণীই নয়, সে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। যদি মানুষ শুধু মাত্র প্রাণী হত তবে, হয়ত ইন্দ্রিয় সুখই তার কাছে চরম ও পরম কাম্য রূপে গৃহীত হত। কিন্তু মানুষের বিচার বুদ্ধি তাকে শুধু-মাত্র সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত করেছে। যুক্তি ও বিচারের উচ্চ ভূমিতে একমাত্র সুখই কাম্য হতে পারে না। সুখ-দুঃখের আপেক্ষিক বিচারে আমরা যুক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োগ করে থাকি। সেই যুক্তি ও বুদ্ধি মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনের দাবী মেটানোর ব্যাপারে উচ্চতর আদর্শের সন্ধান দেয়। শুধুমাত্র প্রেয়োবাদের দ্বারা সে আদর্শের যথার্থ নির্ধারণ ও বর্ণন সম্ভব নয়।

* A Study of Ethical Principles, পৃ: ১৪৮

নবম অধ্যায়

যুক্তিবাদ : কাণ্টের কৃচ্ছ্রবাদ (Rationalism : Kant's Rigorism)

যুক্তিবাদ—কাণ্টের কৃচ্ছ্রবাদ—যৌক্তিক আচরণের ধর্ম ও লক্ষণ—কাণ্টিয় নীতি দর্শনের গৃহীত স্বতঃসিদ্ধ সত্য—কাণ্টিয় যুক্তিবাদের সমালোচনা—সিনিক ও ষ্টোয়িকদের নৈতিক আদর্শ ও তার পর্যালোচনা—যুক্তিবাদের গুণাগুণ—ভগবদ্ গীতার নীতিবাদ ও কাণ্টিয় নীতিদর্শন—গীতায় কর্মযোগের আদর্শ : নিষ্কাম কর্মের ধারণা।

নবম অধ্যায়

যুক্তিবাদ ; কান্টের কৃচ্ছ্রবাদ (Rationalism : Kant's Rigorism)

মানুষ সুখ কামনা করে ; সুখই মানুষের কাম্য। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষের জীবন সাধনা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। মানুষের এই সুখান্বেষণ প্রবৃত্তি প্রাণীদের মধ্যেও আছে। প্রাণীরাও এই সুখের অন্বেষণ করে ; ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি খোঁজে। এই তত্ত্বের পরিবেশন করলেন প্রেয়োবাদীরা। প্রেয়োবাদীদের মতে সুখ অন্বেষণই হল মানুষের আদর্শ। কোন আদর্শই ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে না। কাজে কাজেই মানুষের যে ধর্ম সেই ধর্মের ছাঁচেই তার আদর্শও গঠিত হবে। অতএব প্রেয়োবাদীরা একথা বলতে চাইলেন যে, সুখের অন্বেষণ ক'রে মানুষ তার আপন ধর্মেরই বিকাশ সাধন করে। মানুষের আদর্শ হল মনুষ্যত্ব, স্ব-ভাবে পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়া। কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে যে, মানুষতো শুধুমাত্র সুখান্বেষণ প্রবৃত্তির পরিপূর্তির দ্বারা মানুষ তার আদর্শে উপনীত হতে পারে না। মানুষের বৈশিষ্ট্য হল, তার বিচারবুদ্ধি বা Rationality। বিচারবুদ্ধি তার বিভেদক। এই বিশিষ্ট গুণ থাকার জন্যই মানুষ 'মানুষ' পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। অতএব বিচারবুদ্ধি যদি মানুষের ধর্ম হয়, তাহলে তার আদর্শও বিচারবুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। তার আচার পদ্ধতিও এই বিচারবুদ্ধিরই ফলশ্রুতি হওয়া উচিত। অতএব মানুষের পক্ষে সেই আচরণই হবে শ্রেষ্ঠ আচরণ, মহত্তম আচরণ, এককথায় নৈতিক আচরণ, যার মধ্যে তার বিচারবুদ্ধি অনুস্যূত হয়েছে। সুতরাং একথা স্বীকার্য যে, যা ন্যায়সঙ্গত, তা-ই যুক্তিসিদ্ধ। যুক্তি-যৌক্তিকতাই নৈতিক মূল্যায়নের মানদণ্ড বা মাপকাঠি। অতএব মনুষ্যত্বের স্ব-ভাবে পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার অর্থ হল, সুখের অন্বেষণ নয়, বিচারবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে আপন আপন নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা।

মহাদার্শনিক কাণ্ট তাই বললেন যে, আদর্শের আত্যন্তিক মূল্য আছে। প্রেয়োবাদীদের প্রার্থিত অর্থ, স্বাস্থ্য, রূপ, যশ, এসবেরই কোন আত্যন্তিক মূল্য নেই। সম্পদের মূল্য তখনই স্বীকৃত হয়, যখন তাদের শুভ উদ্দেশ্যে, শুভ কাজে নিয়োজিত করা হয়। বাহ্য সম্পদকে আমরা সর্বোচ্চ মূল্য দিই না। কেননা বাহ্য সম্পদের মূল্য হল সাপেক্ষ বা Hypothetical। যা সাপেক্ষ, তা কখনও নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তি হতে পারে না। নৈতিক বিধি

বা Moral Law বহিরাগত কোন বিশেষ সর্তের উপর নিভরশীল নয়। কাণ্ট বললেন যে, বাইরের সবরকমের উদ্দেশ্য হল সর্ত সাপেক্ষ আর তাদের নিজের কোন আত্যন্তিক মূল্য নেই। কাণ্টের মতে যা সর্তহীন তাই কেবলমাত্র নিজস্ব মূল্যে মুল্যবান। মানুষের অন্তরের শুভ নৈতিক বুদ্ধি ভালো কাজ করার অকুণ্ঠিত সংকল্প, এরা হল আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যবান, আত্যন্তিক মর্যাদায় মর্যাদা সম্পন্ন। কাণ্ট তাঁর Critique of Practical Reason গ্রন্থে বললেন : 'There is nothing in the world or even out of it that cannot be called good without qualification, except a good will. It shines like a gem in its own light.'

এই যে শুভ নীতিবোধের কথা বলা হল, এর প্রকৃতি এবং চারিত্র-ধর্ম সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে পারি। মানুষের নীতিবোধ হল বিবেক বা মানুষের অন্তরে ভগবানের আদেশ। সেই আদর্শ আমাদের নির্দেশ দেয় কর্তব্য পালন করার জন্য। মানুষের যুক্তি-বিচার ও কর্তব্য কর্মের পালন, অনুমোদন করে। নীতিবোধের এই আদেশ বিনাদ্বিধায় পালন করতে হবে, মানুষের স্বভাবের এটাই হল দাবী। কোন সুখের প্রলোভনে, কোন স্বর্গ সুখের আশ্বাসে অথবা নরকের ভয়ে এই আদেশ পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয় না। অন্তরের নীতিবোধ বলে যে, এই কাজ তোমার স্বভাবসঙ্গত, এই কাজ যুক্তিসঙ্গত, অতএব এই কাজ করা তোমার কর্তব্য। এইযে সর্তবিহীন কর্তব্য সম্পাদনের আহ্বান, একেই মহাদাশনিক কাণ্ট Categorical Imperative আখ্যা দিয়েছেন। এইযে নীতিবোধ এবং কর্তব্য বোধ—কাণ্টের এই নীতিবোধের ধারণাগুলি কিন্তু অভিজ্ঞতা লব্ধ নয়। অভিজ্ঞতা থেকেই এই কর্তব্য পালনের নিদেশ আসে না। মানুষের স্ব-স্বভাবের প্রকাশনই হল এই নীতিবোধ : 'The moral law is intuitive' এই নৈতিক বিধি স্বত: প্রমাণিত; কাজের ফল দেখে কাজের যৌক্তিকতা নির্ণয় করার কথা কাণ্ট বলেন নি। কাজের নৈতিক গুণ নির্ভর করে কাজের যুক্তি-যুক্তার ওপর, কর্তার শুভ-বুদ্ধির বিশুদ্ধতার ওপর। এই প্রসঙ্গে কাণ্টের ভাষ্যকার Paton-এর কথা উদ্ধৃত করে দিই : The rightness or wrongness of a particular action can be inferred from its agreement or disagreement with the moral law. The moral quality of an action is not determined by its consequences but by the purity of its motives. কাণ্টের নৈতিক আদর্শকে এই কারণেই Intuitionism আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যা ভালো, যা নীতিসম্পন্ন, যা নৈতিক, তার শ্রেয় ধর্ম নির্ধারিত হয় কাজের

ফলাফল বিচার করে নয়, তার আত্যন্তিক নৈতিক গুণের বিচারেই তা গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। মন এই শুভ আদর্শকে সহজেই জানতে পারে। সেজন্য বাইরের কোন লাভ-লোকসানের, বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। তাই নব্য হেগেলীয় দার্শনিক ব্রাডলি (Bradley) কাণ্টের নৈতিক আদর্শকে 'Duty for duty's sake' এই আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। অর্থাৎ মানুষ যখন যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে আপন আপন কর্তব্য নির্ধারণ করে তখন সে তার স্বভাবানুগ কর্ম করে। স্বভাববিরুদ্ধ কাজ সে করে না। নীতির শাসন হল, অন্তরের শাসন, স্বভাবের শাসন। তাই যার নৈতিক জীবন আপনার যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, সেই মানুষই আত্মশাসিত, আত্মনিয়ন্ত্রিত। আত্ম-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আদর্শ হল নীতিবুদ্ধির সর্তহীন আদেশ পালন করা। কেননা, সেই আদেশ পালন করার প্রবণতা রয়েছে আমাদের স্বভাবের মধ্যে। কাণ্টের এই প্রসঙ্গে যে উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়, তা হল, 'Thou shalt because thou canst'; যে ব্যক্তি স্বাধীন, স্ব-বশ এবং আপনার যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা চালিত, সে হল নীতিবান। এই স্বাধীনতার অর্থ, স্ব-নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল আপনার বিবেকের নির্দেশ পালন করা। এই স্বাধীনতার অর্থ বিশৃঙ্খল আচরণ নয়। মানুষের ইচ্ছার মধ্যে তার স্বেচ্ছাবৃত নিয়ন্ত্রণের বন্ধনে তার নৈতিক স্বাধীনতা। মানুষের ইচ্ছা শক্তি তার নৈতিক ভাব-ভাবনার উৎস। এই ইচ্ছা শক্তির সাধনা করাই কাণ্টের মতে মানুষের নৈতিক আচরণের ভিত্তিভূমি। কাণ্ট এই ইচ্ছা-শক্তির সাধনা করাকে 'Autonomy of the will' আখ্যা দিয়েছেন। কাণ্টীয় ইচ্ছার স্ব-বশ্যতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Seth বললেন যে যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিশেষ অধিকার হ'ল যে সে নিজের বিধি-বিধান নিজেই রচনা করে। আপন জীবনধারাকে সে যুক্তি দিয়ে সৃষ্টি করে, তার আপন যুক্তিবদ্ধ স্বভাবের বিধিবদ্ধতা থেকেই এই জীবনধারা উৎসারিত হয়: 'It is the prerogative of a rational being to be self legislative......As a rational being, man demands of himself a life which shall be reason's own creation, whose spring shall be found in pure reverence for the law of his rational nature)* মানুষের ইচ্ছা শক্তির সাধনা করাতেই তার অন্তরস্থিত বিবেকের শক্তিটুকু নিহিত আছে। কিন্তু এই বিবেকের নির্দেশ, বিবেকের অনুশাসন সব সময় আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয় না। আমাদের পশু প্রবৃত্তির, আমাদের সুখকর অনুভূতির প্রলোভনে আমরা অনেক সময়েই আমাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হই।

*Seth His Study of Ethical Principles. পৃ: ১৬৩

আবেগের বশে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় আমরা যখন আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দেই তখন মনের সেই বিহ্বল অবস্থায় আমরা যে কাজ করি সেই কাজ 'স্বাধীন নয় ; তখন আমরা স্ববশে থাকি না। আমরা তখন আবেগের, অনুভূতির দাস হয়ে পড়ি ; স্ব-স্বভাব থেকে বিচ্যুত হই। কাণ্ট বললেন, আবেগ বিহ্বল হয়ে আমরা যখন কিছু করি তা আমাদের অসুস্থ, অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার ফল-শ্রুতি। কাণ্ট একে 'A pathological or abnormal state' আখ্যা দিয়েছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এই সবের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করলে সেই কাজ অশুভ এবং অনৈতিক হবে। কেননা এরা সবাই হল অনু-ভূতির রকমফের। অতএব ক্রুদ্ধ হয়ে কোন কাজ করলে বা লোভে পড়ে কোন কাজ করলে সেই কাজ মানুষের মনে নৈতিক সমর্থন পাবে না—এমন কথা কাণ্ট বললেন। আমাদের মনে যে সহানুভূতির প্রস্রবন আছে, আমরা যখন দয়াপরবশ হয়ে কাউকে সাহায্য করি তখনও কিন্তু এই ধরনের কাজকে সমর্থন করি না। হয়তো গরীবকে দয়া করলে তার ফল ভালো হয়, কিন্তু কাণ্ট বলেছেন, তার ফল ভালো হলেও সেই কাজ নীতিসঙ্গত নয়। কেননা সেই কাজের মূলে রয়েছে অনুভূতির প্রাধান্য। আবেগ, তা যেমনই হোক না কোন তা যুক্তি বিচারকে আচ্ছন্ন করে। অবেগের দ্বারা চালিত হলে মানুষ আর স্ববশে থাকে না, তার স্বাধীনতা অপহৃত হয়। ভালবাসা, দয়া, মায়া, মমতা —এসবই মানুষের যুক্তি, বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। কাণ্ট যুক্তিবাদে এমন গভীর-ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, জীবনে অনুভূতির প্রাধান্য আসতে পারে এমন কোন কাজ তিনি করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তিনি দার পরিগ্রহ করেন নি। ভালোবাসার মধ্যে যুক্তি নেই, তাই বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে ভালোবাসার মধ্যে যে অযৌক্তিকতা রয়েছে, দার্শনিক কাণ্ট তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর মতে কাজের ন্যায়পরায়ণতা মানুষের কোন দয়া, মায়া, সহানুভূতি বা এই ধরনের অনুভূতির উপর নির্ভরশীল নয়। তাই নৈতিক আদর্শের মধ্যে হৃদয়াবেগের স্থান নেই। ইন্দ্রিয় যা চায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি নৈতিক জীবনের পরিপন্থী। তাই বলা যেতে পারে যে, কাণ্টের নৈতিক আদর্শ ভোগের নয়, তা হ'ল ত্যাগের। আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ দমন করে তবেই মানুষ নৈতিক মর্যাদায় ভূষিত হতে পারে। কাণ্টের নীতিদর্শনে আকাঙ্ক্ষার কোন স্থান নেই; কাণ্টের নীতির রাজত্বে সুখ ও আনন্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নৈতিক বিধিবিধানের প্রতি অকুণ্ঠিত আনুগত্য কাণ্টের নীতিদর্শনকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এই ত্যাগের আদর্শকে প্রচার করে কাণ্ট আপন নীতি আদর্শকে কৃচ্ছ্রতাবাদ বা Rigorism, এই আখ্যায়

ভূষিত করার অবকাশ দিয়েছেন। কেউ কেউ তাঁর নীতিদর্শনকে বিশুদ্ধতাবাদ বা purism এই আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। অতএব, সংক্ষেপে বলা চলে যে, কাণ্টের মতে সেই আচরণই হল ন্যায়সঙ্গত যা মানুষের যুক্তিকে অনুসরণ করে ; এই নৈতিক আচরণের মূলে থাকে বিবেক বা বিশুদ্ধ নীতি চেতনা।

আমাদের কোন ধরনের আচরণ যুক্তিযুক্ত বা বিচারবুদ্ধিসম্মত তা বোঝাবার জন্য কাণ্ট কতকগুলো লক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার ব্যাখ্যার সূত্রগুলি হল : (১) যা যুক্তিসঙ্গত তা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ বিচারের গ্রহণযোগ্যতা ব্যতিক্রমহীন। আমরা যখন আমাদের সুখ দুঃখের কথা বলি, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির কথা আলোচনা করি তখন আমরা পরস্পরকে বুঝি না। কেননা আমার সুখ এবং আমার প্রতিবেশী সকলের সুখ, আমার দুঃখ এবং আমার পারিপার্শ্বিকের সকলের দুঃখ, এই দুয়ের মধ্যে কোন যোগ নেই। এমনকি আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষাও পরস্পরের বিপরীত হ'তে পারে। আমি যেটা চাই, অনেক সময়ই তা ভুল করে চাই। অতএব আমার চাওয়ার সঙ্গে আমার প্রতিবেশী মানুষদের চাওয়ার সবসময়ই যে মিল ঘটবে, তা নয়। কিন্তু এই অনুভূতির জগৎ থেকে বাইরে এসে আমরা যখন যুক্তি-বিচারের ভূমিতে মিলিত হই, তখন আমাদের মধ্যে মতৈক্য-প্রতিষ্ঠা হতে পারে। যা ন্যায়সঙ্গত, তা যদি বুদ্ধি গ্রাহ্য হয় (এবং কাণ্টের সব নীতিসঙ্গত কাজ হলো বুদ্ধি গ্রাহ্য) তাহলে নৈতিক আচরণ সর্বজনগ্রাহ্য হবে এবং অন্যায় আচরণ বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে না। অর্থাৎ অন্যায় আচরণ যুক্তির বিরোধী আর যুক্তি যদি মানুষের স্ব-স্বভাব হয়, তাহলে যা অন্যায় তা প্রকৃতপক্ষে স্ব-বিরোধী বা Self contradictory ; চুরি করা, মিথ্যে কথা বলা, এই ধরনের কাজ আমরা সকলে করি না। যে কাজ সকলেই করে সেই কাজ অন্যায় নয় : 'Wrong doing consists in making exceptions' আমি যদি একথা ভাবি যে, চুরি করা অপর সকলের বেলায় দোষের হলেও, আমার বেলায় তা দোষের নয় তবে এই ভাবনাটুকু নীতিসম্মত ভাবনা হ'বে না। অর্থাৎ এই যে ব্যতিক্রম (exception) করার ইচ্ছা এটাই হল অনৈতিক। কেননা যা সার্বজনীন নয় তা কখনই নীতিসম্মত হতে পারে না ; তা স্ব-বিরোধী এবং তা যুক্তিসিদ্ধও (self-consistent) নয়। ব্যতিক্রম করার স্পৃহা, ব্যতিক্রম করার ভাবনা, নৈতিক ভাবনা নয়। দার্শনিক কাণ্ট নৈতিক আচরণের সূত্রটি এই ভাবেই প্রকাশ করলেন—'Act only on that maxim which thou canst at the same time will to become a Universal Law., অর্থাৎ যে আদর্শে আমি কাজ করব, সেই আদর্শকে আমি সার্বজনীন বিধি

রূপে গ্রহণ করব। একটি উদাহরণ দিলে কাণ্টের বক্তব্য পরিস্ফুট হ'বে। আমরা সকলেই বলে থাকি 'চুরি করা অন্যায়'। কিন্তু কেন চুরি করা অন্যায় এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কাণ্ট দেখলেন যে চৌর্য ক্রিয়াকে সার্বজনীন স্তরে আনতে গেলে স্ব-বিরোধ দেখা দেয়। আমি অপরের সম্পত্তি চুরি ক'রে আনার পরে যদি ভাবি যে, এই চুরি করা সম্পত্তি আবার অপরের চুরি ক'রে নেওয়া উচিত এবং সেই অপর লোকও যদি অনুরূপ ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহ'লে চোরের দিক থেকে চুরি করার প্রবৃত্তি নষ্ট হয় এবং চুরির সেই প্রাথমিক এবং মৌল সত্য অর্থাৎ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সেটাও দূর হ'য়ে যায়। এক কথায় চৌর্য ক্রিয়াকে সার্বজনীন স্তরে প্রয়োগ করা চলে না। এই জন্য চুরি করা কাণ্টের মতে অন্যায়। আমার জন্য যে বিধিবিধান, সকলের জন্যই সেই 'বিধান। ব্যতিক্রম করার অর্থই হ'ল যে আমরা নীতিকে লঙ্ঘন করছি। অতএব তা অযৌক্তিক হয়ে উঠছে। এই তত্ত্বটিই কিন্তু বেন্থাম অন্যভাবে পরিবেশন করেছিলেন। তিনি যখন বললেন: 'Every one is to count as one and no one as more than one.' বেন্থামের উক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ হল এই যে, তুমি তোমার জন্য কোন বিশেষ সুবিধার দাবী করো না অর্থাৎ তোমার জন্য কোন ব্যতিক্রম করার চেষ্টা করো না। বুদ্ধির কাছে ব্যতিক্রম একটা দুর্বোধ্য বাধা স্বরূপ। ব্যতিক্রম করার অর্থই হল, নীতিবিচ্যুত হওয়া। কাণ্ট তার Critique of Practical Reason গ্রন্থে বললেন, 'Act in such a way as you could will that every one else should act uhder the same general conditions.

(২) দ্বিতীয় সূত্রটি হল, নীতির জগতে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং স্ববশ এবং প্রত্যেকের মূল্যই সমান। উপরে আমরা বেন্থামের যে মত উদ্ধৃত করেছি তার অনুরূপ কথাই কাণ্ট এই দ্বিতীয় সূত্রটিতে প্রকাশ করলেন। অতএব প্রত্যেকটি মানুষকেই তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের মর্যাদাটকু দিতে হবে। অর্থাৎ যারা শক্তিসম্পন্ন তারা যেন অপরের ব্যক্তিত্বকে খর্ব না করে। এই ধরনের চেষ্টা কাণ্টের মতে অযৌক্তিক এবং অনৈতিক। আমি নিজেকে যখন সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি ঠিক সেই ভাবেই অপরকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করব, এটাই কাণ্ট বলতে চেয়েছেন। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অপরকে উপায় (means) হিসেবে ব্যবহার করা নীতিবিরুদ্ধ। আমি যখন অপরের ধন হরণ করি তখন অপরের সম্পদ আপনার স্বার্থ সিদ্ধির উপায় রূপে ব্যবহার করি। আমার পক্ষে এই কাজ নীতিবিরুদ্ধ। কোন মানুষই উপায় নয়; উপায় হিসেবে কোন ব্যক্তিকে গণ্য করা চলবে না। প্রত্যেককে দেখতে হবে উপেয় (End)

হিসেবে। রামকে, শ্যামের স্বার্থ বা ইচ্ছা পূরণের উপায় হিসেবে গণ্য করলে সেই আচরণ নীতি-বিরোধী হবে, একথা কাণ্ট বললেন। আমাদের প্রত্যেকেরই যখন নিজেকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করবার দায়িত্ব আছে, তখন অপরে যাতে সম্যকরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবার দায়িত্বও আমাদের। অতএব আমি আমার ইচ্ছায় অপরকে গড়ে তুলব, এই ভাবনা নীতিবিরুদ্ধ : 'So act as to treat humanity, whether in thine own person or in that of any other, always as an end and never as a means.' অর্থাৎ পূর্বেই আমরা যে বলেছি যে, মানুষকে উপায় হিসেবে নয়, উপেয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, এই কথাটাই কাণ্ট জোরের সঙ্গে বললেন। উদাহরণ প্রসঙ্গে ক্রীতদাস প্রথা ও বেশ্যাবৃত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। নারীর মর্যাদা না দিয়ে রমনীকে ভোগের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা অনৈতিক ঠিক তেমনি-ভাবে মানুষকে মানুষের মর্যাদা না দিয়ে অপরের সুখ সুবিধার জন্য ব্যবহার করা অযৌক্তিক। অতএব ক্রীতদাসপ্রথা অনৈতিক, একথা কাণ্ট বললেন। এই সূত্রের সঙ্গে আরেকটি উপসূত্র কাণ্ট নির্দিষ্ট করে দিলেন ; সেটি হল : Try always to perfect thyself, and try to conduce to the happiness of otheis, by bringing about favourable circumstances, as you cannot make others perfect. এখানে কাণ্ট বলতে চাইলেন যে, আমরা আমাদের আত্মসুখের জন্য চেষ্টা করব না ; আমরা আমাদের পূর্ণতর করে তোলার জন্য চেষ্টা করব এবং এই আত্ম-বিকাশের পথে অপরের সুখ সুবিধা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করব। অপরকে পূর্ণতর মনুষ্যত্ব দেওয়ার দায়িত্ব আমার নয়। সেই দায়িত্ব তাদের নিজেদের দায়িত্ব। কাণ্ট কথিত এই দ্বিতীয় সূত্রটি মানুষের যুক্তিবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৩) কাণ্ট কথিত তৃতীয় সূত্রটিও কাণ্টের যুক্তিবাদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে ; এটাও সেই যুক্তিবাদকে অনুসরণ করেছে। স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে আমরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নই। যা সাধারণত নীতিসঙ্গত তাকে স্বীকার করা, তাকে গ্রহণ করা এবং প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের সকলের সামাজিক উদ্দেশ্য। আপন আপন আত্মবিকাশের পথে আমরা অপরের আত্ম বিকাশের সহায় হয়ে উঠতে পারি। অপরের আত্ম বিকাশের জন্য আমাদের কোন দায় দায়িত্ব না থাকলেও আমরা আমাদের আপন আপন আত্মবিকাশের মাধ্যমে অপরের আত্ম বিকাশের সহায়তা করে থাকি। কাণ্ট তাঁর Practical

Reason গ্রন্থে এই সূত্রটির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব একথা বলা চলে যে, আমি যে আমার আত্মবিকাশ করার জন্য চেষ্টা করছি তখন আমার আত্ম বিকাশ আমার নৈতিক আচরণের উদ্দেশ্য। আবার আমি যখন অপরের জন্য অনুকূল নৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করছি তখন আমি বা আমার নৈতিক আচরণ অপরের আত্ম উপলব্ধির উপায় হিসেবে গণ্য হয়। অতএব প্রত্যেক মানুষই একই সঙ্গে উপায় (means), এবং উপেয় (End) ; যে সমাজে সকলে এইভাবে আপন আপন আত্মবিকাশের জন্য ক্রমে তৎপর হয়ে উঠে, সেই সমাজকে কাণ্ট 'Kingdom of Ends' আখ্যা দিয়েছেন। তৃতীয় সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাণ্ট বললেন: "Act as a member of a Kingdom of ends' অর্থাৎ নিজেকে সবসময়ই উপেয় হিসেবে গণ্য করা উচিত। আমরা যখন নিজেকে অপরের আত্মবিকাশের উপায় রূপে গ্রহণ করি, তখন একই সময়ে আমরা রাজা ও প্রজার ভূমিকা গ্রহণ করি। আমরা প্রত্যেকেই নৈতিক বিধির অধীন। আমরা প্রত্যেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা চালিত। অর্থাৎ 'স্ববশ' এবং 'পরবশ' এই দুটি আখ্যা একই সঙ্গে মানুষের উপর প্রযোজ্য হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের নৈতিক জীবনের তিনটি মূল ভিত্তির উল্লেখ করতে পারি। কাণ্ট এদের বলেছেন, 'Postulates of Morality'। এদের প্রথমটি হল আপন ইচ্ছার অধীনতা। অর্থাৎ যখনই আমি স্বেচ্ছায় কোন কাজ করি তখনই সেই কাজের পূর্ণ নৈতিক দায়িত্ব আমার। এই স্বাধীনতা-টুকু না থাকলে সেই কাজের কোন নৈতিক দায়িত্ব আমার থাকে না। এই নৈতিক আদর্শকে পরিপূর্ণ রূপে সত্য করে তুলতে হলে তা এক জীবনে সম্ভব হয় না। জন্মান্তরের মাধ্যমে আমরা এই আদর্শকে সত্য করে তুলতে পারি। অতএব কাণ্টের মতে, নৈতিক জীবনের দ্বিতীয় ভিত্তিটী হল, আত্মার অমরতা : 'Immortality of the soul' ; তৃতীয় তত্ত্বটি হল, ভগবৎ বিশ্বাস। ভগবানের অস্তিত্বে আস্থাবান না হলে আমরা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে, সাধু জীবনের সঙ্গে সুখ এবং আনন্দের সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। এ ঘটনা আমাদের অহোরহ চোখে পড়ে। যিনি সাধু এবং ন্যায়পরায়ণ তিনি দুঃখ পান, এবং যারা অসৎ এবং অসাধু তারাই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের নৈতিক বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে, নৈতিক শক্তির চূড়ান্ত জয় হ'বেই। অবশ্য ভগবান যদি থাকেন তবেই এই নীতিশক্তির চূড়ান্ত জয় হতে পারে। তিনিই একমাত্র পাপীর শাস্তি বিধান ক'রে পুণ্যাত্মাকে শান্তি দিতে পারেন। তাই নৈতিক জীবনের

তৃতীয় তত্ত্বটি হল ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটুকু না থাকলে আমরা নৈতিক কর্মের আত্যন্তিক কার্যকারিতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি।)

কাণ্টের যুক্তিবাদের সমালোচনা

[মানুষের চরিত্রের মধ্যে যুক্তি এবং অনুভূতির যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ রয়েছে, সেই দ্বৈতবাদের উপর কাণ্টীয় নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ইচ্ছা বা অনুভূতির সঙ্গে যুক্তির যে বিরোধ আপাত দৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হয়, তিনি তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং বৈষম্য, কাণ্ট তাকেই বড় করে দেখেছেন। কিন্তু এই যুক্তি এবং অনুভূতির যে আত্যন্তিক সম্পর্কটুকু রয়েছে, সেটাকে তিনি লক্ষ্য করেন নি। মনের মধ্যেই অনুভূতি এবং যুক্তি এক সঙ্গে থাকে এবং জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে ধরনের ঐক্য বা সংহতি লক্ষ্য করা যায়, মানুষের মনের এই অনুভূতি ও যুক্তির মধ্যে সেই একই ধরনের ঐক্য থাকে। অনুভূতি মাত্রেই যে অযৌক্তিক হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। অনুভূতি থেকে ইচ্ছার জন্ম হয়, ইচ্ছা থেকেই মানুষের কাজ সুরু হয়। অর্থাৎ অভাব থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কর্মের সূত্রপাত। আমরা কোন কাজই এই ইচ্ছা বা অনুভূতির প্রেরণা ছাড়া করতে পারি না বা করি না। যদি আমরা নৈতিক জীবন বলতে কর্মের জীবনকে বুঝি, অর্থাৎ নীতি বলতে, নৈতিক কর্মকে বুঝি, তাহলে অনুভূতি বা আবেগকে বাদ দিয়ে নৈতিক জীবন সম্ভব নয়। একথা বোধহয় জোরের সঙ্গেই বলা যায়। অতএব আমাদের অনুভূতি আমাদের নৈতিক জীবনের সঙ্গে যে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে একথাটা কাণ্ট উপেক্ষা করেছেন।]

কাণ্ট কর্তব্যের মহত্তম আবেদনের কথা বলেছেন। কর্তব্য, কর্তব্য বলেই আমাদের তা করা উচিত, ফলাকাঙ্ক্ষার ওপর তা নির্ভর ক'রে না; এই ধরনের কর্তব্যের আহ্বানে মানুষের কর্তব্যের আদর্শকে সবচেয়ে বড় স্থান কাণ্ট দিয়েছেন। একথা সত্য বাইরের ফলাফলকে অস্বীকার ক'রে কর্তব্যকে কর্তব্যের খাতিরে গ্রহণ করলে আমাদের এই তত্ত্ব স্বীকার করতে হয় যে মানুষের কাজকর্মের নৈতিক গুণ হল আত্যন্তিক। অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিবেক বা স্বচ্ছ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মানুষ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে। হয়তো সবসময় আমরা আমাদের কর্তব্য কর্ম ক'রে সুখ বা আনন্দ পাই না। ভগবানও বোধহয় মানুষের কাজের ফলাফল দিয়ে তাদের বিচার করেন না; বিচার করেন তার অন্তরের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের আলোকে অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্যের স্বরূপ যা তাই দিয়ে তাকে বিচার করেন। এই যে বিবেকের বিশুদ্ধতার

বিচার আমরা কাণ্টের নীতি দর্শনে পাই, এই বিচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব এবং একদেশদর্শী। অতএব বলা চলে যে, বিচার বুদ্ধি, অনুভূতি ও আবেগ এর পরস্পর বিরোধী নয় এবং যদি আমরা মানুষের জীবন থেকে অনুভূতিকে নির্বাসন দিই (কাণ্টকে অনুসরণ ক'রে), তাহলে মানুষের বিচার শক্তিও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। একের বিনাশ অন্যের বিন্যাসে পর্যবসিত হবে এবং একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমাদের যুক্তিই আমাদের অনুভূতির ধ্বংস সাধন বা মূলোচ্ছেদ করে না। আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি; আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাণ্ট নৈতিক বিচার সম্বন্ধে বলেন যে, এই বিধি হল অমোঘ, অনতিক্রমণীয় এবং স্বার্থগন্ধ-হীন। তখন কিন্তু তিনি বাইরের কোন শক্তির নির্দেশের কথা বলছেন না। এই শক্তি আসে মানুষের অন্তর থেকে। কাণ্ট নিজেও কোন কোন স্থানে বলেছেন যে, নৈতিক বিধি হল ভগবানের নির্দেশ। কাণ্ট বারবারই বলেছেন যে নৈতিক বিধির আদেশ হল ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাবের দাবী। এই নৈতিক বিধির ওপর মানুষের আনুগত্য হল আন্তরিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। অবশ্য নৈতিক আদর্শের দ্বারা কোন না কোন শুভ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধিত হয়, এই নৈতিক সত্যটিকে খণ্ডন করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদি আমরা কোন উদ্দেশ্যকে স্বীকার না করি, তাহলে নৈতিক বোধ মেনে চলার কোন ব্যাখ্যাই আমরা করতে পারি না। অবশ্য কাণ্ট বলেছেন যে, আমরা নৈতিক বিধি মেনে চলব, তার কারণ, আমাদের নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠার এটাই একমাত্র পথ। কাণ্টের কথায় বলি : তুমি তোমার আন্তর শক্তির পূর্ণতম বিকাশ সাধনে যত্নবান হও এবং অপরের সুখবিধানের জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি কর। তুমি অপরের পূর্ণতম বিকাশ সাধন কখনই করতে পার না ; সে কাজ-টুকু তারাই নিজে নিজে করবে।'

কাণ্টের নীতি আদর্শ যে আনন্দ থেকে বিচ্যুত, একথা সঙ্গতভাবেই বলা হয়ে থাকে। কাণ্ট তাঁর নীতি দর্শনে, স্নেহ, মায়া মমতা প্রসূত যেসব তথাকথিত সৎ কর্ম, তাদেরও অস্বীকার করেছেন। অবশ্য কাণ্টের মূল বক্তব্য হ'ল যে, আবেগ বা অনুভূতি যেন আমাদের আচরণের নিয়ন্তা না হয়, তবে আচরণের মধ্যে অনুভূতি বা আবেগ থাকবে না এমন কথা তিনি বলেন নি। তিনি চেয়েছেন, আমাদের সমস্ত আচরণই যেন যুক্তির দ্বারা শাসিত হয়। তিনি অনুভূতি বা আবেগের নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে, প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ বা আত্ম-সুখাকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমরা যেন আত্মসুখের জন্য আমাদের যুক্তিকে বিসর্জন না দিই ; যদি তা করি তবে আমরা নীতিভ্রষ্ট

হব।) Lillie এই বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, কাণ্টীয় প্রাসঙ্গিক মতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে কোন কাজে আমাদের যদি পক্ষপাতিত্ব বা সেই কাজ করার দিকে এক ধরনের প্রবণতা থাকে তবে তা নৈতিক মূল্যায়নের ব্যাপারে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয়। কাজটি আমাদের করতে হবে শুধুমাত্র কর্তব্য বোধের তাগিদে। It appears to be a truer interpretation of Kant's view to hold that the presence or absence of inclination is morally indifferent. The utmost that Kant could have held necessary is that for an action to be good, the agent would still do it from a sense of duty, even if the inclination to do it were not present in his mind.*

(কাণ্টীয় নীতিশাস্ত্রে আকারগত সঙ্গতিকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দেওয়া হয়েছে ; তাই সমালোচকেরা একে 'Formal' আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। কাণ্ট চেয়েছিলেন যে, নৈতিক আদর্শ হবে সুসঙ্গত এবং স্ববিরোধ মুক্ত। তার আদর্শে মানুষের দৈনন্দিন আচরণের বিধি সম্পর্কে কোন রকম নির্দেশ নেই। জটিল বাস্তব অবস্থার যথাযোগ্য পর্যালোচনা ব্যতীত মানুষের আচরণের যে ন্যায় অন্যায় বিচার করা যায় না এই সত্যটুকু সম্বন্ধে কাণ্ট তখন সচেতন ছিলেন না। তিনি তর্কশাস্ত্রের বিশুদ্ধ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু নৈতিক আদর্শকে যদি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা গ্রহণ না করতে পারি তবে সেই আদর্শ একান্তই শূন্যগর্ভ হবে। এই দুর্বলতাটুকু Jacobi, কাণ্ট কথিত তাঁর বিশুদ্ধ সৎ সংকল্প (The pure good will) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বললেন, কাণ্টের সৎ সংকল্প অন্তঃসার শূণ্য : 'It is a will that wills nothing'. তাঁর মতে কাণ্টের আদর্শ হল ভাব জগতের বস্তু, আমাদের বাস্তব জগতের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, পরিচয় নেই। কাণ্টের আদর্শ যে বাস্তব জগতের সঙ্গে নয়, এটা যে একান্তই ভাব জগতের বস্তু, এই তত্ত্বটি কাণ্টীয় সমালোচক উদ্ধার করলেন। যে জীবনের প্রয়োজনে লাগল না তার যে কোন ঐকান্তিক মূল্য নেই, মহাদার্শনিক কাণ্ট এই সত্যটুকু গ্রহণ করতে পারেন নি।)

'কাণ্টীয় যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যা একটি মানুষের জন্য শুভ বা কল্যাণ তা সব মানুষের জন্যই শুভ বা কল্যাণ রূপে গৃহীত হবে। নৈতিক বিধির প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নেই, কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। একটি সদা পরিবর্তনহীন বিধির বিধানই জটিল জীবনের

*An Introduction to Ethics. পৃ: ১৫৩

সমস্যাদি সম্পর্কে শেষ কথা বলতে পারে না। জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগের প্রয়োজনে আমরা যে সত্যকে স্বীকার করে নিই, তার ব্যতিক্রম স্বীকার করাও সমীচীন। যেমন, মিথ্যা কথা বলা অন্যায়, একথা সর্বজন স্বীকার্য। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয় না, এমন কথা বললেও পরিপূর্ণ সত্যটুকু বলা হল না। আমরা জানি যে বহুক্ষেত্রেই মিথ্যা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরাজী নীতি-শাস্ত্রে যাকে white lie বলা হয়েছে সেই ধরনের অনৃত ভাষণ, সেই ধরনের মিথ্যা কথায় সমাজের কল্যাণই সাধিত হয়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, সত্য কথা বলবে, প্রিয় বাক্য বলবে কিন্তু অপ্রিয় সত্য কখনও বলবে না ('সত্যম্ ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াদ্ সত্যম্প্রিয়ম্'।) অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনে আমরা অপ্রিয় সত্যকে সবসময় পরিত্যাগ করব।

কাণ্ট যে বাস্তব নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ আদর্শের বা আচরণ বিধির নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, তা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। তাঁর আচরণবিধির মান নির্ণয়ের মাপকাঠি হল সুসঙ্গতি বা (Self consistency) ; কিন্তু এই সুসঙ্গতি বা আত্ম-বিরোধিতার অভাবই কি আমাদের নৈতিক জীবনের আদর্শ বলে গৃহীত হতে পারে? বোধহয় পারে না। যে মানুষ বিশ্বাস করে যে, অপরকে বঞ্চনা করা ভালো এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জীবনভোর অপরকে ঠকিয়ে বেড়াল, তার চিন্তা ও কর্মে এই যে সুসঙ্গতি, এই সুসঙ্গতি কি তাকে নৈতিক প্রশংসার যোগ্য করে তুলবে?

কাণ্ট বললেন যে, আমরা এমন কোন ব্যবহার করব না, যে ব্যবহার সবাই করলে একটা অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের আচরণও অন্যায় আচরণ। অর্থাৎ কোন নৈতিক আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করতে গেলে, আমাদের দেখতে হবে যে সবাই যখন ওই ধরনের আচরণ করে, তখন জীবনের গতি অচল হয়ে পড়ে কি না। অবশ্য এই ধরনের যুক্তিতে ভ্রান্তি ঘটবার অবকাশ যথেষ্ট রয়েছে। কেননা, সবাই যদি জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন করে তাহলে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে কি একথা বলব যে, ব্রহ্মচর্য এইভাবে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে বলেই তা অনৈতিক এবং ব্রহ্মচর্য পালনে আমরা মানুষকে নিরস্ত করব। অতএব যদি আমরা শুধুমাত্র সঙ্গতিকে আমাদের নৈতিক আদর্শের নির্ণায়ক বলে মনে করি, স্ব-বিরোধ শূন্যতাই যদি আমাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ হয়, তাহলে সেই আদর্শ গ্রাহ্য হবে না, সেই আদর্শ জীবনে অস্তিবাচক আদর্শ নয়।

আমরা কাণ্টীয় নৈতিক দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলতে পারি যে, কাণ্টের শুধু মাত্র সঙ্গতির আদর্শে কোন গঠনমূলক অস্তিত্ববাদী আচরণের

নির্দেশ পাওয়া যায় না। আমরা যদি আমাদের আচরণকে সার্বিক আচরণের প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করতে পারি তাহলে নিজেই সেই আচরণকে নৈতিক আচরণ বলে গ্রহণ করব। অর্থাৎ যে কাজ সবাই করতে পারি, সেই কাজ অবশ্যই আমাদের নৈতিক অনুমোদন-সিদ্ধ। কিন্তু কোন একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে আমাদের কি ধরনের কাজ করা উচিত সে নির্দেশ কাণ্টীয় সঙ্গতির নীতির মধ্যে পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্রবিদ Mackenzie কাণ্টীয় নীতিদর্শনের এই দুর্বলতাটুকু উল্লেখ করে বললেন : কাণ্ট কথিত স্ববিরোধ যুক্তির তত্ত্ব বহু ক্ষেত্রেই আমাদের আচার আচরণের নিরাপদ অসমর্থক নিয়ন্তা রূপে কাজ করে। অবশ্য এই আত্ম-অবিরোধ সূত্রটিকে অবলম্বন ক'রে আমরা যদি আমাদের আচার আচরণের জন্য কোন সমর্থক নিয়ন্ত্রণ-নীতির উদ্ভাবনের চেষ্টা করি তবে আমাদের সে চেষ্টা ফলবতী হবে না। আমাদের কী করা উচিত নয় এ সম্বন্ধে কাণ্টীয় স্ব-বিরোধ যুক্তিতত্ত্ব আমাদের যথাযথ নির্দেশ দিলেও, আমাদের কী করা উচিত, এ সম্বন্ধে এই সূত্রটি কোন নির্দেশ দিতে পারে না। কেননা এই স্ববিরোধ যুক্তির সূত্রটি হ'ল একান্তভাবে আকারগত বা formal ; ('The principle of self consistency laid down by Kant affords in many cases a safe negative guide in conduct...when, however, we endeavour to extract positive guidance from the formula—when we try to ascertain by means of it, not merely what we should abstain from doing, but what we should do—it begins to appear that, it is merely a formal principle.')* অবশ্য অনেকে কাণ্টকে এই অসমর্থক সমালোচনার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে কাণ্টের নীতিশাস্ত্রে গঠনমূলক আচরণ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে। এই দলের প্রধান হলেন, Rashdall ; অবশ্য Rashdall-এর মতের বিরোধিতা করে Seth, Bradley, Dewey, Muirhead প্রমুখ দার্শনিকেরা বলেছেন যে, কাণ্ট এই ব্যাপারে বিশেষ সফল হন নি। Seth বললেন যে, কাণ্টীয় দর্শন হল নেতিবাচক ; আমাদের নৈতিক আদর্শ থেকে যদি আমরা আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দকে পরিপূর্ণরূপে বিসর্জন দিই তাহলে জীবনকে অস্বীকার করা হয়। আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, বাসনা-কামনাকে যদি জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে জীবনাদর্শের সঙ্গে মৃত্যুর আদর্শের বিশেষ কোন ভেদ থাকে না। Seth-এর কথা উদ্ধৃত করে দিই ; Seth এই আদর্শের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন : 'The ascetic ideal is thoroughly false and inadequate and must

*Mackenzie : A Manual of Ethics, পৃঃ ১৯২

always be corrected by the hedonistic...It is the ideal of death, rather than of life, of inactivity, rather than of activity...) প্রাণশক্তিতে ভরপুর সাধারণ মানুষ এই ধরনের মৃতকল্প আদর্শকে কখনই স্বীকার করে নিতে পারে না।

আমরা জানি, মানুষের নৈতিক আচার আচরণকে সবমেয়েই কোন না কোন নৈতিক আদর্শ বা বিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। অতএব বলা যেতে পারে যে, এই অর্থে সমস্ত নৈতিক আচরণই universal বা সার্বিক হলেও তা একটা বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আমাদের ন্যায়-অন্যায় আচরণের মধ্যেও কিছু পরিমাণে ব্যক্তি নির্ভরতা বা Subjectivity দেখা যায়। নৈতিক আচরণকে আমরা শিল্পীর সৃষ্ট কর্মের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কাণ্টের নৈতিক আদর্শ প্রেয়োবাদকে অতিক্রম করেও উচ্চতর আদর্শের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সেই আদর্শ হল একটা সত্তার সুসম্পূর্ণ বিকাশে রূপ, উচ্চতম আদর্শ।

Cynic ও Stoic আদর্শের আলোচনা :

প্রাচীন গ্রীস দেশে যেসব Cynic এর কথা আমরা পুস্তকে পড়েছি, তারা প্রায় সকলেই চরমপন্থী। এঁরা সৎ জীবন বলতে বুঝেছিলেন সুখে-দুঃখে অবিচলিত, যুক্তির দ্বারা চালিত জীবনধারা। যারা সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, যারা যশের আকাঙ্ক্ষা করে, তারা এইসব আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হয়। আর যে মানুষ কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, সে তার প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে কাজ করতে পারে। যিনি জ্ঞানী, তিনিই সুখী, তাই তিনি উদাসীন। যিনি স্বস্থ তিনিই সুস্থ। অর্থাৎ জ্ঞান এবং সুখ, এরা এক অর্থে সমার্থক। যিনি জ্ঞানী, তিনি যুক্তি আশ্রিত সঙ্গতিপূর্ণ জীবনের অধিকারী। যিনি সুখের সন্ধান করেন, তিনি ভ্রান্ত। Seth এই প্রসঙ্গে বললেন : সুখানুসন্ধান করা মূর্খের কাজ ; সুখী মানুষের জীবন হ'ল মূর্খ মানুষের জীবন। জ্ঞানী ব্যক্তি সুখের চেয়ে উন্মাদ মানুষের মত্ততাকে অধিকতর কাম্য বলে মনে করে। কেননা সুখের কামনা মানুষকে ভাগ্যের ক্রীতদাসে পরিণত করে ; মানুষ অবস্থার দাস হ'য়ে পড়ে।' (The life of pleasure is the life of folly, the wise man would rather be mad than be pleased. For pleasure makes man the slave of fortune, the servant of circumstances. Seth উদাসীন বলতে বুঝেছেন, সেই মানুষকে যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন এবং সুখে বিগতস্পৃহ। অবশ্য সিনিকদের এই সৌজন্য ও বিধি-বিধান বহির্ভূত

আচরণ সাধারণ মানুষের জন্য নয়। মানব প্রেমের প্রতি অবজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত যে আদর্শ তা কখনই সব মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। কাণ্টীয় নীতিদর্শনের সমগোত্রীয় এই সিনিক এবং ষ্টোয়িক নীতিদর্শন সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠে নি। ষ্টোয়িকেরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, বাহ্য প্রকৃতি এবং আন্তর প্রকৃতি এই দুয়ের পিছনে একটি সার্বিক বিধির শাসন বিদ্যমান। নৈতিক জীবন এই সার্বিক বিধির আনুগত্য স্বীকার করে। এই প্রসঙ্গে কাণ্টীয় মতবাদের সঙ্গে পরবর্তী যুগের হেগেলীয় মতবাদের সামীপ্য লক্ষ্য করা যায়। কাণ্টীয় নীতি দর্শনের মত ষ্টোয়িক নীতিদর্শনেও বলা হয়েছে যে, নিরাসক্ত প্রশান্তিই জীবনের কাম্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে জীবন এবং কর্মে বিশ্বাস করে, সে এই ধরনের কর্মবিমুখ নেতিবাচক আদর্শকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে না।

কাণ্টের নীতিদর্শনে আমরা একথা শিখেছি যে অপরকে উপায় (Means রূপে) গণ্য করা চলবেনা। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, জ্ঞান রাজ্যের বিস্তারের জন্য অনেকেই আত্মবিসর্জন দিয়েছে। তাহলে সময় বিশেষে আমাদের কাউকে কাউকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং তা করা হয়ে থাকে দেশের ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য। অতএব বলা চলে যে, সব সময়ই মানুষকে যে উপেয় হিসেবে দেখতে হবে সে কথা সত্য নয়। ক্ষেত্রবিশেষে আমরা মানুষকে উপায় এবং উপেয় এই দুই ভাবেই বিচার করি। অতএব বলা চলে যে কাণ্টীয় নীতি দর্শনে মানুষকে যে উপেয় রূপে গণ্য করতে বলা হল, সেই নৈতিক নির্দেশটিও সর্বথা গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা দরকার যে কাণ্টীয় মতবাদে আবেগ এবং অনুভূতিকে নৈতিক জীবন থেকে বর্জন করে দিয়ে মানুষের জীবনকে একেবারে কঠিন এবং নীরস ক'রে তোলে। কর্তব্যের সম্পাদন একটা কৃত্রিম ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়। এই কর্তব্যের ধারণা এবং তা সুষ্ঠুরূপে পালনের দায়িত্বটুকু যেন এসে পড়েছে বাইরে থেকে। পূর্বেই বলেছি যে, কাণ্ট তাঁর নীতি আদর্শের কোন ব্যতিক্রম স্বীকার করেন নি। নৈতিক আদর্শের ব্যতিক্রমকে স্বীকার করলে মানুষের নৈতিক আচরণের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না। কাণ্ট বললেন যে, আমরা যত জোরের সঙ্গে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে পারবো, কাজটা ততই ভাল হবে, তার নৈতিক গুণ ততই বৃদ্ধি পাবে। অতএব বলা চলে যে, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কর্তব্য বোধের বিরোধটা যত প্রবল আকার ধারণ করবে, কাজটার নৈতিক মূল্য ততই বেশী হবে। অবশ্য একথা কি ক্রমেই সত্য হয়ে উঠছে না যে অনুভূতি এবং কর্তব্য বোধের মধ্যে যে বিরোধ চলে সেই বিরোধই হল

মানুষের নৈতিক জীবনের ভিত্তি। যদি এই বিরোধের অবসান ঘটে তাহলে আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তিটাও দুরাশ্রিত হবে। এটা হল মানুষের স্বভাব বৈরাগ্যের দুর্জ্ঞেয়তা বা Paradox। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নীতিবিদ্যা বস্তুত: যে যুক্তিকে আশ্রয় করে, তা প্রধানত Individualistic বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। অতএব কাণ্টের মতে নৈতিক জীবনে ভালবাসার কোন স্থান নেই। প্রীতির উপরেই মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যের বন্ধনটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রীতির অনুভূতিটুকু ছাড়া আমরা অপরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না। অতএব কাণ্টের বিশুদ্ধযুক্তিবাদী নীতিদর্শনে মনুষ্য সমাজে আমরা একে অপরের সঙ্গে প্রীতির বাঁধনে আবদ্ধ হতে পারি না।

কাণ্টীয় নৈতিক বিধি বিধান সব ব্যাখ্যার অতীত (Inexplicable); কিন্তু এই নৈতিক বিধানকে কোন একটি মহত্তর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া কাণ্টিয় দর্শনে নৈতিক নির্দেশ মানার কোন অর্থই হয় না। অবশ্য যদি বলা যায় যে, Self-realisation বা আত্ম-উপলব্ধি হল এই নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য, তাহলে কাণ্টিয় নীতি দর্শনের একটা গভীরতর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। নৈতিক বিধিকে যদি আমরা সহজাত রূপে গ্রহণ করি তাহলে তার নির্দেশ পালনীয়। এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে এই নৈতিক বিধান স্ব স্বভাবে দুর্জ্ঞেয় বা ব্যাখ্যার অতীত। প্রকৃতপক্ষে কাণ্ট আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন, যে কাজ আমাদের মানবিক সত্যের সঙ্গে অসঙ্গত, সেই কাজ অন্যায় বা অনাচরণীয়। আপন সত্তার সঙ্গে সঙ্গতির কথা বলতে গিয়ে কাণ্ট প্রকৃতপক্ষে Perfectionism বা সম্পূর্ণতা-বাদকে প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন।

কাণ্ট যে ধর্ম এবং সুখকে এক করে দেখে সর্বাঙ্গীন কল্যাণের (Complete good) ধারণাটুকু গড়ে তুলেছেন তা এই অর্থেই সঙ্কীর্ণ। মানুষের এই সার্বিক কল্যাণের মধ্যে তার নৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যের একটা সমন্বয় ঘটে। অতএব কাণ্টীয় নীতি দর্শনে যে অনুভূতিকে বিসর্জন দেওয়ার কথা বলা হল তা বোধহয় সঙ্গত হয় নি।

যুক্তিবাদের গুণ (Merits of Rationalism)

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার যে, যুক্তিবাদ যথার্থই বলেছে যে, মানুষের জীবনের নিয়ন্তা হল যুক্তি বা বুদ্ধি। কিন্তু অনুভূতির জীবনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যুক্তিকে আশ্রয় করেছে বলেই কাণ্টীয় নীতি দর্শন ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছে। Reason বা যুক্তি নৈতিক জীবনের কাঠামোটাকে নির্দিষ্ট

করে দেয়, অনুভূতিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত ক'রে সে নৈতিক আদর্শের সত্য রূপায়ন ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিবাদ মানুষের কর্তব্য ও নৈতিক বাধ্য-বাধকতার ওপর জোর দেয়, নৈতিক আদর্শের রূপটুকু যুক্তিবাদ সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়। তৃতীয়তঃ, বুদ্ধি বৃত্তির প্রাধান্য মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক। যুক্তিবাদ বলে যে, অনুভূতির জীবনকে তার যুক্তি বুদ্ধি শাসিত জীবনের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে হবে। চতুর্থতঃ, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আত্ম-উপলব্ধির জন্য আত্ম-বিলোপ এবং আত্ম বিসর্জনের দরকার। জীবনে বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজন। বৈরাগ্য ছাড়া, সংযম ছাড়া মানুষের নৈতিক জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য এই ধরনের বৈরাগ্য প্রমুখ গুণগুলি মানুষের আত্ম-উপলব্ধির সহায়ক। আমাদের অনুভূতিগত জীবনের সঙ্গে আমাদের যুক্তিগত জীবনের সমন্বয় ক'রে এই Self-realisation বা আত্ম উপলব্ধির পথে যেতে হয়। কাণ্ট স্বীকার করেছেন, সুবিধা-বাদের দ্বারা এই ন্যায়ের ধর্ম নির্দিষ্ট হয় না। ন্যায় ধর্মের অবমূল্যায়ন কাণ্টের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেকটি মানুষের একধরনের দৈবী বিশুদ্ধতা রয়েছে। সেই দৈবী বিশুদ্ধতাই মানুষকে উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হবার পথের বাধা স্বরূপ ; কাণ্টীয় যুক্তিবাদে এই সত্যটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভগবদ্ গীতায় নীতিবাদ ও কাণ্টীয় নীতি-দর্শন

ভগবদ্ গীতা ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের যে তত্ত্ব প্রচার করলেন তার মধ্যে প্রধান হল নিষ্কামভাবে এই কর্তব্যের সম্পাদন করা। গীতা বললেন যে, মানুষকে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে ; কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই এই কর্তব্য সম্পাদন। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই কর্তব্যটুকু করার নীতি ভাগবত গীতায় এবং কাণ্টীয় নীতিদর্শনে সমানভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কাণ্টীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে গীতার কথিত কর্ম যোগের কয়েকটি বৈসাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমতঃ, গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবৎ প্রাপ্তিই হল পরমার্থ। অতএব আমাদের কর্তব্য করা উচিত এই ভগবৎ প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে। কাণ্টীয় দর্শনে এই ভগবৎ প্রাপ্তিকে পরমার্থ বলা হয় নি। দ্বিতীয়তঃ গীতায় বলা হল যে, 'লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অর্থাৎ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ এবং ঐক্যের জন্যই আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। যখন আমরা আমাদের কর্তব্য করি তখন আমাদের সমগ্র প্রাণী জগতের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে এই কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। তৃতীয়তঃ হিত এবং সুখ—এরা বিভিন্ন। ব্যক্তিগত কল্যাণ বলতে আমরা সামগ্রিক কল্যাণকে বুঝি, এবং

এই কল্যাণ সাধনই হল ভগবৎ প্রাপ্তির সোপান বিশেষ : একথা গীতায় বলা হ'ল। কাণ্ট বললেন যে, পরমার্থ হল সৎ ইচ্ছা ; আবার এই সৎ ইচ্ছাই হল ধর্ম। সৎ ইচ্ছাই ব্যক্তি মানুষের পক্ষে পরম কল্যাণকর। অর্থাৎ কাণ্ট যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বা Complete Good-এর কথা বললেন, তা হ'ল এই ধর্মের সঙ্গে সুখের সমন্বয় এবং এই ধর্মের সঙ্গে সুখের সমন্বয় করে যে পূর্ণ কল্যাণের ধারণা আমরা পাই তা ব্যক্তির পক্ষেও পূর্ণ কল্যাণ রূপে গ্রাহ্য। কাণ্ট যে 'Kingdom of Ends' বা উপেয়ের স্বর্গরাজ্যের কথা চিন্তা করেছেন তা ভাগবৎ গীতায় কথিত লোক সংগ্রহে'র সঙ্গে তুলনীয়। কাণ্টীয় নীতি-দর্শনে যাকে ন্যায় বলে, নৈতিক বিধি বলে আমরা গ্রহণ করব তা আমাদের কাছে ব্যতিক্রমহীন কর্তব্য রূপে প্রতিভাত হবে। ন্যায়কে ন্যায় বলে জানাই হল কল্যাণকে শুভকে জানার সমার্থক। তিনি শুভ বা কল্যাণকে ন্যায় বা Right-এর ঊর্ধে স্থান দেন নি।

কাণ্টীয় নীতি দর্শন হ'ল বিধিবদ্ধ ধর্ম ; একে Jural (Legal) বলা হয়েছে। কিন্তু গীতার নীতিদর্শন হল আত্মাভিমুখী (Teleological)। কাণ্টের নীতিদর্শন হল ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং গীতার নীতিদর্শন হল সার্বিক। আমরা এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, কাণ্টীয় নাতিদর্শন হল সন্ন্যাসের বৈরাগ্য লাঞ্ছিত কিন্তু গীতার নৈতিক আদর্শ সন্ন্যাসীর আদর্শ নয়। কাণ্ট বললেন যে, আমাদের নৈতিক জীবনে অনুভূতি এবং আবেগকে খর্ব করে রাখতে হবে। গীতার নীতিদর্শনে কিন্তু এই অনুভূতি এবং আবেগের বিনাশ সাধনের নির্দেশ নেই। গীতায় আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতির যেমন দমনের কথা বলা হয়েছে তেমনি আবার জীবে প্রেম, আর্তের জন্য দয়া এবং সেবার কথা, পাপীকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে; শান্তি, বৈরাগ্য, ঈশ্বর প্রীতি প্রমুখ সদ্‌গুণের বিবর্ধনের নির্দেশও দেওয়া আছে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালো-বাসা, সর্ব প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা, এবং ভগবৎ প্রেম-এসবই আমাদের চেষ্টা করে অর্জন করতে হবে ; আমাদের অনুভূতিকে শান্ত ক'রে, আমাদের ভগবৎ প্রেমের পথে অগ্রসর হতে হবে ; একথা গীতায় বলা হল। কিন্তু কাণ্টীয় নীতিশাস্ত্র সন্ন্যাসের দ্বারা চিহ্নিত। গীতায় বলা হল যে, ভগবানকে পেতে হলে, মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে ভগবানকে পেতে হবে। মানুষের মঙ্গলের জন্য আমার যে নৈতিক কর্তব্যটুকু করা উচিত সে কর্তব্য আমাকে করতে হবে ; গীতায় এই নির্দেশ দেওয়া হল।

গীতার নীতিদর্শনে আধ্যাত্মিকতার সুর অনুরণিত ; কাণ্টীয় নীতি দর্শনের সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নেই। ভাগবত গীতা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ

ভক্তিযোগের শিক্ষা দেয়। কর্মই হল ভগবৎ সেবা; ইহাই হল কর্ম-যোগের শিক্ষা। জ্ঞানের পথই হল জ্ঞান যোগ এবং ভক্তির পথই হল ভক্তি-যোগ। এই তিনটি পথই হল ভগবান লাভের পথ। কাণ্টীয় নীতিদর্শনে জ্ঞান এবং ভক্তির কোন কথাই নেই। অতএব বলা চলে, কাণ্টীয় নীতিদর্শন এবং ভাগবৎ গীতার নীতিদর্শনের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, সেই সৌসাদৃশ্যটুকু হল একান্তভাবে কৃত্রিম। কাণ্টীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে গীতার নীতিদর্শনের যে সাদৃশ্য আছে, তার থেকে বেশী সৌসাদৃশ্য রয়েছে Euduaemonism বা সম্পূর্ণতাবাদের সঙ্গে।

গীতায় কর্মযোগের আদর্শ : নিষ্কাম কর্ম

এই প্রসঙ্গে আমরা ভাগবত গীতায় ব্যাখ্যাত কর্মযোগ ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শের বিস্তারিত আলোচনায় আত্মনিয়োগ করতে পারি। গীতায় বলা হল কর্ম হল নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে শ্রেয়। কর্মের উপরই জীবন নির্ভরশীল। আমরা সবসময়ই কাজ করি; কাজের অভাব অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তাই হল মৃত্যু। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি বর্ণের মানুষ সমাজে রয়েছে। এই জাতি-ভেদ হল গুণ এবং কর্মকে আশ্রয় ক'রে; আমাদের মানসিক প্রবৃত্তির শুদ্ধতা, কর্মশক্তি, অজ্ঞানতা—এই সব বৃত্তিগুলি বিভিন্ন পরিমাণে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের চরিত্র গঠন করে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে সত্ব গুণের প্রাধান্য, ক্ষত্রিয়ের জীবনে সত্বগুণের উপর রজোগুণ প্রাধান্য পায়। বৈশ্যদের জীবনেও রজোগুণের প্রাধান্য এবং এক্ষেত্রে রজো তমোগুণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। শুদ্রদের মধ্যেও তমোগুণের প্রাধান্য এবং সেক্ষেত্রে তমোগুণ রজোগুণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তারপর এই বিভিন্ন জাতির মানুষের কর্তব্য নির্ধারিত হয় তাদের মানসিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে। এই কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই তারা নিজ নিজ কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ সাধনা করে। এক জাতি অপরের, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রের বা শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্পাদন করতে চায়, তাহলে কিন্তু সমাজে বিপর্যয় ঘটবে। এই প্রসঙ্গে আমরা ব্রাডলির কথা উল্লেখ করতে পারি। ব্রাডলির 'My station and its duty' তত্ত্ব বলছে আমার সামাজিক অবস্থা—আমার কর্তব্যের নির্ণায়ক। এই তত্ত্বই প্রকৃতপক্ষে গীতায় ও প্রচারিত হয়েছিল। এক কথায় বলা চলে যে, প্রত্যেকটি মানুষ তার বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতা নিয়ে চলেছে এবং তার বিশেষ মানসিক ক্ষমতা এবং প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই ভগবান তাকে

সমাজের একটা বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার ফলে তার কর্তব্য এবং কর্মও নির্ণীত হয়েছে। সমাজে তার স্থান অনুযায়ী সে আপন কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করলেই সে সমাজের কল্যাণ করবে এবং সেই সমাজের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে আত্ম উপলব্ধির পথে অগ্রসর হবে। গীতা প্রত্যেকটি মানুষের 'স্বভাব' অনুযায়ী যে 'ধর্মের' কথা ভেবেছেন, তার অনুরূপ কথাই ব্র্যাডলি সাহেব বলেছেন। কেবলমাত্র তফাৎ হল এই যে, গীতায় কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেওয়া হল লোক সংগ্রহ এবং ভগবৎ প্রাপ্তির আশায়। কিন্তু ব্র্যাডলি সাহেব বললেন যে, মানুষ তার অনন্ত আত্মার উপলব্ধির জন্য তার কর্তব্য সম্পাদন করবে এবং সেই কর্তব্যটুকু নির্ধারিত হবে সমাজে তার স্থান এবং প্রতিষ্ঠার দ্বারা।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রমুখ চতুর্বর্ণ মানুষের বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। ব্রাহ্মণ, সে ইন্দ্রিয় সংযম করবে, সে মনকে সংযত করবে, পবিত্র জীবন যাপন করবে; অপরকে ক্ষমা করবে; সে জ্ঞানী হবে; বিশ্বাসী হবে এবং কুটিল হবে না। ক্ষত্রিয়েরা বীর হবে, তাদের মধ্যে দৃঢ়তা থাকবে, কর্ম-কুশলতা থাকবে; তারা একনিষ্ঠ হবে এবং তারা দেশ শাসনের এবং প্রজারঞ্জক শাসক হবার স্বপ্ন দেখবে। বৈশ্যেরা গোপালন করবে, চাষাবাদ করবে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবে। শূদ্রেরা উচ্চবর্ণের সেবা করবে। গুণ অনুসারে এই চতুর্বর্ণ মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বর্ণ বিভাগ কিন্তু বংশগত বলে তখনও নির্দিষ্ট হয় নি। ব্যক্তি মানুষ তার পূর্ণতা খুঁজে পাবে আপন আপন কর্তব্যের সম্পাদন দ্বারা! এই মানুষের সেবা করাই ভগবানের কাজ করা। যে মানুষটি তার নিজের কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন করতে পারল না, সে অপর একজন থেকে নিকৃষ্ট। কেননা, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কর্তব্যটুকু যথাযথ পালন করেছে। ফলের আশা না রেখে চরম নিস্পৃহতার সঙ্গে আমরা আমাদের কর্তব্য করব। কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে আমাদের অধিকার নেই। আমরা আমাদের পূর্ব নির্দিষ্ট কর্তব্য-টুকু নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন করব। ফল ভগবানের ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল। কর্মের ফলটুকু ভগবানে সমর্পণ করতে হবে। যাদের মধ্যে এই ফলাকাঙ্ক্ষা প্রবল, তারা আমাদের করুণার পাত্র। কর্ম এবং কর্মফল সবই ভগবানে সমর্পণ করতে হবে। কাজ করার কথা আমাদের; আমরা কাজ করে যাব। বিফল হই কি সফল হই সেদিকে লক্ষ্য রেখে কর্মের পথে অগ্রসর হলে চলবে না। ফলাকাঙ্ক্ষাই তো বন্ধনের কারণ। যদি আমরা সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি তাহলে আমাদের মনে অক্ষুণ্ণ শান্তি থাকবে। গীতায় তাকেই যোগ

বা সন্ন্যাস বলা হয়েছে। যিনি সবরকম ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে পেরেছেন এই নিস্পৃহ অবস্থায় তিনি তার পূর্ব নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি সম্পন্ন করতে পারেন। ইনিই প্রকৃত যোগী বা সন্ন্যাসী। সত্যিকারের বৈরাগ্য হল ফলাকাঙ্ক্ষার প্রতি বীতরাগ। গীতার নীতি দর্শনে সুখবোধের বা প্রয়োজন বোধের স্থান নেই।

ভালবাসা, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, অহংবোধ, কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, আত্ম-প্রসাদ, ভণ্ডামি প্রমুখ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে আমরা যেন কোন কাজ না করি ; একথা গীতায় বলা হল। মনের প্রশান্তি অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে ; জীবনে সফল বা বিফল হবার আনন্দ বা বেদনাকে জয় করতে হবে। জয়-পরাজয় সবই সমান হয়ে উঠবে অর্থাৎ এক কথায় জয়ের অমৃত আনন্দ ও পরাজয়ের মিথ্যা গ্লানি এই দুটিকেই বর্জন করতে হবে। আমাদের সমস্ত অহংবোধকে ভগবানের দিকে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের দিকে চালিত করতে হবে। আমাদের এই ধরনের একটা ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষাকে অপরের কল্যাণ ধর্মে দীক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ নিজের সুখ না চেয়ে আমরা যেন অপরের কল্যাণ চাই। এই অপরের কল্যাণের প্রতি, অপরের মঙ্গলের প্রতি যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা—এখানেই গীতার নীতিদর্শন এবং কাণ্টের নীতিদর্শনে সঙ্গতি রয়েছে। তবে কাণ্টের নীতিদর্শনের বৈপরীত্যে গীতায় কিন্তু ভালবাসা, সদিচ্ছা, শুভ কামনা, আর্তের জন্য দয়া, দুষ্টকে ক্ষমা করা, বিনয়, নম্রতা, সত্যবাদিতা এই সব গুণের বিবর্ধনের জন্য গীতা বললেন। আমরা যে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে আপনার ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকি, সেই গণ্ডীটুকু অতিক্রম করতে হবে। যে প্রেম, যে ভালবাসা আমরা পরিবার পরিজনদের জন্য সঞ্চিত করে রাখি তাকে সকলের জন্য ভালবাসায় পরিণত করতে হবে। সবার কল্যাণেই আমার কল্যাণ, সমগ্র মানবের কল্যাণই যে ব্যক্তি মানষের কল্যাণ, এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। স্বার্থগন্ধহীন যে মানবতাবোধ সেই মানবতাবোধের চর্চা করতে হবে। আমাদের মনে যেসব ধারণা, যেসব ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ঘিরে নিয়ত আবর্তিত হয়, সেই ইচ্ছা-গুলিকে ব্যক্তি স্বার্থের গণ্ডী থেকে টেনে তুলে সমাজ কল্যাণের কাজে লাগাতে হবে। কর্মফল পরিত্যাগ করতে গিয়ে কর্ম ত্যাগ করলে চলবে না। কেননা কর্ম ছাড়া আমাদের পূর্ণ হবার কোন পথ নেই। আমরা যদি আমাদের কর্ম-ফলকে ত্যাগ করতে পারি তাহলেই আমরা যথার্থ বৈরাগ্যের পথে ভগবানকে লাভ করতে পারব। আমরা আমাদের স্বার্থগন্ধহীন জীবন-চর্যার মধ্যে দিয়ে শুধু কর্তব্যটুকু যদি ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি তাহলে যথার্থ গীতার আদর্শ অনুসরণ করতে পারব।

গীতার যে নীতিদর্শন, তা হ'ল কর্ম কেন্দ্রিক। নিষ্ক্রিয়তার নীতিদর্শন গীতার নীতিদর্শন নয়। গীতার নীতিদর্শন সমাজ বিরোধী নয়। সমাজের কল্যাণ গীতার নীতিদর্শনের লক্ষ্য। জীবন থেকে পালিয়ে যাবার পথ গীতা দেখায় না। গীতা কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখার শিক্ষা দিয়েছে মানুষকে। ব্যক্তি মানুষের যে পুরুষার্থ, যে ব্যক্তিগত কল্যাণ তাই-ই হ'ল সমগ্র মানুষের কল্যাণ। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নৈতিক আদর্শ শেষ পর্যন্ত ভগবৎ উপলব্ধিতে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। অতএব বলা চলে যে, কাণ্টীয় নীতিদর্শনের মত গীতার নীতিদর্শন সন্ন্যাসের প্রচার করে না। এই প্রসঙ্গে এই কথা বলা দরকার যে, বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড এবং উৎসবাদির বিধান গীতায় নেই। মানুষের মনের কলুষ, বাইরের ক্রিয়াকর্মের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। আমাদের মনের অভিলাষ ও বাসনা এবং উদ্দেশ্যের যে শুচিতা রয়েছে তাদের সমন্বয় ঘটাতে হবে—এই কথাই গীতায় বলা হয়েছে। আমাদের ইচ্ছাকে নৈতিক মর্যাদায় ভাস্বর ক'রে তাকে ভগবানের কাছে সমর্পণের যোগ্য ক'রে তুলতে হবে—

'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি'

মানুষ তার আপন ইচ্ছাকে ভগবৎ ইচ্ছায় লীন করে দেবে। অনন্ত যে শক্তি সেই শক্তির সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থ্যের সমন্বয় ঘটাতে হবে। ব্যক্তির সীমিত ইচ্ছা, ভগবানের অনন্ত ইচ্ছার মধ্যে সার্থকতা খুঁজে পাবে, একথা গীতা বললেন। বিনয়, নম্রতা, ক্ষমা, সেবা আত্মসংযম, ভোগ, ঔদাসীন্য, অহংবোধের অভাব এবং পরহিত প্রভৃতি মহৎ গুণের চর্যা করার জন্য গীতায় নির্দেশ দেওয়া হল। এই নির্দেশ যথাযথ পালন করলেই ব্যক্তি মানুষ আপনাকে ভগবৎ ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ ক'রে তার আত্ম-উপলব্ধির পথ প্রশস্ত করতে পারবে। এ হ'ল গীতার শিক্ষা।

দশম অধ্যায়

পরিপূর্ণতাবাদ (Perfectionism or Eudaemonism)

পরিপূর্ণতাবাদ বা সম্পূর্ণতাবাদের ব্যাখ্যা—আত্মউপলব্ধির ধারণা ও ব্যাখ্যা—উপনিষদ, গীতা ও রবীন্দ্রনাথ—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ও পৃথক ব্যক্তিত্ব—সম্পূর্ণতাবাদের কয়েকটি সাংকেতিক সূত্র—সম্পূর্ণতাবাদের দার্শনিক ভিত্তির ব্যাখ্যা ও তার সমালোচনা।

দশম অধ্যায়

পরিপূর্ণতাবাদ বা Perfectionism or Eudaemonism

প্রেয়োবাদীরা মানুষের প্রাণী স্বভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তার ফলেই সুখের আকাঙ্ক্ষাকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন। প্রেয়োবাদীরা এই আদর্শের নির্দেশনায় শুধুমাত্র মানুষের প্রাণীত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন ; যে যুক্তির বলে মানুষ মনুষ্য পদ বাচ্য হয়, সেই যুক্তিকে তারা সম্পূর্ণ-রূপে উপেক্ষা করেছেন। প্রেয়োবাদীরা বিপরীত মত পোষণ করলেন ; যুক্তিবাদারা মানুষের যুক্তি বিচারের উপর জোর দিলেন। জৈব প্রকৃতিটি যদি যুক্তির বিরোধী হয়, তাহলে সেই জৈব প্রকৃতিকে দমন করতে হবে, একথা তাঁরা বললেন। তাঁদের আদর্শ হল ইন্দ্রিয়দমন। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রেয়োবাদ এবং যুক্তিবাদ এই দুইটি মতবাদই মনুষ্য প্রকৃতির একটি দিককে মাত্র দেখেছেন। অতএব তাদের দেখা অসম্পূর্ণ দেখা। মানুষ শুধুমাত্র অনুভূতি-সম্পন্ন জীবই নয় ; সুখান্বেষণই তার একমাত্র কাম্য নয়। আবার মানুষ কায়া-হান যুক্তি মাত্রও নয়। দেহকে স্বীকার করে নিলে যুক্তি, বিচার, ইন্দ্রিয়শাসন ও আত্ম সংযমকে একই সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয়। ইন্দ্রিয়শাসন ও আত্ম সংযমের প্রশ্নটি তখনই ওঠে, যখন আমরা মানুষের অনুভূতির জীবনকে স্বীকার করি। অতএব মানুষের অনুভূতিগত জীবন, মানুষের যুক্তি শাসিত জীবন, এই দুটি জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে এদের সমন্বয় ঘটানোর মধ্যেই মানুষের যথার্থ নৈতিক আদর্শ লুককায়িত আছে। ভোগ এবং ত্যাগ—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—এই দুই তত্ত্বের সমন্বয়ের মধ্যেই মানুষের যথার্থ নৈতিক আদর্শ, অবস্থিত। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি (Sensibility) এবং বিচার-বুদ্ধি (Reason), এদের পৃথক করা চলে না ; এরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে অবস্থিত নয়। এই দুটিকে সমন্বিত ক'রে মনুষ্য চরিত্রের বিকাশ ঘটে। এই যুক্তি সমন্বিত রূপটাই হল মানুষের যথার্থ চরিত্র রূপ। এর একটিকে অস্বীকার ক'রে প্রেয়োবাদ যেমন খঞ্জ হয়ে পড়েছে, অনুভূতিকে অস্বীকার করে যুক্তিবাদও তেমনি পঙ্গু হয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন উঠবে, আমরা কি এই দুটির যথার্থ সমন্বয় ঘটাতে পারি? পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ মানুষের সমগ্র জীবন দর্শনকে স্বীকার করে। সেই আদর্শ একদিকে যেমন মানুষের জৈব প্রকৃতিকে স্বীকার করে, অন্যদিকে তার

যুক্তিকেও অস্বীকার করে না। অতএব মানুষের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ একদিকে যেমন ভোগী মানুষকে স্বীকার করে তেমনি সে ত্যাগী মানুষকেও অস্বীকার করে না। এই আদর্শকে বলা হয়েছে পরিপূর্ণতাবাদ বা Perfectionism। আত্ম-প্রতিষ্ঠাবাদ (Ideal of self realisation) অথবা পূর্ণ ব্যক্তিত্ববাদ (Ideal of personality) এইসব আখ্যায় ও আখ্যাত করা হয়েছে পরিপূর্ণতাবাদকে।

পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ হল পরিপূর্ণ আনন্দ ; এই তত্ত্ব পরিবেশন করেছিলেন মহাদার্শনিক এরিষ্টটল। পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বই পরিপূর্ণ আনন্দের দ্যোতক। এই তত্ত্ব অনুসরণ করেই পরিপূর্ণতাবাদকে আনন্দবাদ বা Eudaemonism বলা হয়েছে। মানুষের পূর্ণতম আনন্দ তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে, তার সকল শক্তির স্ফুরণে। এই আত্মবিকাশই হল মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ এবং পরম গৌরব। এরিষ্টটল একেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেছেন। নীতিশাস্ত্রবিদ Lillie এই প্রসঙ্গে বললেন: গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল গ্রীক Eudaemonia শব্দটির ব্যবহার ক'রেছেন ; এর অর্থ হ'ল সুখ এবং এই সুখকে তিনি সকল নৈতিক কর্মের লক্ষ্য ব'লে নির্দিষ্ট করেছেন। আত্ম-উপলব্ধির সঙ্গে এই সুখকে যুক্ত ক'রে এক ধরনের নৈতিক আদর্শের তত্ত্ব প্রচার করলেন এই Eudaemonist নামধেয় নীতিশাস্ত্রবিদেরা। আমরা এরিষ্টটল কথিত যুক্তির অনুসরণ ক'রে বলতে পারি–যে Eudaemonism মানুষের আত্মউপলব্ধির সঙ্গে সুখকে যুক্ত এবং সমন্বিত ক'রে এক ধরনের নৈতিক আদর্শের কথা বলল। এই আত্মউপলব্ধির অর্থ হ'ল মানুষের সামগ্রিক প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন করা। ; মানুষ তার আপন প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন করলে অর্থাৎ তার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটালে তখনই সে পূর্ণ সুখের সন্ধানটুকুও পাবে। ("Aristotle used eudaemonia the Greek word for 'happiness' to describe the moral end and the name 'eudaemonism' is used for a group of moral theories, which connect the state of happiness with the process of self realisation. We may define eudaemonism as the ethical theory which regards the moral end as the perfection of the total nature of man, involving his fullest happiness in the realisation of his capacities."* এ হল গ্রীক আদর্শ, এবং সেই আদর্শ সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিষ্টটল-এর মত মহামনীষীরা সমর্থন করেছিলেন। তাঁদের মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বিচার বুদ্ধির

*An Introduction to Ethics, পৃ: ২০৪

দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত নৈতিক আদর্শের এবং পরিপূর্ণ আনন্দের আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে। অসংযত ইন্দ্রিয় মানুষের দুঃখের কারণ। আদর্শ জীবন শুদ্ধ, শান্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত; তা ভাগবত জীবনের প্রতিরূপ। মানুষের দৈহিক আকাঙ্খাকে অস্বীকার করা যায় না। প্রবৃত্তি মাত্রই পাপ নয়। তবে তার মাত্রা অতিক্রম করা অন্যায়। প্রয়োজনের মিতাচারই হল ন্যায়ানুগ এবং প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে আপন সীমাকে যখন লঙ্ঘন করে, বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তখনই তাকে পাপ বলা হয়েছে, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এই তথ্য ব্যাখ্যাত:

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার: স উচ্যতে॥

অর্থাৎ, যে ভ্রান্ত মতি মানুষ হাত-পা প্রমুখ সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে অলস করে রেখে চুপ করে বসে থাকে অথচ মনে মনে ইন্দ্রিয়জ কামের কথা চিন্তা করে সে ব্যক্তি মিথ্যা আচরণ করে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, ভাগবত গীতায় কর্ম ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয় নি; কর্মযোগের তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে। বাসনা কামনাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে মানুষ তার পূর্ণতা লাভ করতে পারে না: ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে বিচার এবং যুক্তিকে সম্পূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করলেও ইন্দ্রিয় আবেগকেও স্বীকার করতে হবে, তার শক্তিকে আপন সীমার মধ্যে কাজ করতে দিতে হবে। বিচার যখন মানুষের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, ইন্দ্রিয় আবেগকে সংযত করে তখন আমরা যে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের আদর্শ পাই তা হ'ল তার পূর্ণতম বিকাশের উপযোগী বাস্তব আদর্শ। বাস্তব আদর্শ বলতে আমরা একথাই বুঝি যে, মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানষের পশু জীবন এবং যুক্তির জাবনকে স্বীকার করেই এই আদর্শকে রূপায়িত করা চলে। আমরা যে গ্রীক দর্শনের পরিপূর্ণ আনন্দের আদর্শকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি সেই আনন্দ কিন্তু পশ্চিম দেশীয় নীতিশাস্ত্রের সুখ বা Pleasure নয়। এই আনন্দের রূপ তার সুসঙ্গতায় তার পরিপূর্ণতায়; সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় সুখের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ে এই আনন্দ; বিশ্ব জগতের চলার ছন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার আনন্দই হ'ল এই আনন্দ। এই আনন্দকে উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে:

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি॥'

প্রেয়োবাদ আমাদের শিখিয়েছিল ইন্দ্রিয়ের কাছে আত্মসমর্পন করতে; যুক্তিবাদে বলা হল, ইন্দ্রিয় দমন করতে; কিন্তু পরিপূর্ণতাবাদের উদ্দেশ্য হল মানুষের

আত্মবিকাশ ঘটানো এবং সেই আত্মবিকাশের পথেই বিশুদ্ধ আনন্দ আস্বাদন করা।

এইযে আত্মবিকাশের কথা আমরা বললাম, এখানে এই 'আত্ম' বলতে আমরা কি বুঝি? দেহকে যে 'আত্মা' অর্থাৎ যে 'আত্মাকে' নিছক দেহগত বলে ভাবে, দেহের সুখে সুখী হয় দেহের দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে একি সেই আত্মা? প্রেয়োবাদ হয়তো এই আত্মার কথা বলে। যুক্তিবাদ বলবে Rational Self বা যুক্তি আশ্রিত আত্মার কথা; অর্থাৎ মানুষের যে সত্তা শুধু যুক্তিকে আশ্রয় করে থাকে। বুদ্ধিজীবী মানুষ কী যুক্তিবাদকে গ্রহণ করবে। সুখবাদ ও যুক্তিবাদ, এই দুই ধরনের বিচারই বল একদেশদর্শী। কাজেই পরিপূর্ণতাবাদ বলবে সেই আত্মার কথা যে আত্মা যুক্তির অধীন এবং ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্যুত নয়। এই সমন্বয়ের আদর্শকে আমরা ঔপনিষদিক বলে গ্রহণ করতে পারি। এই আদর্শ নেতিবাচক নয়, নিষ্ক্রিয়ও নয়; সংসার ত্যাগের আদর্শ ও পরিপূর্ণতাবাদের আদর্শ নয়:

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

অতএব বলা চলে যে, মানুষের উদ্যম এবং চেষ্টা এবং যুক্তিবাদ ও বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই আমরা এই পরিপূর্ণতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ও পৃথক ব্যক্তিত্ব (Individuality and Personality)

মানুষ মাত্রেই ব্যক্তি বা Person কী না এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের অন্ত নেই। ব্যক্তিত্বের সম্যক প্রয়োজনীয়তা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্বীকৃত। যদিও ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা কি বুঝি, সেটা খুব পরিষ্কার নয়। আমরা জানি যে, আইনগত বিচার বিবেচনায় যেসব বস্তুতে প্রাণ নেই তাদেরও ব্যক্তিত্ব অর্পণ করা হয়। যেমন মন্দির মসজিদ প্রমুখ সংস্থাকে আইনের চোখে ব্যক্তি বলে গ্রহণ করা হয়। যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়, তাকে বলা হয় Legal fiction। এই যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য, এই পার্থক্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিন্তু পার্থক্যের দাবী ও স্বাতন্ত্র্যের দাবী এক নয়। জড় জগতের মধ্যে অবশ্য এই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য, উভয়বিধ গুণকে দেখা যায়। দ্রব্যের Impenetrability হ'ল তার অন্যতম মৌলিক গুণ বা Primary Quality। এই গুণটি তার পৃথকত্বের নির্দেশক; আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শনও বটে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব বা Personality শুধুমাত্র

পৃথকত্ব নয়। পশুর পৃথকত্ববোধ তার ব্যক্তিত্ব নয়, কেন না ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা বুঝি, বিভিন্ন প্রবৃত্তি, আবেগ, কর্মোদ্যম ও চিন্তা যখন সুসমন্বিত হয়ে একটি সংহত কেন্দ্রে বিধৃত হয়ে থাকে তাকে। পশুর মধ্যে এই সুসংহত কেন্দ্রের ঐক্যটির অভাব। এই ঐক্য কেন্দ্রের মধ্যমনি হল মানুষের আত্ম-চেতনা (Self consciousness)। আর বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম এবং আবেগ, অনুভূতি সংহতি লাভ করে, ঐক্য লাভ করে এই আত্ম-চেতনার মাধ্যমে। আত্ম চেতনার অধীশ্বর বলে মানুষ তার আবেগগত জীবনকে চিন্তার সার্বিক বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। ব্যক্তি মানুষ আত্মশাসিত তাই সে বিশ্ব বিধানের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্ব বিধান যেমন নৈর্ব্যক্তিক, মানুষের মধ্যে যে সার্বিক বিচার বুদ্ধি কাজ করে তাও তেমনি নৈর্ব্যক্তিক। তাই তার নৈতিক বিচার-বিবেচনার আদর্শ উচ্চতর আদর্শ রূপে গৃহীত হয়। এই যে ব্যক্তিত্বের কথা আমরা বললাম, এই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা অনলস পরিশ্রম এবং উদ্যমের ফলশ্রুতি। দীর্ঘদিনের অনুশীলনও অভ্যাসের ফলে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দুঃখ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করি। যে জীবন সহজ জীবন, যে জীবন সহজ সুখকে আশ্রয় করে, সেই জীবন নীতি-আশ্রিত নয়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমি দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে, মহৎ জীবনে যার অধিকার'। এই মহৎ জীবনই হল নীতি আশ্রিত জীবন ; কঠিন দুঃখের মূল্যে মানুষের এই ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। হেগেল-পন্থী Caird এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন ; 'আত্মসচেতন মানুষের ধর্মই হ'ল যে সে নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ; নিজের মধ্যেই সে তার প্রতিপক্ষকে সৃষ্টি করে এবং নিজের সৃষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর লড়াই ক'রে সে আপন আত্মার স্বাধীনতাটুকু অর্জন করে ; এইভাবে তার অন্তরের প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের পশু প্রবৃত্তির সঙ্গে তার আত্মিক শক্তির এই লড়াই, তার যুক্তির সঙ্গে নৈতিক প্রেরণার দ্বন্দ্ব, তার নিম্নতর পশুসত্তার সঙ্গে উর্ধতর মানব সত্তার সংগ্রাম—এই অবস্থা থেকে কোন যুক্তি-বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মসচেতন মানুষেরই মুক্তি নেই।' ("It is the very essence of a self conscious nature to be divided against itself and to win its perfection, its ideal freedom and harmony, as the result of a fierce and protracted internal strife. The conflict of nature and spirit, of impulse with reason, of the lower with the higher self, is one from which, for a rational and self conscious being, there is no escape.")*

* তাঁর Philosophy of Reason গ্রন্থের ২৫১-২৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ মানুষ, আত্মসচেতন মানুষ তার জীবন ও মননের অন্তর্দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে। মানসিক এই অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ নেই। এই দ্বন্দ্বে জয়ী হয়ে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজকে স্বীকার করে সমাজ জীবনের মাধ্যমে এই পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করা যায়। সমাজ জীবনের বাইরে এই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সভব নয়। তাইতো নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসী Alexander Selkirk স্বগতোক্তি করলেন, 'Society friendship and love divinely bestowed upon man।' সমাজ ছাড়া বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা এরা উভয়েই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। প্রতিবেশীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামাজিক পরিবেশে মানুষ তার পরিপূর্ণ সত্তাকে খুঁজে পায়। সকলের সঙ্গে যোগে, সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়েই মানুষ তার পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই তো মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই প্রার্থনা শুনি :

'যুক্ত করহে সবার সঙ্গে
মুক্ত করহে বন্ধ।'

সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যেকার 'ছোট আমি' এবং 'বড় আমি', এই দুটির সম্মিলন ঘটাতে হবে। অতএব এই আত্মপর ভেদটুকু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পরিপূর্ণতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, এই তত্ত্বে স্বার্থ বা ব্যক্তি সুখ বা Egoism এবং পরসুখ অথবা altruism এদের সমন্বয় ঘটানো যেতে পারে। প্রেয়োবাদ এবং যুক্তিবাদ এদেরও মিলন স্থল হল এই সম্পূর্ণতাবাদ। অতএব বলা চলে যে, সম্পূর্ণতাবাদ আত্মসুখ এবং পরসুখ, অনুভূতি ও যুক্তি, ব্যক্তি মানুষ ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে। আর তা পারে বলেই এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণতাবাদ আখ্যায় আখ্যাত করা হয়েছে।

সম্পূর্ণতাবাদের কয়েকটি সাঙ্কেতিক সূত্র :

Be a person, অর্থাৎ মানুষ হও। কি করে মানুষ হওয়া যায় তার আলোচনা প্রসঙ্গে নীতিশাস্ত্রবিদ ম্যাকেঞ্জি বললেন যে, আমাদের জৈব ছোট 'আমিটাকে' যখন আমরা আত্মিক বড় 'আমির' কাছে উৎসর্গ করে দিতে পারি তখন তাকে বলা হয়, আত্ম-উৎসর্গীকরণ। তার কথা উদ্ধৃত করে দিই : 'আমাদের আদর্শ সত্তা সমাজ জীবনের মধ্যে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে, সমাজ জীবনকে আশ্রয় ক'রে তা আমাদের সামনে প্রমূর্ত হয়। আমাদের আদর্শ জীবন আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে মধুর সম্বন্ধ বন্ধনের মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে থাকে। এই আদর্শ জীবনই হ'ল আমাদের মধ্যে সেই বড় আমিটার উপলব্ধি। কোন

একজন ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে সেই বড় আমি বা আদর্শ মানব-সত্তার দেখা পাওয়া যায় না। তার পরিপূর্ণ রূপটি দেখা যায় সমাজের সকল মানুষের মিলনে। সামাজিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে, সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধতার আদর্শের মাধ্যমে আমরা পূর্ণতম কল্যাণের স্বরূপটুকু উপলব্ধি করতে পারি। আমরা শুধু মাত্র আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের চেষ্টা করলে এই পূর্ণ কল্যাণের দেখা পাব না; আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে কল্যাণের এই পূর্ণতম রূপটুকুকে প্রত্যক্ষ করা যায়: 'For our ideal self finds its embodiment in the life of a society and it is only in this way that it is kept before us...... This relation to our fellowmen that we find our ideal life... the 'I' or ideal self is not realised in any one individual, but finds its realisation rather in the relations to one another. We can realise the true self of the complete good only by realising social ends. In order to do this, we must negate the merely individual self, which is not the true self. We must realise ourselves by sacrificing ourselves.' অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্র হল আত্ম বিসর্জন করে আত্ম প্রতিষ্ঠা করা: 'মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাবো'। তাইতো উপনিষদ বলেছেন,'

'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা।
বিদ্যয়া মৃতমহশ্নুতে'

অর্থাৎ 'আমি' সম্বন্ধে সত্যিকারের জ্ঞানই হল অমৃতত্বের উৎস। এই সত্য জ্ঞানটুকু লাভ করতে হলে, বিশ্ব সংসারের সঙ্গে সার্থক যোগেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমাদের আত্ম চেতনার উৎস। এই একাত্ম হওয়ার মধ্যেই আমরা আমাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করি; আমাদের পরিপূর্ণ আত্ম-উন্মোচন ঘটে। তখন আমরা পরস্পরকে উপায় হিসেবে দেখি না, উপেয় হিসেবে দেখি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থই হল মানুষকে উপেয় বা end হিসেবে দেখা। আত্ম-শাসনের দ্বারাই এই মনোবৃত্তি আয়ত্ত করা যায়। যিনি আত্মস্থ তিনিই যথার্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তিনি নিজেকে উপেয় হিসেবে দেখেন, অপরকেও তিনি কখনও উপায় হিসেবে দেখেন না। এটাই হল মানুষ হওয়ার পরিপূর্ণ আদর্শের কথা।

Die to live ('মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাবো')

আমরা কবিতায় পড়েছি:

'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারই লাগি তাড়াতাড়ি'—

প্রাণ বিসর্জন করার মধ্যেই প্রাণ রক্ষার এইযে তত্ত্ব, এই তত্ত্ব আমরা উপনিষদে পেয়েছি 'ঈশাবাস্য' মন্ত্রে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' তত্ত্বে একথা শিখেছি যে, পরিপূর্ণ ভোগ করতে হয় ত্যাগের পথে। আমরা যখন আমাদের মধ্যেকার ক্ষুদ্র 'আমিটাকে' ধ্বংস করে দিয়ে বৃহৎ আমিটার প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পারি তখনই আমরা যথার্থ অমৃতত্বের উত্তরাধিকার লাভ করি। মনুষ্যত্বের আদর্শের জন্য মানুষের জীবন নাশও সমর্থন যোগ্য। এই আত্ম বিনষ্টির দ্বারা, এই আত্ম হননের দ্বারা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ধ্বংস সাধন ক'রে নিজের ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। অর্থাৎ আমাদের যে জীবন ইন্দ্রিয় এবং আবেগের অধীন রয়েছে তাকে স্বীকার ক'রে আমরা যদি বিশ্ব জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি তখন আমরা আমাদের সত্য আমিটাকে জানতে পারি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একথা বললেন তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে। এইযে আত্মত্যাগ তত্ত্ব, এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রবিদ Seth বললেন : ইন্দ্রিয় বশীভূত জৈব সত্তার উর্ধে আমাদের যে নৈতিক জীবন সেই জীবন যাপন করতে হ'লে আমাদের ইন্দ্রিয় বশীভূত ব্যক্তিসত্তার মৃত্যু ঘটাতে হবে।, অসঙ্গত যাচঞা বা প্রার্থনা নৈতিক উৎকর্ষের মান নির্ণায়ক নয় ; আত্মোৎসর্গের চিরায়ত মহিমার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের নৈতিক আদর্শকে পূর্ণ ক'রে তুলতে পারি। 'I must die, as an individual object of sensibility, if I would live as a moral person, the master of sensibility......importunity is not the measure of ethical importance and the 'everlasting Nay' of self sacrifice precedes and makes possible the 'everlasting yea' of a true self fulfilment'. অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ চাওয়া পাওয়ার জগত যখন মানুষের কাছে বিরল-ঐশ্বর্যে সমাগত হয় তখনই মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়।

সম্পূর্ণতাবাদের (বা Perfectionism) দার্শনিক তত্ত্বভূমি (Philosophical basis of Perfectionism)

আমরা এই যে পরিপূর্ণ মানবিকতার আদর্শের কথা আলোচনা করছি, এর ভিত্তি ভূমিতে রয়েছে হেগেলীয় দর্শনের বস্তুগত ভাববাদ। সমগ্র জীবন এবং জগত এক অধ্যাত্ম সত্তার প্রকাশ ; এই সত্তা সর্বব্যাপী। মানুষের অন্তরের যে ইচ্ছা কর্ম রূপে এবং বহির্জগতের বস্তু নিচয় রূপে প্রকট তা এই সত্তারই

প্রকাশ। এই সত্তার ক্রমবিকাশ ঘটে। এই ক্রমবিকাশ ঘটে যে কোন অবস্থা, তার বিপরীত অবস্থা ও এতদুভয়ের সমন্বয়ে (thesis, antithesis ও synthesis) dialectic বা দ্বান্দ্বিক আত্মবিকাশের পদ্ধতিকে অনুসরণ ক'রে। ব্যক্তির সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিকের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ হল আত্মিক সম্বন্ধ। মনের জগত এবং বাইরের জগত তো বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তি হিসেবে মানুষের সর্ব শ্রেষ্ঠ পূর্ণতা ঘটে যখন সে একাত্ম হতে পারে, একদিকে এই বিশ্ব জগতের সঙ্গে অন্যদিকে সেই ভাবময় চিন্ময় সত্তার সঙ্গে। এই আদর্শের রূপায়ণের মধ্যেই মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। তাই একে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ বলা হয়েছে।

সম্পূর্ণতাবাদের সমালোচনা :

সম্পূর্ণতাবাদের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণতাবাদ প্রমাণ এবং প্রমেয়ের মধ্যে ভেদটুকু যথাযথ অনুধাবন করতে পারে নি। অতএব এ ক্ষেত্রে যে অনুপপত্তিটি ঘটেছে, তাকে বলা হয়েছে 'Argument in a circle'।

(১) সম্পূর্ণতাবাদের মতে নীতিসঙ্গত আচরণ চরিত্রের সর্বোৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখে অর্থাৎ নীতিসঙ্গত আচরণের লক্ষ্য হল মানুষের চরিত্রের সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা সাধন করা। আবার এই মত অনুসারে সৎ চরিত্র ন্যায়-সঙ্গত আচরণের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। অতএব বলা চলে যে সম্পূর্ণতাবাদ চক্রদোষ দুষ্ট।

(২) সম্পূর্ণতাবাদে আত্ম উপলব্ধির কোন সঠিক অর্থ আমরা বুঝি না; এর কোন সঠিক অর্থও নেই। সর্বোৎকর্ষ সমৃদ্ধ চরিত্র বা শ্রেষ্ঠ চরিত্র ব্যক্তি মনুষ্য প্রকৃতির চরম উৎকর্ষ, এই সব কথাগুলিও আমাদের কাছে কোন নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না। অথচ সম্পূর্ণতাবাদের মতে এরাই হল আমাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। পূর্ণ মানুষের সম্পূর্ণ চরিত্রের ধারণা আমাদের কাছে চির-কালই দুর্জ্ঞেয়।

(৩) আমাদের কাজ কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন করার জন্য কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ডের কথা সম্পূর্ণতাবাদ বলে না। পূর্ণতম মনুষ্য চরিত্রের যে লক্ষ্য মাত্রা সম্পূর্ণতাবাদ আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়, তার অর্থ আমাদের কাছে বোধ-গম্য নয়। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ কাজ ভালো এবং কোন্ কাজ মন্দ এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশ দান করা সম্পূর্ণতাবাদের সাধ্য নয়। সম্পূর্ণতা-বাদীরা যে আত্মউপলব্ধির কথা বলে সেই আত্মউপলব্ধির হয়তো এক ধরনের অর্থ নির্ণয় করা যেতে পারে। মানুষের স্বাস্থ্য, কায়িক পরিশ্রম, অবসর

বিনোদনের উপায় এবং উপেয়, জ্ঞান, সংস্কার, ধর্ম, সৌন্দর্য, প্রেম, বন্ধুত্ব, সেবা এসবই হয়তো আত্ম উপলব্ধির পথে মানুষকে সাহায্য করে। কিন্তু সম্পূর্ণতা-বাদীরা যে পরিপূর্ণ আদর্শের কথা বলে, তা এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ; তার ধারণা করা সহজসাধ্য নয়।

একাদশ অধ্যায়

নৈতিক ভিত্তি

নৈতিক ভিত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা : তার প্রকৃতি ও ধর্ম—নৈতিক বিচারের ভিত্তি—ব্যক্তি স্বাধীনতা—বাধ্যতাবাদ ও তার খণ্ডন—আত্মার অবিনশ্বরতা—ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস।

একাদশ অধ্যায়

নৈতিক ভিত্তি : তার প্রকৃতি ও ধর্ম

আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে নৈতিক অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করি তখন সেই নৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে আমরা কয়েকটি সত্যকে গ্রহণ করি। এই সত্যগুলি দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। নীতি-বিচার, ঔচিত্যের আদর্শ বিচার হল সেই বিচার যা স্বভাবতই সত্য (True) এবং বাস্তব (Real) সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারকে আশ্রয় করে। মৌল দার্শনিক অর্থকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নৈতিক মতবাদ গঠিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন দার্শনিক মতের বিভিন্ন ধরনের ন্যায়শাস্ত্র। যাঁরা বিশ্বাস করেছেন যে, প্রবৃত্তিই মূল সত্য বস্তু, সমগ্র বিশ্ব জগৎ ও মনোজগৎ এই চরিত্রেরই বিকার মাত্র, তাঁরাই নীতিশাস্ত্রে প্রেয়োবাদকে গ্রহণ করেছেন। আবার যাঁরা ভাববাদী, যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাবান, তারা হেগেলের মতো সম্পূর্ণতাবাদে বিশ্বাস করেছেন। অতএব ব্রাডলি প্রমুখ চিন্তানায়কদের মধ্যে অনেকেই অন্তর্দর্শনবাদে আস্থা স্থাপন করেছেন। সুতরাং একথা বলা চলে যে, নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তি হল দার্শনিক মতবাদ। নীতিবোধের ভিত্তি হল দর্শনে। দর্শনে কথিত সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক আদর্শের উদ্ভব ঘটিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নৈতিক বিচারে যেসব সত্য উদ্ভূত হয়েছে তারা তদনুগত দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে যে নীতিবিদ্যার মূল্যায়ন অর্থে নীতিবিদ্যার মূল্য নিরূপণ হল দার্শনিক আলোচনার বিষয়বস্তু। অবশ্য যাঁরা নৈতিক মূল্যকে অনির্বচনীয় বা ব্যাখ্যার অতীত বলে মনে করেন, তাঁদের চোখে এই দার্শনিক মতও নৈতিক আদর্শের সম্বন্ধটুকু অবহেলিত নয়। যেমন G. E. Moore-এর কথা ধরা যাক। তিনি তাঁর Principia Ethica গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, 'Good, then, is indefinable'। এই ধরনের Moore-এর মত অনির্বচনীয়তাবাদীদের চোখে নীতি-শাস্ত্র এবং দর্শন মতের কোন যোগ নেই, একথা স্বীকার্য। কিন্তু ভিন্ন নীতিদর্শন মতাবলম্বীদের চোখে সত্যটি কিন্তু আরেকভাবে প্রতিভাত হয়েছে। সেই সত্যটি হল, না।ত দর্শন সাম।গ্রক দার্শনিক আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত ; একথা Moore স্বীকার করেছেন যে, নীতি মূল্যের প্রকৃতি অনির্বচনীয় হলেও সকল মানুষের দার্শনিক মতই বাস্তব

ক্ষেত্রে তার নৈতিক আদর্শকে এবং তার নৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

নৈতিক বিচারের দার্শনিক ভিত্তিভূমি (Postulates of Moral Judgment)

বিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা যেমন কতকগুলি মৌলিক ধারণাকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি, তেমনিধারা নীতি-বিদ্যার আলোচনায় এই ধরনের কয়েকটি মৌলিক ধারণা বা Postulates কে স্বীকার করে নিয়ে তবেই নীতি সম্বন্ধে আলোচনা চালাই। আমরা যখন বলি, 'সদা সত্য কথা বলিব'—তখন সত্য আশ্রয় করাই যে জীবনের সদ্‌ধর্ম, সেটুকু পূর্বাহ্নেই স্বীকার করে নিই। সদা সত্য কথা বলব—এই নৈতিক অনুশাসনের মূলে এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটুকু স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুষের সত্য অথবা মিথ্যা বলার দ্বিবিধ স্বাধানতাই রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে সত্যও বলতে পারে আবার মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে পারে। অতএব, 'সদা সত্য কথা বলিবে', এই অনুশাসনের মূলে যে মৌল স্বীকৃত সত্যটুকু রয়েছে তা হ'ল মানুষের সত্য অথবা মিথ্যা বলার স্বাধীনতটুকু। সে ইচ্ছা করলে সত্যও বলতে পারে, মিথ্যাও বলতে পারে। তাহলে বলা চলে যে, নীতি বিচারের প্রথম স্বীকৃত সত্য বা Postulate-টি হল মানুষের কর্মে স্বাধানতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। দার্শনিক Rashdall এই নৈতিক ভিত্তিভূমি বা Moral Postulate-কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে প্রথম শ্রেণীতে এমন কতকগুলি ধারণা রয়েছে, যেগুলি স্বীকার না করে নিলে কোন নৈতিক কর্ম করাই সম্ভব হয় না। যেমন, আমরা যদি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার না করি তাহলে নৈতিক জীবন-যাপন এবং নৈতিক বিচার করা এসবই অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমি স্বেচ্ছায় যা কিছু কাজ কর্ম করি, যা কিছু বিচার বিবেচনা করি তার নৈতিক মূল্যায়ন হতে পারে। যা আমি স্বেচ্ছায় করি না, তার জন্য কোন নৈতিক দায়িত্ব আমার নেই। দ্বিতীয়ত, এমন কতকগুলি নৈতিক ধারণার কথা Rashdall বললেন, যেগুলিকে বাদ দিয়েও ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলিকে মেনে নিলে নৈতিক বাধাগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। যেমন, ঈশ্বর যে আছেন অথবা আত্মা যে অবিনশ্বর, এই ধরনের তত্ত্বকে স্বীকার করেও হয়তো নৈতিক বিচার করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই ধরনের দার্শনিক ধারণাগুলিকে স্বীকার করে নিলে আমরা সহজভাবে নৈতিক জীবনের সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করতে পারি।

দার্শনিক কাণ্ট বললেন যে, Postulates of Moralty বা নৈতিক বিচারের দার্শনিক ভিত্তি হল ত্রিবিধ :

(১) মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা
(২) আত্মার অমরত্ব
(৩) ঈশ্বরে বিশ্বাস

কাণ্ট প্রথমেই বললেন যে, যে ব্যক্তির কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন করতে হবে, সেই ব্যক্তিকে কর্ম করার স্বাধীনতা দিতে হবে। যদি সে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে কোন কাজ করে, তবেই তার কৃত কর্মের জন্য তাকে দায়ী করা যেতে পারে। নৈতিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে সে ন্যায় বা অন্যায় কাজ করেছে। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নৈতিক দায়িত্ব দেওয়া অর্থহীন। দ্বিতীয়ত, কাণ্ট আত্মার অমরত্বকে স্বীকার করলেন। ন্যায়শাস্ত্রের অন্যতম দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে কৃচ্ছ্রতাবাদী কাণ্ট বললেন যে, মানুষের ঐহিক জীবন অপূর্ণ। এই অপূর্ণ জীবনে পূর্ণতা লাভ করা যায় না। সুতরাং এই পূর্ণতা লাভের সাধনাকে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে পরিব্যাপ্ত করে দিতে হবে। অতএব দেহের মৃত্যুর পরেও আত্মার এই পূর্ণতা লাভের সাধনা চলতে থাকবে। সুতরাং কাণ্টকে স্বীকার করতে হয়েছে আত্মার অবিনশ্বরতার কথা। এই সত্যটুকু স্বীকার না করলে কৃচ্ছ্রতাবাদী কাণ্ট তাঁর পূর্ণতার আদর্শে উপনীত হতে পারতেন না। আমরা দেখলাম যে, কাণ্টকে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতে হয়েছে এই জীবনে যারা অসৎ তারা সুখ পাচ্ছে এবং যারা সৎ তারা দুঃখ পাচ্ছে, এই সত্যকে অবলোকন ক'রে। অর্থাৎ এই জন্মে যারা অন্যায় করে সুখ পাচ্ছে, তাদের তো পাপের শাস্তি হল না। অতএব, তাদের পাপের শাস্তি দিতে হলে এবং পুণ্য কর্মের জন্য পুরস্কৃত করতে হলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, এক সর্বশক্তিমান ভগবানের অস্তিত্বে। তিনি সর্বজ্ঞ ; তিনি মানুষের সকল কর্মের চূড়ান্ত বিচার করবেন। অতএব কাণ্টের মতে মানুষের স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস—এই তিনটি দার্শনিক প্রত্যয় হল Postulates of Moral Judgement। এরাই হল নৈতিক মূল্যায়নের দার্শনিক ভিত্তি। এই তিনটি প্রত্যয় ছাড়াও Rashdall আরও দুটি দার্শনিক প্রত্যয়ের কথা বললেন। তাঁর মতে জগতে দুঃখ, পাপ এবং অন্যায় ও কষ্ট আছে বলেই মানুষকে নৈতিক সংগ্রাম করতে হয়। দুঃখ ও পাপকে স্বীকার না করলে নৈতিক সংগ্রামের মূল্য থাকে না। অতএব দুঃখ এবং পাপের অস্তিত্ব হল Rashdall-এর মতে চতুর্থ দার্শনিক প্রত্যয়। Rashdall-এর পঞ্চম দার্শনিক প্রত্যয়টি হল, কালের পরিবর্তন হয়—কাল এবং

পরিবর্তন এরা উভয়েই সত্য। মানুষ অন্যায়ের প্রতিকার করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, নিয়ত চেষ্টার মধ্য দিয়ে। সেই সংগ্রাম, সেই চেষ্টার ফল পাওয়া যায় কালক্রমে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, তার বিচার বুদ্ধি তাকে ন্যায়ের পথে নিয়ে যায়। সেই ন্যায়ের পথ হল সংগ্রামের পথ ; সেই সংগ্রাম চলে কালকে আশ্রয় ক'রে এবং মানুষের নৈতিক জীবনের পরিবর্তন আসে কালক্রমে। অতএব কাল এবং পরিবর্তন এরা হল পঞ্চম দার্শনিক সত্য ; এদের আশ্রয় করেই নৈতিক মূল্যায়নের পদ্ধতি নির্ণীত হয়।

আমরা নীতি বিচারের ভিত্তিভূমির প্রথম দার্শনিক প্রত্যয় হিসেবে যে মানুষের স্বাধীনতার কথা বলেছি, সেই স্বাধীনতাটুকু প্রমাণ সাপেক্ষ। দর্শন-শাস্ত্রে এই প্রসঙ্গ বারবার বাদানুবাদ চলেছে যে, সত্য সত্যই মানুষের স্বাধীনতা আছে কি না ? কতকগুলি নির্ধারিত অবস্থা এবং শক্তির দ্বারা মানুষের সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন কথা কোন কোন দার্শনিক বলেছেন। তাঁদের বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রণবাদী বা Determinist। আবার দ্বিতীয় শ্রেণার মতবাদীরা বলেছেন যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই হল তার শ্রেষ্ঠ অধিকার। প্রতিকূল অবস্থার উপর মানুষ সহজেই আপন স্বাধীন ইচ্ছার প্রাসাদ গড়ে তোলে। সত্যবাদী হওয়া অথবা মিথ্যবাদী হওয়া এটা হল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাপার। স্বেচ্ছায় মানুষ তার কর্মপথ নির্বাচন করে, এরকম কথা বলা হয়েছে ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবোধ (Doctrine of Free will) তত্ত্বে। নিয়ন্ত্রণবাদীরা বা বাধ্য-তাবাদীরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন যে, প্রকৃতি সর্বত্রই কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মানব মন প্রকৃতি বহির্ভূত নয়। অতএব মানব মন কার্যকরণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তবে পূর্ববর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলীর দ্বারা মানব মন নিয়ন্ত্রিত হবেই। পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থার সূত্রপাত হয়। ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক গঠন বহুল পরিমাণে পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়। বংশপরম্পরায় আমরা পূর্বপুরুষের বহু দোষগুণের অধিকার লাভ করি। তাহলে এই ধরনের বিচারে মানুষের চরিত্র এবং মনন ধর্ম বহুল পরিমাণে পূর্বপুরুষের দোষগুণের দ্বারা প্রভাবিত। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক, তার বাহ্য পরিবেশ তাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। যে ছেলেটা বস্তিজীবনে অভ্যস্ত তার কাছে অশ্লীল ভাষা, অশ্লীল কথার ব্যবহার দোষনীয় নয়। কেননা, সেটাই তার সহজাত পরি-বেশের অঙ্গ। সুতরাং Determinist-রা বলেন যে, বংশ পরম্পরায় এই জাতীয় দোষগুণ এবং পরিবেশের প্রভাব যখন মানুষের চরিত্রকে সৃষ্টি করে তখন প্রকৃত-পক্ষে তার চিন্তার স্বাধীনতা এবং কর্মের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত। মনস্তাত্ত্বিক

প্রেয়োবাদী বা Psychological Hedonist-রা বলেন যে, আমাদের ইচ্ছা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের মানসিক পরিবেশ। দুটি ইচ্ছার যখন সংঘাত ঘটে, তখন যে ইচ্ছাটি প্রবলতর সেই ইচ্ছাটিই জয়ী হয়। এই প্রসঙ্গে একথা বলা চলে যে, মানুষ যখন কোন বিশেষ কর্মেআত্ম নিয়োগ করে তখন সে তা করে এই প্রবলতর ইচ্ছার দাস হিসেবে। অতএব এক্ষেত্রেও তার স্বাধীনতা নেই। মানুষ নিয়মবদ্ধ জীব। কতকগুলি মৌল বিধি-বিধানকে আশ্রয় করেই আমাদের মানসিক জীবন গড়ে ওঠে। সেই মানসিক জীবন আবার বাহ্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। অতএব, আমরা যখন পরিসংখ্যান তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে মানুষের ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করতে সমর্থ হই এবং যদি সেই ভবিষ্যৎবাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয় তখন একথা বলা চলে যে মানুষের সামাজিক ব্যবহার বহুলাংশে পরিচিত বিধি-বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদে বা বাধ্যতাবাদে (Determinism) যারা বিশ্বাস করেছেন তাঁদের যুক্তি আমরা মোটামুটি দুইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রথম ব্যাখ্যাটি কার্যকারণের পারম্পর্যকে আশ্রয় করে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি শক্তির অবিনশ্বরতাবাদে বিশ্বাসী। কার্য কারণের অনড় শৃঙ্খলে যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করার অবকাশ থাকে না। দ্বিতীয় তত্ত্বটি হল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মোট শক্তির পরিমাণ যদি পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তার যদি হ্রাস বৃদ্ধি না হয় তাহলে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নূতন কোন শক্তির সৃষ্টি হ'তে পারে না। যদি আমাদের ইচ্ছা কোন অতিরিক্ত শক্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় তবে তা শক্তির অবিনশ্বরতাবাদের পরিপন্থী হবে। সুতরাং এই দুই তত্ত্বের দ্বারা মানুষের মনোজগৎ এবং জড় জগৎ এই দুই জগতই শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। তাহলে বলতে হয় যে, মানুষের স্বাধীনতা নেই। জড়বাদীরা বলেন যে, অনুপরমাণুর সংযোগ, বিয়োগ এবং শক্তির ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হয়। তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ একেবারেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিক বাধ্যতাবাদীদের চোখে মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা সঙ্কুচিত।

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মবাদীরা বা একেশ্বরবাদীরা যে সর্বকর্ম নিয়ন্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁদের মতে মানুষের স্বাধীনতা নেই। ব্রহ্মবাদীদের মতে, একেশ্বরবাদীদের মতে মানুষের স্বাধীনতা-বোধও মিথ্যা। শঙ্করের বেদান্ত দর্শনে স্পিনোজার একেশ্বর বাদী দর্শনে আমরা এই ধরনের তত্ত্বের সন্ধান পাই। তাঁদের মতে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা এবং কর্মের স্বাধীনতা প্রান্তিক বিশ্লেষণে 'মায়া' বলে প্রতিভাত হয়। তৃতীয়তঃ, গোঁড়া আস্তিক্যবাদীরা বলেন যে,

ভগবান হলেন 'সর্বকারণ কারণম্'; তিনি সর্বজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই ত্রিকালের জ্ঞানই তাঁর কাছে নিত্য সত্য। তা যদি হয়, তবে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী পূর্বেই সংগঠিত হয়ে আছে। কেন না, তা না ঘটে থাকলে ভগবানের পক্ষেও সেই ভবিষ্যত ঘটনার জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। অতএব ঘটনা-বলী যদি পূর্বেই ঘটে থাকে তাহলে মানুষের কোন কর্ম স্বাধীন নয়। এইভাবে বাধ্যতাবাদের তত্ত্বের উপস্থাপনা করা হয়েছে।

(১) বাধ্যতাবাদ খণ্ডন

মানুষের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষাই মানুষের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। বাধ্যতা-বাদের এই যে যুক্তি, এই যুক্তিটা ভ্রান্ত। ব্যক্তির বিচারই হল মূল শক্তির উৎস। ব্যক্তি হিসেবে আমরাই স্থির করি প্রতিদ্বন্দ্বী আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে কোনটাকে নির্বাচন করব। আমরাই আমাদের সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা ও চালক। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদীদের বিশ্লেষণ এই ব্যাপারে ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, আমরা মানুষের ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে সঠিক অনুমান করতে পারি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে মানুষের ব্যবহার পূর্ব নির্দিষ্ট। অনুরূপ বহু অভ্যাসের দ্বারা গঠিত বলে বিচিত্র ধর্মী মানুষের ব্যবহারের মধ্যে এক-ধরনের অনুরূপতা কখন কখন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য যাদের চরিত্র একই ভাবে গঠিত হয়েছে, তারা অনেক সময় একই ধরনের ব্যবহার করলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে চরিত্র গঠনের সময় মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে; একদিকে সে যখন আপন চরিত্র গঠন করে তখন সে সম্বন্ধে তার আপন ইচ্ছাই বলবতী হয়। নিয়মের অধীন হওয়াই স্বাধীনতার হানি নয়। মানুষ নিজের স্বভাবের জন্য নিজে যে নিয়ম গঠন করে সেই নিয়ম গঠন করার অর্থ পরাধীন হওয়া নয়। স্ববশ্যতা স্বাধীনতারই নামান্তর। এই স্বনিয়ন্ত্রণ তত্ত্বের দ্বারা আমরা বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবাদের খণ্ডন করতে পারি। আমরা যখন আমাদের আপন ধর্মের বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই, তখন আমরা স্ববশ এবং স্বাধীন। বাইরের কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে আমাদের এই স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়। কিন্তু মানুষ এই অর্থে স্ববশ যে সে তার আপন প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। শক্তির অবিনশ্বরতাবাদের যুক্তি খণ্ডনে একথা বলা চলে যে, বিশ্বের নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির ধ্বংস বা সংযোজন সম্ভব না হলেও তার রূপান্তর ঘটে। এই শক্তির রূপান্তরই হল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার নামান্তর। অতএব দেখা গেল যে, বিজ্ঞানবাদাদের শক্তির অবিনশ্বরতা তত্ত্ব মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা তত্ত্বের পরিপন্থী নয়। চতুর্থতঃ, সর্বজ্ঞ ভগবানের ভবিষ্যতকাল সম্বন্ধে জ্ঞান

মানুষের সকল স্বাধীনতা হরণ করে না। ভগবানকে যখন আমরা সর্বজ্ঞ বলি তাহ'ল পারমার্থিক সত্য। ব্যবহারিক সত্যে নীতির স্থান আছে। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে দার্শনিক ব্রাডলি জগতকে Vale of Soul Making' বলেছেন। এই প্রসঙ্গেই স্বামী বিবেকানন্দ Practical Vedanta-র কথা বললেন। তাঁরা মানুষের নৈতিক জীবনকে স্বীকার করেছেন।

এই বাধ্যতাবাদের খণ্ডন ক'রে যাঁরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস করেন, সেই স্বাধীনতাবাদীরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করেছেন।

মানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে অনভূতি, সেই অনুভূতিই তার যে স্বাধীনতা আছে, এই সত্যটুকুর প্রতিষ্ঠা করে। আমরা যে অনুশোচনা করি, সেই অনুশোচনার কোন ব্যখ্যাই করা যায় না যদি না আমরা আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতাকে স্বীকার করি। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যদি স্বাধীন এবং স্ববশ না হই অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা না থাকে তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত বা কর্মের জন্য আমরা দায়ী থাকব না। নৈতিক সমর্থন বা শাস্তি এসবই অপ্রাসঙ্গিক এবং অবান্তর হয়ে পড়বে যদি না আমরা ধরে নিই যে আমরা স্বাধীন। নৈতিক জীবনের সম্ভাব্যতা এতটুকুও থাকবে না যদি না আমরা আমাদের কর্মের স্বাধীনতাটুকু স্বীকার করি। ধর্ম এবং নীতির যে বিরোধ, সেই বিরোধ একান্তই আপেক্ষিক। নীতি বলে যে আমি আমার কর্মের জন্য দায়ী, ধর্ম বলে যে, ভগবানই একমাত্র কর্তা। এই যে আপাতঃ বিরোধ, এই বিরোধের মীমাংসা আমরা খুঁজে পাই উচ্চতর ভাববাদে। ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন সে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে :

'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'

এই আত্মসমর্পণেই ধর্মেরও নীতিদর্শনের দুই বিরোধী তত্ত্বের সমন্বয় সম্ভব হয়। গীতায় এই সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে।

মানুষের যথার্থ স্বাধীনতাটুকু সে উপলব্ধি তখনি করে যখন সে তার অধ্যাত্ম চেতনার স্বরূপে বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। ভূমার মধ্যে খণ্ড আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল সত্যিকারের স্বাধীনতা। ব্যক্তি মানুষ স্বাধীন যেহেতু সেই ভূমার বোধ তার মধ্যে আছে। তাইতো বৃহতের আহ্বানে সে আপন ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও কর্মকে ভূমার সঙ্গে যুক্ত ক'রে, তদভিমুখে তাকে চালিত করে। অবশ্য জাগতিক নিয়মের পারম্পর্য এবং মানুষের স্বাধীনতা,

এ দুয়ের মধ্যেও কোন বিরোধ নেই। জগতের সঙ্গে একাত্ম হলে এই তথা-কথিত নিয়মের শৃঙ্খলা স্বাধীনতা রূপে প্রতিভাত হয়।

(২) আত্মার অবিনশ্বরতা

মনুষের আত্মা যে অমর এবং সেই অমর আত্মায় বিশ্বাস না করলে নৈতিক জীবনের সম্ভাব্যতা যে ক্ষুণ্ণ হয় সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এটা হল নৈতিক জীবনের দ্বিতীয় দার্শনিক ভিত্তি। সম্যক্ বিনাশ অর্থে মৃত্যু যে মিথ্যা, মৃত্যু যে রূপান্তর মাত্র একথা জড় বিজ্ঞানীরা বলবেন। জড় শক্তির যেমন অবলুপ্তি নেই, তার রূপান্তর আছে মাত্র ঠিক সেই ভাবেই মানস শক্তিরও পরিবর্তন হয় মাত্র, তার বিনাশ নেই। দ্বিতীয়ত, এই জাগতিক ক্ষুদ্র জীবনে আমরা আমাদের সকল কর্মের সমন্বয় করতে পারি না। আমাদের যে অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই আকাঙ্ক্ষা মিথ্যে নয় এবং সেই সত্য আকাঙ্ক্ষা এক জীবনে তৃপ্ত হয় না। অতএব সেই পূর্ণতর জীবনের দিকে অভিযানের জন্য, সেই পূর্ণতার আদর্শকে সত্যি ক'রে তোলার জন্য এই জীবনের পরেও উন্নততর জীবনকে স্বীকার করতে হয়। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের যুক্তি, এই গুরুত্বের দাবী করে। পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা একে 'Vaticinations of the Intellect' আখ্যা দিয়েছেন।

আমাদের বিবেকের প্রত্যয় আছে যে নৈতিক জীবনের বিকাশ হল সীমাহীন বিকাশ। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ধৈর্য, এদের বিকাশের কোন শেষ নেই এবং এক জীবনে এদের আদর্শ বিকাশ ঘটানো সম্ভবও নয়। এই পরিপূর্ণ নৈতিক আদর্শকে সত্য করে তুলতে হলে অন্য জীবনে, জীবনান্তরে বিশ্বাস একান্তই প্রয়োজন। এছাড়াও আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, অসাধু ব্যক্তি সুখী হয় এবং সাধু ব্যক্তির দুঃখের সীমা থাকে না। অতএব যদি অসাধু ব্যক্তিকে তার দুষ্ট কর্মের সমুচিত ফল পেতে হয়, তাহলে এই জীবনের পরেও অন্য জীবনকে স্বীকার করতে হয়। যাতে সেই জীবনে অসাধু ব্যক্তি অন্যায় কাজের জন্য দণ্ড পায় এবং সাধু ব্যক্তি তার কৃত কর্মের জন্য পুরস্কৃত হয়। কাণ্ট কথিত এই যুক্তকেই মার্টিনু 'Vaticinations in Suspense বলেছেন। নৈতিক আদর্শের যে সমীচীনতার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি তাকেই Vaticinations of the Conscience বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের যে কোন সীমা নেই, সেই প্রত্যয়-টুকু হল বিবেকের প্রত্যয়।

(৩) ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস

আমাদের নৈতিক জীবন যে বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের ওপর ভর করে আছে সেই পরিচ্ছন্ন বিশ্বাসটকু ভগবানকে আশ্রয় করে থাকে। তিনি হলেন মঙ্গলময় শেষ বিচারক, তিনিই দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করেন। তিনিই হলেন আমাদের সকল চিন্তার এবং ধ্যানের চরম আদর্শের পরমপুরুষ; তাঁর মধ্যেই সকল আদর্শের পূর্ণতম বিকাশ। দার্শনিক মার্টিন্যু ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে নৈতিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি বললেন যে, আমাদের কর্তব্য-বোধের মধ্যে যে ঔচিত্যবোধ ও বাধ্যতাবোধ আছে সেই বাধ্যতাবোধ হল ভগবানের কাছে। আমি যখন কোন কাজকে আমার কর্তব্য বলে বোধ করি তখন সেই বোধটুকু আসে দৈবী আদেশ হিসেবে। মনে হয়, সেই কাজটুকু না করলে ভগবান আমাকে যে ভার দিয়েছেন সেই ভার আমি যথাযথ বহন করছি না। ভগবানই হলেন সমস্ত আদর্শের পরিণতি, সমস্ত নৈতিক ধর্মের উৎস। ভগবান হলেন সকল শুভ চিন্তাও কর্মের লক্ষ্য এবং আদর্শ। তাই সমস্ত নৈতিক আদর্শের মূল্য নির্ণায়ক ভগবানকে বলা যেতে পারে সকল নৈতিক আদর্শের বাস্তব রূপ। Rashdall বললেন: মানুষের মন ছাড়া নৈতিক ভাব-ভাবনার আশ্রয় স্থল আর কোথাও নেই। নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ এবং স্বস্থ নৈতিক আদর্শ এক মহৎ মননসত্তা থেকে উদ্ভূত হয়; এই মহৎ মননসত্তা থেকেই সর্ববিধ বাস্তব সত্তা ও জন্ম নেয়: "A moral idea can exist no where and no where but in a mind; and absolute moral ideal can exist in a Mind from which all reality is derived."*

* Theory of Good and Evil, Vol II, পৃ: ২১২।

দ্বাদশ অধ্যায়

মানুষ ও তার সমাজ

মানুষ ও তার সমাজ: নৈতিক জীবন—লক্, হবস্ ও রুশোর অভিমত—সমষ্টিবাদ—সমাজের ভাববাদী ব্যাখ্যা—সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও সার্বিক শুভ—আত্মবাদ ও পরবাদ-ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদ।

দ্বাদশ অধ্যায়

মানুষ ও তার সমাজ (The Individual and Society)

নৈতিক জীবন (The Moral Life)

মানুষ সমাজ বদ্ধ জীব। সমাজে বাস ক'রে মানুষ ভাবের আদান প্রদান করে। তার আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি এ সবই সমাজকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে। মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সাথে, এমন কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন। আবার এমনটাও দেখা গেছে যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজে দু-চারজন ভাগ্যবান মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে যখন সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার সীমা থাকেনি। অতএব সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্বন্ধটা যে ঠিক কী সে সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এ সম্বন্ধটুকুর প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে নানান পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন; বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই মতগুলিকে আমরা তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করব। এদের প্রথমটি হল সমাজ সংগঠনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Mechanical view of Society); এই ব্যাখ্যাটিকে ব্যষ্টিবাদ বা Individualism বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মতটি হল সমষ্টিবাদ বা Collectivism,, এবং তৃতীয় মতবাদটি হল ভাববাদ বা Idealism.

ব্যষ্টিবাদের প্রবক্তা হলেন Hobbes, Rousseau প্রমুখ পণ্ডিতেরা। এঁদের মতে মানুষেরা সবাই আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে পৃথক এবং স্বতন্ত্র। সমাজ বলতে আমরা এই স্বয়ম্ভর পৃথক পৃথক মানুষদের সমষ্টিকে বুঝবো, এ কথা এই পণ্ডিতের দল বললেন। সমাজের মানুষেরা সকলেই স্বনির্ভর। সমাজে পরনির্ভরতা নেই বললেই চলে। আপাত দৃষ্টিতে যাকে আমরা সামাজিক সম্বন্ধ বলি তা হ'ল এক ধরনের চুক্তি। সমাজের মানুষেরা এই ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়ে সমাজ গঠন করে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের কোন আত্যন্তিক যোগ নাই। ব্যক্তি জীবনে সমাজের আবির্ভাবকে আমরা একটা আকস্মিক ঘটনা (Accident) বলতে পারি। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ স্বয়ম্ভর। আদিতে কারো সঙ্গে কারো কোনও সম্বন্ধ ছিল না। Hobbes প্রমুখ পণ্ডিতেরা বললেন যে সভ্যতার সেই আদিম প্রত্যূষে যাযাবর মানুষেরা তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য সমাজবদ্ধ হতে

চাইল। তারা চুক্তিবদ্ধ হল সামাজিক জীবন যাপনের জন্য, বিপদে আপদে একে অপরের সহায়তা লাভের জন্য। এই ধরনের অলিখিত চুক্তির আওতায় তারা এল ; ধীরে ধীরে সমাজ গঠনের কাজ সুরু হয়ে গেল। সমাজ গঠনের এই ব্যাখ্যাটি দিলেন Hobbes, Rousseau প্রমুখ পণ্ডিতেরা। এই তথ্যটিকে বলা হয়েছে Social contract theory.

Hobbes বললেন যে, মানুষের ধর্মই হল ঝগড়া বিবাদ করা। মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর। তার ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য সব সময় সে কলহপরায়ণ ; অপরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তার একটা সহজাত প্রবণতা আছে বলেই সমাজে ঝগড়া বিবাদের অন্ত নেই। বনের পশুর মত সে সবসময় আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করত। এই নিরন্তর লড়াই চালিয়ে সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। আত্ম-রক্ষার জন্য যে সহজাত প্রবৃত্তিটুকু মানুষের মধ্যে কাজ করে, সেই প্রবৃত্তি তাকে বলল শান্তিতে বসবাস করার উপায় উদ্ভাবন করার জন্য ; সন্ধান চলল কি করে শান্তিতে বসবাস করা যায় সেই পথের। অবশেষে অলিখিত সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করা হল ; রাজা এলেন রাজদণ্ড নিয়ে। সবাই তকে মেনে নিল। তিনি হলেন গোষ্ঠীপতি। তার নির্দেশ মেনে সবাইকে চলতে হ'বে। তিনি শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে লাগলেন।

সামাজিক চুক্তির এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য সবাই গ্রহণ করেননি। দার্শনিক Locke ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন যে সমাজবদ্ধ হবার আগে যে মানুষ সবসময় লড়াই করত, একথা ঠিক নয়। মানুষ সাধারণতঃ শান্তি চায় এবং তারা শান্তিতেই বাস করত। তারা প্রকৃতির বিধি বিধান মেনে চলত এবং খ্রীষ্টীয় নীতি ধর্মের মৌল বিধি-বিধান গুলোও তারা অনুসরণ করত। কিন্তু যখনই কোন প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিত বা মতদ্বৈধ ঘটত তখন সেই বিধির যথার্থ ব্যাখ্যাটুকু দেবার মত কোন যোগ্য ব্যক্তির দেখা পাওয়া যেত না। অতএব একজন গোষ্ঠীপতির অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হত। Locke-এর মতে ঠিক এই কারণেই লোকেরা সমাজবদ্ধ হবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হল। এই ভাবে সমাজ গড়ে উঠল। প্রাকৃতিক বিধি-বিধান মেনে যাতে সবাই চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখার ভার পড়ল গোষ্ঠীপতির উপর। Locke-এর মতে এই ধরনের প্রথম চুক্তির ফলে সমাজ গড়ে উঠল এবং দ্বিতীয় চুক্তির ফলে সরকার বা Government গঠিত হ'ল ; Government-এর কাজ হল সবার মঙ্গলের জন্য আইন কানুন প্রণয়ন করা এবং যাতে করে সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এই ধরনের সরকারের লক্ষ্য হল সমাজস্থ সকলের কল্যাণ সাধন।

সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফরাসী দার্শনিক রুশো বললেন, সভ্যতার আদিতে মানুষ অত্যন্ত সরল ছিল ; তাদের মধ্যে সম্প্রীতির অসদ্ভাব ছিল না ; মোটামুটি তারা সকলেই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। তাদের এই সুখ শান্তি বিঘ্নিত হয়ে পড়ল যখন কালক্রমে মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তিটা বড় হয়ে উঠল। তাদের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হল। তারা ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি দিল। এর ফলে সমাজের মধ্যে স্বার্থের ঘাত অভিঘাত এসে লাগতে লাগল। মানুষের জীবন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মানুষের সহজাত শান্তি বিঘ্নিত হল। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সকলে উদগ্রীব হ'য়ে উঠল। এর ফলশ্রুতি হ'ল একটি পারস্পরিক অলিখিত চুক্তি। এই চুক্তির ফলে তারা তাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে খর্ব ক'রে যূথবদ্ধ (association) হ'ল ; এই যৌথ জীবনে তাদের প্রাণ এবং সম্পত্তি নিরাপদ হয়ে উঠল। কিন্তু এই অলিখিত চুক্তিটি হ'ল নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রয়োজন মত সকলের ইচ্ছার নির্দেশে এই অলিখিত চুক্তিরও পরিবর্তন করা হ'ত। রুশোর মতে সমাজস্থ সকলের ইচ্ছাই হ'লো এই ধরনের চুক্তির ভিত্তিভূমি।

Hobbes, Locke ও Rousseau ব্যাখ্যাত এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব বহুবিধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমেই বলা যায় যে এই ধরনের একটি অলিখিত চুক্তি সম্পাদনের নজীর কোনও সমাজ ঐতিহাসিক আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাছাড়া একথাটা খুবই প্রাসঙ্গিক, মানুষ যে পশুর মত একা একা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, এই ঐতিহাসিক সত্যটি আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমাজ ছাড়া মানুষকে ভাবাই যায় না। সেই সমাজের প্রতীক হল পারিবারিক জীবন। আমরা সভ্যতার আদি প্রত্যূষ থেকে মানুষকে দেখেছি পরিবারের সদস্য রূপে। মানুষ একা একা থাকতে থাকতে তারপর হঠাৎ একদিন সমাজ গঠনের চুক্তি করে বসল এমন কথা কোনও ঐতিহাসিক বলেননি। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা মানুষকে একেবারেই স্বার্থপর অথবা একেবারে পরার্থপর রূপে চিত্রিত করতে চেয়েছেন তাঁরা সম্যক্ সত্যটুকু প্রকাশ করতে পারেন নি। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এই দুটো বৃত্তিই মানুষের মধ্যে রয়েছে। অতএব একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তৃতীয়তঃ এটা খুবই ভেবে দেখার কথা যে সভ্যতার আদি যুগে যখন মানুষ সমাজবদ্ধ হ'ল তখন এই ধরনের সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক পরিপক্কতা বা maturity তার ছিল কিনা ? সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের পশ্চাতে এক ধরনের উন্নত

রাজনৈতিক চেতনা কাজ করে। সেই সদ্য-সভ্য মানুষদের মধ্যে আমরা যদি এই পরিণত রাজনৈতিক চেতনাটুকুকে আরোপ করে দিই তবে বোধ হয় বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করা হবে। আদিম মানুষের মনে এই ধরনের কোন চুক্তির ধারণাই স্বভাবতঃ থাকে না। সমাজ বিবর্তনের পথে যখন সমাজ বহুদূর এগিয়ে যায়, তখনই ব্যক্তিমানুষ এই ধরনের চুক্তি সম্পাদনের আপন আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। অতএব সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব (Social contract theory) গ্রহণযোগ্য ব'লি মনে হয় না।

(খ) সমষ্টিবাদ

সমষ্টিবাদ বা collectivism এর প্রবক্তারা যে মত প্রচার করলেন তাকে বলা হল Organic view of soeicty ; সমাজে যারা বাস করে তারা সকলেই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। একটি ঐক্যবদ্ধ সংস্থার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন একসঙ্গে কাজ না করলে সংস্থাটির অপমৃত্যু ঘটে, তেমনি সমাজের মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে সমাজ জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সমাজের মানুষেরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাজে লাগে। তারা একে অপরের পরিপূরক। যে সমন্বিত সামগ্রিক ঐক্য সমাজের ভিত্তি-ভূমি সেই ঐক্যের মূল উপাদান হল সমাজের মানুষেরা। সমাজের সাধারণ জীবন ধারা (Common life) এই সব ব্যক্তি-মানুষকে আশ্রয় ক'রে বহে চলে। এই সমাজের ঐক্যের বাইরে এই সব মানুষকে কল্পনা করাই যায় না। জীব-দেহের বা উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতার উপরে যে ভাবে তাদের অস্তিত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করে ঠিক সেই ভাবেই সমাজ জীবন সমাজস্থ মানুষদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এই সব সামাজিক মানুষদের বাদ দিয়ে সমাজের অস্তিত্বই থাকে না। অতএব বলা চলে, পরস্পর নির্ভরশীল এই সব মানুষের যূথবদ্ধ ছবিই হল সমাজের ছবি। এই সব মানুষদের বাদ দিয়ে সমাজ টিঁকতে পারে না। আবার সমাজকে বাদ দিয়ে এই সব মানুষদের অস্তিত্ব কল্পনা করা ও অসম্ভব। সমাজের আওতার বাইরে যে মানুষ বাস করতে পারে এ কল্পনাই আমরা করতে পারি না। সমাজ ছাড়া মানুষ এক ধরনের abstraction মাত্র। আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, আমাদের অনুরাগ, বিরাগ, স্বভাব, অভ্যাস, ভাষা ও নীতি এসবই অর্থহীন হ'য়ে পড়ে যদি না এগুলিকে একটি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি। আমাদের মনের যে অসীম ভাবৈশ্বর্য, তাও সমাজের দান। গাছপালা যেমন করে বেড়ে ওঠে, জীবদেহের যে ভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ঠিক সেই ভাবেই সমাজের উন্নতিও

ঘটে। অতএব বলা চলে যে সমাজের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় সমষ্টিবাদ যান্ত্রিক ব্যাখ্যার চেয়ে বেশী উপযোগী।

সমাজকে আমরা যে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছি এবং সামাজিক ঐক্যকে জীবদেহের সমবায়ী ঐক্যের সঙ্গে তুলনা করেছি তার প্রয়োগ কিন্তু খুবই সীমিত। জীবদেহের বিভিন্ন অংগ প্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে বাঁচে না ; তারা জীবদেহের অংগ হিসেবে বাঁচে। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষেরা প্রত্যেকেই পৃথক এবং স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে। তাদের ব্যক্তিচেতনা তদের স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছে। সমাজ জীবনের লক্ষ্যে এবং উদ্দেশ্যে সমাজস্থ সকল মানুষের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় না। সমাজের অনুভূতি নেই ; সে অনুভূতি আছে ব্যক্তি মানুষের। সামাজিক চেতনা সমাজের নেই ; তা আছে ব্যক্তি মানুষের। জীবদেহের বিনাশ আছে কিন্তু সমাজের বিনাশ নেই। অতএব সমাজকে জীবদেহের উপমা প্রয়োগ ক'রে বুঝতে হ'লে আমাদের মনে রাখা দরকার যে জীবদেহে লক্ষিতব্য ঐক্যের ধারণাটিকে সমাজ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রয়োগ করতে হ'লে তা করতে হ'বে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। জীবদেহের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মে ; কিন্তু সমাজের বিবর্ধন ঘটে সৎ চিন্তার ও সুবিবেচনার প্রসাদে।

(গ) সমাজের ভাববাদী ব্যাখ্যা (Idealistic view of society)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তার সামাজিক সত্তাটুকুই হলো তার যথার্থ জীবন, তার আদর্শ সত্তা। আদর্শ সত্তাকে সামাজিক সত্তা বলা হয়েছে এই কারণে যে সামাজিক পরিবেশ ছাড়া মানুষ কোনও মতেই এই আদর্শ সত্তাকে আপন আপন জীবনে রূপায়িত করে তুলতে পারে না। তার এই আদর্শ সত্তাটি যুক্তি-বুদ্ধি-আশ্রিত (rational self)। মানুষের এই বুদ্ধিগত জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। মানুষেরা হল একটি সামগ্রিক সামাজিক ঐক্যের উপাদান মাত্র। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে তার নৈতিক পূর্ণতা নির্ভর করে সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধের উপরে। তার নৈতিক আদর্শ সমাজের অন্যান্য মানুষের নৈতিক আদর্শ, সংস্থা এবং নৈতিক অভ্যাসের উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই সামাজিক জীবন ছাড়া মানুষ তার সম্পূর্ণতার বিধান করতে পারে না। সামাজিক সম্বন্ধ মানুষের সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মানষের মধ্যেকার যে 'বড় আমি'টার কথা বললেন সেই 'আমি'টাই হ'ল নীতিদর্শনের এই universal self বা সার্বিক সত্তা। এই সার্বিক সত্তাটিকে মানুষ তার আপন আপন জীবনে সত্য করে তুলতে চায় ;

এ হ'ল তার নীতি ধর্ম। এই নীতি ধর্মের আচরণ করতে হয় সমাজের মধ্যে বাস ক'রে। অতএব বলা যেতে পারে যে ব্যক্তি-জীবনের ভিত্তিভূমি হল সামাজিক জীবন। এই সমাজিক জীবন ছাড়া মানুষ তার আধ্যাত্মিক মূল্য গুলোকে আপন জীবনে সত্য করে তুলতে পারে না। বলা যেতে পারে যে ব্যক্তি মানুষের জীবনের বুনিয়াদ হলো এই সামাজিক জীবন। জীবদেহের যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি পরস্পরের উপর নির্ভর ক'রে চলে তেমনি ধারা সমাজের মানুষেরাও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার স্বর্ণসূত্রটুকু অবলম্বন ক'রে সমাজস্থ মানুষেরা তাদের যে সার্বিক আধ্যাত্মিক জীবনটুকু নৈতিক জীবনকে আশ্রয় ক'রে থাকে তাকে সত্য করে তোলে। সমাজের ঐক্যটুকু হ'লো আধ্যাত্মিক ঐক্য ; আধ্যাত্মিক জীবেরাই এই ধরনের আধ্যাত্মিক ঐক্যের ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে পারে। এই সব মানুষেরা হলো আত্ম-সচেতন। যে সামাজিক লক্ষ্য ও আদর্শকে অনুসরণ ক'রে সকলের কল্যাণ করা যায় সে সম্বন্ধে তারা সচেতন। তারা সকলেই বোঝে যে কোন একটি সাধারণ শুভের পথে তারা অগ্রসর হচ্ছে। এই শুভ ও কল্যাণটুকু তাদের পক্ষে শুভ ও কল্যাণকর হবে। এই যে সর্বসাধারণের জন্যে একই শুভ বা কল্যাণের ধারনা সমাজস্থ মানুষকে কাজে কর্মে প্রেরণা দেয়, সেই ধারণাই সামাজিক ঐক্যকে দৃঢ়তর করে।

আমরা যে সামগ্রিক সামাজিক একোর কথা বলেছি সে ঐক্য কিন্তু বাস্তবপক্ষে গোষ্ঠীগত ঐক্যরূপে প্রতায়মান হয়। সমাজের মানুষেরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হ'য়ে আপনাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের জীবন যাপন করলেও তারা কিন্তু একটি সুবৃহৎ সর্বগ্রাসী সামাজিক লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হয়। অতএব এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে এক একটি জীবদেহ-রূপে বিবেচনা করলে সমাজকে বলা যেতে পারে এই সব জীবদেহের সমন্বিত রূপ (An Organism of organisms). উপসংহারে বলা চলে যে সমাজ হল একটি বৃহৎ আধ্যাত্মিক আধার যার মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আশ্রিত আধারের সংস্থান করা হয়েছে। এই সমাজরূপ আধ্যাত্মিক আধারে সবার জন্য কল্যাণ-বারি সঞ্চিত হয়ে থাকে। সমাজ জীবন সর্ববিধ মঙ্গলের উৎসভূমি।

সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও সার্বিক শুভ (The General will and the common good.)

সমাজকে আধ্যাত্মিক ঐক্যের আধার বলা হয়েছে। আত্ম সচেতন স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক সংস্থা হ'ল এই সমাজ। সমাজের মানুষদের

মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন, আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে ; তারা সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট। তারা সামাজিক কাজ কর্মে সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়। এই সাধারণ ইচ্ছার প্রকৃতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। এই ইচ্ছা কোনও ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা নয়, সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের সম্মিলিত ইচ্ছাও নয় ; আবার এই সাধারণ ইচ্ছাকে সকলের ইচ্ছা বললেও ভুল বলা হবে। গোষ্ঠির সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজের কয়েকজন মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং অন্য সকলে তাদের ব্যক্তিগত অভিমতকে বিসর্জন দিয়ে সমগ্র পরিস্থিতির বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন ক'রে। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক Bradley তাঁর 'Ethical Studies' শীর্ষক গ্রন্থে বললেন ; "It is the concurrence of a number of persons in a single decision taken in regard to the common good of the whole group". এই সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্য হল সার্বিক কল্যাণ সাধন। এখন প্রশ্ন উঠবে, এই সার্বিক কল্যাণ বলতে আমরা কি বুঝি ? এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানান্ মত। সুখবাদীরা সুখকেই মহত্তম কল্যাণ বলবেন। Kant এর অনুগামীরা বলবেন যে Virtue বা যুক্তি আশ্রিত আচরণই হলো সর্বসাধারণের কল্যাণকর। আবার সম্পূর্ণতাবাদীরা বলবেন যে আত্মোপলব্ধি হ'ল সাধারণ কল্যাণের আকর। Green প্রমুখ সম্পূর্ণতাবাদীরা এই আত্মোপলব্ধি বলতে বুঝেছেন, শরীরের উন্নতি বিধান করা, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা এবং তদনুসঙ্গী অন্যান্য মূল্যবোধকে আপন আপন জীবনে সত্য ক'রে তোলা, চরিত্র গঠন করা, জ্ঞান অর্জন করা, নৈতিক কল্যাণ সাধন করা, জীবনে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি সমাজস্থ সকল মানুষের জীবনে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণতাবাদীরা 'সার্বিক কল্যণ' শব্দটিকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকটি মানুষ আপন আপন জীবনে এই বিভিন্ন ধরনের মূল্য বোধকে আত্মসাধনার দ্বারা সত্য করে তুলতে পারে। সুতরাং এই সার্বিক কল্যাণকে সত্য করে তুলতে হলে ব্যক্তি মানুষের সাধনার প্রয়োজন আছে এবং এই সার্বিক কল্যাণ সত্য হয়ে উঠবে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে পৃথক পৃথক ভাবে আশ্রয় ক'রে। একে আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বলতে পারি। এই সার্বিক কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। অবশ্য সবাই মিলে সে চেষ্টা করবে এবং এইভাবে সমষ্টিগত প্রয়াসের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণটুকু সমাজের সকলের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। একে আমরা সমষ্টিবাদ বা communism বলতে পারি।

এই যে সর্বিক কল্যাণের কথা বলা হল সেই সার্বিক কল্যাণকে সমাজের

বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমষ্টিগতভাবে প্রচেষ্টা চলেছে। সমাজের বিবর্তনের পথে তাই সামাজিক সংস্থাগুলির নিরন্তর পরিবর্তন ঘটছে। তাহলে বলা যেতে পারে যে সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড হ'ল সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ কি পরিমাণে এই যুক্তি আশ্রিত আদর্শ সামাজিক সত্তাটিকে আপন আপন জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সমাজ যখন সমাজস্থ মানুষদের আপন আপন যুক্তি-আশ্রিত উচ্চতর সত্তাটিকে জাগ্রত করার পথে সহায়ক হয় তখন আমরা বলি সমাজের উন্নতি বা প্রগতি হয়েছে। যে সমাজের মানুষেরা সহজে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তাদের আত্মোপলব্ধির পথে সমাজ সহায়ক হয় এবং এই সমাজকে প্রগতিশীল সমাজ বলা যেতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে সমাজ প্রগতির মানদণ্ড নির্ভর করছে সমাজস্থ মানুষেরা আত্মোপলব্ধির সুযোগ কতটা পাচ্ছে তার উপরে। আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের সব মানুষেরা আত্মপ্রকাশ এবং আত্মোন্নতির সর্ববিধ সুবিধা পেয়ে থাকে ; অনুকূল পরিবেশে তারা তাদের নৈতিক আদর্শকে আপন আপন জীবনে সত্য করে তুলতে পারে। অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে মানুষ যখন যথাযথ আত্মনিয়ন্ত্রণ করে, তখনই সে তার নৈতিক আদর্শকে সত্য করে তুলতে পারে। স্বাধীনতা বা স্ব-বশ্যতাই-হল-নীতি-ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। সমাজের অনুশাসন, ধর্মের অনুশাসন অথবা রাষ্ট্রের আইন এদের কারোর নির্দেশে যদি মানুষের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সেই ধরনের নৈতিক জীবনের কোন মূল্যই থাকে না।

আত্মবাদ ও পরবাদ (Egoism and Altruism)

মানুষের স্বার্থান্ধ প্রকৃতিটাকে আত্মবাদ বড় করে দেখেছে। আত্মবাদ বলে যে মানুষ স্বার্থপর এবং সে কেবল আপনার স্বার্থটাই বড় করে দেখে। পরবাদ বা altrussm বলে যে মানুষ স্বভাবতই পরার্থপর এবং অপরের মঙ্গলে করতে সে সদা অগ্রণী। মানুষকে যখন আমরা স্বভাবতঃ স্বার্থপর বলে বর্ণনা করি তখন আমরা মনস্তাত্ত্বিক আত্মবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটিকে দেখি। নৈতিক আত্মবাদ বলে যে প্রত্যেকটি মানুষের আপন আপন স্বার্থরক্ষা ক'রে চলা উচিত। এই আত্মবাদের পরিণতি ঘটে আত্মসুখবাদে। মনস্তাত্ত্বিক আত্মসুখবাদীদের মতে মানুষেরা আপন সুখের সন্ধান করে এবং নৈতিক আত্ম-সুখবাদের মতে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের আপন আপন সুখের সন্ধান করা উচিত। এই আত্মসুখবাদের প্রবক্তা ছিলেন Aristippus, Epicurus এবং Cynic পন্থী দার্শনিকেরা ; এবং পরবাদ যাঁরা প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে Stoic-দের কথা স্মরণযোগ্য। Hobbes আত্মবাদীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

তিনি বললেন, মানুষেরা নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না ; আত্মপ্রীতিই তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের আচরণে যেটুকু পরপ্রীতির নিদর্শন দেখা যায় তাহ'ল আত্মপ্রীতির নামান্তর। Hobbes এর মত Bentham ও বললেন যে মানুষ হ'ল স্বার্থপর ; তবে ধর্মীয় অনুশাসন রাষ্ট্রনৈতিক অনুশাসন ও সামাজিক অনুশাসন এবং দৈহিক শাস্তির ভয়ে সমাজের মানুষেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সুখবিধান করতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ Bentham বললেন, মানুষ দায়ে পড়ে অপরের উপকার করার চেষ্টা করে। দার্শনিক Mill বেন্থামের মত অনুসরণ করলেন। তবে তিনি অপরের কল্যাণ করার ব্যাপারে মানুষের বিবেকের কথা বললেন। Mill এর মতে মানুষের আপন আপন কল্যাণের সঙ্গে যখন সর্বজনের কল্যাণের বা সার্বিক কল্যাণের বিরোধ না ঘটে তখন তার পক্ষে অপরের স্বার্থরক্ষা করা বা পরার্থপর হওয়া সহজ হয়। ক্রমবিকাশপন্থী প্রেয়োবাদের প্রবক্তা হার্বার্ট স্পেনসার বললেন যে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে আত্মবাদের ও পরবাদের সমন্বয় সাধিত হয়। আত্মবাদ ও পরবাদ, এ দুটো মতবাদই পৃথক পৃথক ভাবে মানুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়। স্বার্থপর মানুষকে সবাই দূরে সরিয়ে রাখে ; সুতরাং এই ধরনের বিচ্ছিন্ন মানুষ তার আপন স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে না। আবার যে কেবল অপরের স্বার্থই দেখে সে অচিরে আপন স্বাস্থ্য-সম্পদের প্রতি যত্নহীন হয়ে পড়ে। কালক্রমে সে দুটোই হারিয়ে ফেলে। এই ধরনের মানুষের দ্বারা অপরের কল্যাণ করা সম্ভবপর হয় না। হার্বার্ট স্পেন্সর Absolute Ethics বা নিরপেক্ষ নীতিদর্শনে বিশ্বাস করেছেন। তাঁর মতে ক্রমবিকাশের পথে এমন একটি অবস্থায় আমরা উপনীত হ'ব যখন আত্মবাদ ও পরবাদের সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটবে। আত্মস্বার্থের সঙ্গে সমাজসহ সকলের স্বার্থের কোনও দ্বন্দ্ব থাকবে না। অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপযোগবাদী Sidgwick বললেন যে আত্মবাদ ও পরবাদের মধ্যে একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছেদ থেকে যায়। আত্মবাদ হ'ল সাংসারিক বুদ্ধির ফলশ্রুতি এবং পরবাদ হ'ল মানুষের ঔদার্য্যের দাক্ষিণ্যের ফল। দুইয়ের মিলন অসম্ভব। এরা সমান্তরাল রেখায় মানুষের জীবনকে অবলম্বন ক'রে চলে ; এদের সমন্বয় অভাবিত।

অন্তর্দৃষ্টিবাদী Butler আত্মবাদ ও পরবাদকে মানুষের বিবেকের অধীন রূপে প্রত্যক্ষ করলেন। আমাদের জীবনে আত্মপ্রীতি ব্যক্তিগত স্বার্থমূলক সব কাজকর্মের উৎস এবং পরহিতে আমরা যা করি তার উৎস হ'ল ঔদার্য্য বা Benevolence ; এই দুটি মৌল প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের বিবেক। বিবেক, আত্মপ্রীতি, ঔদার্য্য, এই তিনের সমন্বয়ের উপরই মনুষ্য চরিত্রের বনিয়াদ।

যুক্তিবাদী Kant বললেন যে প্রত্যেক মানুষের আপন পূর্ণতা লাভের প্রয়াসী হওয়া উচিত এবং এই পথেই সে অপরের সুখবিধান করতে পারবে। অপরকে পূর্ণ করে তোলার শক্তি তার নেই। কিন্তু অপরকে সুখী করার শক্তি তার আছে। Kant কথিত নীতি ধর্মের দ্বিতীয় সূত্রে আত্মবাদ ও সুখবাদের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। Kant কথিত তৃতীয় সূত্রেও এ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা আছে। তৃতীয় সূত্রটী হ'ল Be a member of the Kingdom of ends : অর্থাৎ তিনি মানুষকে এমন একটি স্বর্গরাজ্যের ছবি দেখালেন যে স্বর্গরাজ্যে প্রত্যেকটি মানুষই হ'ল উপায় ও উপেয়, একাধারে রাজা এবং প্রজা। কিন্তু কাণ্টীয় নীতিদর্শন কথিত সার্বিক কল্যাণ মানুষের কাছে নৈতিক আদর্শের নির্দেশ দিলেও মানুষকে মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতার বন্ধনে বেঁধে দিতে পারে নি। কাণ্টীয় যক্তিবাদ আত্মবাদ ও পরবাদের সমন্বয় সাধনও করতে পারে নি।

সম্পূর্ণতাবাদ আমাদের শিখিয়েছিল যে আত্মত্যাগের পথে আত্মোপলব্ধি করতে হয়। যুক্তিবাদ-শাসিত মানুষের যে সত্তা আছে তাকে আমরা সামাজিক সত্তা বলেছি; তাকে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে সত্য করে তুলতে হ'বে। যদি পরিবারের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ এবং সমগ্র মানবজাতির স্বার্থকে আমাদের জীবনে সত্য করে তুলতে হয় তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে। সম্পূর্ণতাবাদী দার্শনিক বললেন "You can find yourself by losing yourself" কবির সেই কথা :

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।'

—এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সম্পূর্ণতাবাদী যেমন আত্মদানের মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের সত্যটিকে দেখেছেন ঠিক একই ভাবে কবি যে প্রাণ মৃত্যুকে দান করা যায় না সে প্রাণটুকু মৃত্যুকে দান করে গেলেন। এ হল মহত্তম সত্য-লাভের বিচিত্র পথ। এ পথেই সম্পূর্ণতাবাদ সমন্বয় ঘটিয়েছে আত্মবাদ ও পরবাদের।

মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক জড়বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবাদ ও পরবাদের সমন্বয় সাধন করা যায় না। মানুষের চেতন বদ্ধি তার শারীরিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের সামাজিক পরিবেশ তার ব্যবহারকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট ক'রে দেয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সর্বগ্রাসী শক্তি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্বের কোন আধ্যাত্মিক বনিয়াদ নেই, আধ্যাত্মিক মূল্যের জন্য তার কোন আকুতিও নেই। জৈবিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই তার

জীবনের চরম ও পরম কাম্য। মার্ক্সবাদী বললেন যে মানুষ হ'ল সামাজিক জীব এবং সামাজিক গতির ঘাত প্রতিঘাতে তার সত্তা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। মানুষের এই সামাজিকীকরণ পদ্ধতি একমাত্র নিয়ন্ত্রিত করতে পারে রাষ্ট্র বা State ; মার্ক্সবাদীদের মতে এই রাষ্ট্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ হ'ল আধ্যাত্মিক জীব। সে আত্মসচেতন ; তার অবাধ স্বাধীনতা, তার দেহ, তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার সামাজিক পরিবেশ তাকে কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত করলেও তাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। বাইরের পারিপার্শ্বিকের শক্তিকে মানুষ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের কাজে লাগায় এবং সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের পথেই সে সত্য শিব ও সুন্দরের জগতের উচ্চতর মূল্য বোধকে আপনার জীবনে সত্য করে তোলে। সীমার মাঝে অসীমকে সে পেতে চায়। সে যা পেয়েছে তা নিয়ে কখনও সে সুখী হয় না। 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না' (রবীন্দ্রনাথ)। এই চাওয়া-পাওয়ার অসংগতির মধ্যে যে বেদনা বোধ মানুষকে নিরন্তর বেদনা দেয় সে পীড়ার মূলে রয়েছে মানুষের অসীমকে লাভ করার অনুক্ত সম্ভাবনাটুকু। আত্ম-বিস্তারের পথেই তার মুক্তি ঘটে : আত্ম সংকোচনকে সে মৃত্যুর মতো ভয় করে। সে আত্মসম্প্রসারণটুকু ঘটায় অপরের স্বার্থের সঙ্গে আপনার স্বার্থের সমীকরণ ঘটিয়ে। আত্মবাদ ও পরবাদের এইভাবে মিলন ঘটে।

ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদ (Individualism and Socialism)

ব্যক্তিবাদীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে ; ব্যক্তির স্বাধীনতায় তার অবিচল আস্থা। পরন্তু সমাজবাদীরা ব্যক্তি-মানুষের কল্যাণ বলতে সমগ্র কল্যাণকে বোঝে। তারা ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করেও সর্বোত্তম সামাজিক কল্যাণটুকু সাধন করতে চায়। অন্য পক্ষে ব্যক্তিবাদীরা ব্যক্তির সর্বোচ্চ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ব্যক্তি মানুষের এই স্বাধীনতা মধ্য যুগে সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল। তারই ছায়াপাত ঘটেছিল আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক চিন্তাধারায়। জনৈক ফরাসী রাজা যখন বলেন, 'I am the state' তখন এই ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বৈরাচারী প্রকাশটুকুকে আমরা লক্ষ্য করেছি। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মধ্যযুগীয় এই প্রভাবকে আমরা কাটিয়ে উঠতে না পারলেও কালক্রমে সেই প্রভাবটুকু খর্ব হ'য়ে গিয়েছে। ব্যক্তির দোর্দণ্ডপ্রতাপ, অবাধ স্বাধানতা যাকে স্বেচ্ছাচারের নামান্তর বললেও সত্যের অপলাপ করা হবে না, তা খর্ব হয়ে গিয়েছে। সামাজিক প্রয়োজনে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করার আদর্শটুকু গৃহীত হয়েছে। সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণের জন্য যাতে

সমাজের সকল মানুষই কাজ করতে পারে এবং এই ভাবেই তারা আপন আপন ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে পারে, তার জন্য সমাজ যথাযথ ব্যবস্থা করবে ; সমাজবাদীরা একথা বললেন। এ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিত্ব হানির সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের দেখতে হবে যাতে সমাজবাদ মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ না করে, মানুষের ব্যক্তিত্বকে খর্ব না করে। মানুষের জৈবিক সত্তাটিকে, মানুষের ক্ষুদ্র আমিটাকে বাঁচিয়ে রেখে, তার বিবর্ধন ঘটিয়ে সমাজবাদ কোনও মহৎ আদর্শের পথে মানবজাতিকে নিয়ে যেতে পারে না। আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতাটুকুকে অব্যাহত রাখতে হবে। সে স্বাধীনতা যেন সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত না হয়। এই সমাজ ব্যবস্থা হ'ল আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

আমাদের মনে হয় যে, ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদের মৌল নীতিগুলির মধ্যে কোন সত্যিকারের বিরোধ নেই। যদি আমরা ব্যক্তির স্বাধীনতা অধিক পরিমাণে হরণ করি, তাহলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর হবে না। সমাজস্থ যে কোন মনুষকে আমরা যতটুকু স্বাধীনতাই দিই না কেন তাকে সমাজের সকলের কল্যাণের জন্য সেই স্বাধীনতাটুকুর ব্যবহার করতে হবে। সর্ববাধাহীন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা সমাজের কাউকেই দেওয়া চলে না। ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের খবরদারি করার একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সমাজস্থ মানুষেরা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নিয়েও আপনার সীমিত জগতে আপন আপন বিচার বুদ্ধি মত চলাফেরা করতে পারে। এই ভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় ঘটানো যেতে পারে। এক-নায়কত্ব ও ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে একনায়কতন্ত্রকে মানুষের নৈতিক জীবনের হানিকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সামাজিক প্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বলতে পারি যে, এ যুগের ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলিকে সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢ়পদে এগিয়ে যেতে হবে এবং সমাজবাদী দেশগুলিকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে হবে। এই ভাবে আত্মবাদ এবং পরবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সামাজিক ও নৈতিক সংস্থা

সামাজিক ও নৈতিক সংস্থার প্রকৃতি ও স্বরূপ ব্যাখ্যা : পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলকারখানা, পৌর সংস্থা, ধর্মীয় সংস্থা ও রাষ্ট্র।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সামাজিক বা নৈতিক সংস্থা (Social or Moral Institution)

মানুষের কাছে আত্মোপলব্ধিই হল সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধি-আশ্রিত আদর্শ সামাজিক সত্তাটুকু আত্মগোপন করে আছে, তাকে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল এই আত্মোপলব্ধির কাজ। সামজিক পরিবেশেই এই প্রস্ফুরণটুকু সম্ভব হয়। সমাজে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্ম সংস্থা, প্রমুখ প্রতিষ্ঠান কালক্রমে গড়ে উঠেছে, এবং এদের মধ্য দিয়েই মানুষ তার নৈতিক আদর্শকে সত্য করে তোলে। এগুলিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছে। এরা মানুষের নৈতিক জীবনকে উদ্বোধিত করে বলে এদের নৈতিক সংস্থাও (moral institution) বলা হয়েছে! এই নৈতিক সংস্থাগুলি হ'ল :—

(১) পরিবার :—পরিবারের ভিত্তি হল ছেলে মেয়েদের জন্য পিতা-মাতার অন্তরের স্নেহের সীমাহীন পারাবার। এই স্নেহ অসহায় শিশুদের রক্ষা করে। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ভালবেসে অপরের ছেলে-মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। এই ভাবে আমরা বৃহত্তর সামাজিক জীবন যাপনের যোগ্য গুণাবলী অর্জন করি। আমাদের মধ্যে সহানুভূতি, সহযোগিতা ও অপরের প্রতি সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। বন্ধুত্ব ও ভালবাসার মহত্তম আদর্শ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সত্য ক'রে তোলার অনেক সুযোগ আমরা পাই।

শিশুদের জন্য পতামাতর স্বাভাবিক স্নেহটুকু থাকলেও তাদের ওপর পিতামাতার নিয়ন্ত্রণটুকু মাত্রা ছাড়িয়ে যেন না যায়। ছেলে-মেয়েদের দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজ করানোর কুপ্রথা একেবারে রদ করে দিতে হবে ; তাদের সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার ভালবাসার সম্পর্ক-টুকুকে সমকক্ষতার ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ছেলেদের মতই মেয়েদেরও সুশিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে পুরুষদের মতই তাদেরও অর্থোপার্জনের সুযোগ ক'রে দিতে হবে। এই অর্থনৈতিক সমতা এসে গেলে মেয়েরা আর ছেলেদের চেয়ে আপনাদের ছোট ভাববেনা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমমর্য্যাদার ভিত্তিতে যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে তার নৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশী। পরিবারই হ'ল নৈতিক শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। এই পরিবারের একজন হয়েই আমরা

সহানুভূতি, ভালবাসা এবং সহমর্মিতা-বোধটুকু অর্জন করি। যদি কোন মতবাদ পবিত্র বিবাহ-বন্ধন-সৃষ্ট পরিবার প্রথাকে অস্বীকার করে তাহলে তারা মানুষের সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের মৌল ভিত্তিটাকেই অস্বীকার করবে।

(২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান :—মানুষের চরিত্র গঠনের পক্ষে দেশের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এরা আমাদের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক শক্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়, আমাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা সাধন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে আত্মপ্রকাশ ও আত্মোন্নতির পথে। সমস্যাসঙ্কুল জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যদি না আমরা যথোপযুক্ত শিক্ষা পাই। শিক্ষাহীন মানুষের জীবন যেন কর্ণধারহীন তরনী। লক্ষ্য অভিমুখে তার অগ্রগতি সম্ভব নয়।

(৩) কলকারখানা (Workshop) :—কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা মূলতঃ চুক্তি-আশ্রিত। কলকারখানার মালিকেরা যদি অন্যায় ভাবে শ্রমিককে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে তবে রাষ্ট্রের কাজ হবে সেই বিরোধের মধ্যস্থতা করা। রাষ্ট্রের দেখা উচিত কোন অবস্থাতেই যেন মালিক এবং শ্রমিকের সম্বন্ধ প্রভু-কৃতদাসের সম্বন্ধে পর্যবসিত না হয়। আমাদের দেখতে হবে সবসময় যেন এই মালিক শ্রমিকদের সম্বন্ধটি মানবিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অবশ্য আধুনিক যুগে বড় বড় কলকারখানায় মালিক শ্রমিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে পারস্পরিক জানাশোনা থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

(৪) পৌর সংস্থা (Civic Community) :—আমরা পূর্বেই জেনেছি যে আধুনিক যুগে মালিক শ্রমিকদের সম্পর্ক চুক্তি বা Contract-কে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠে। অতএব মালিক শ্রমিকদের যে বিরাট যৌথ পরিবার তার কল্যাণের জন্য এই বিরাট পরিবারের একটি যৌথ সংস্থা থাকা দরকার। একে Civic Community বলা হয়েছে। এই সংস্থার হাতে থাকবে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব ; কেউ যাতে খাদ্যে ভেজাল না মেশাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও যেমন এ সংস্থার কর্তব্য হবে ঠিক তেমনি জরা বৃদ্ধ এবং পীড়িত ব্যক্তিদের যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভারও এই সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকবে। এ দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বিশেষের দায়িত্ব নয়; এ দায়িত্ব সমস্ত সমাজের। পৌর সংস্থা সমাজের হয়ে এই গুরু দায়িত্ব বহন করবে।

(৫) ধর্মীয় সংস্থা (The Church) :—ধর্মীয় সংস্থাগুলিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষেরা সকলেই আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম

চর্চা করেন। ধর্ম চর্চা ছাড়াও ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি বিধান করার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে। ধর্মীয় সংস্থার মাধ্যমে আমাদের জীবনের উচ্চতর আদর্শকে সত্য করে তোলার সুযোগ আছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বৃদ্ধ এবং অশক্ত নরনারীদের, কপর্দকহীন দরিদ্র মানুষদের সেবা-যত্ন করেন ; তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেন। ধর্মীয় সংস্থাগুলি ভগবদ্ প্রেমের মাধ্যমে মানুষদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার সম্বন্ধ গড়ে তোলে। অসাম্প্রদায়িক নৈতিক সংস্থা গুলি এই ধরনের ধর্মীয় সংস্থা গুলির কাজে সহয়তা করতে পারে। এযুগে এ ধরনের ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্থা মানুষদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনে সহায়তা করে। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আদর্শকে সত্য করে তুলতে তারা সহায় হয়।

(৬) রাষ্ট্র (The State) :—সমাজের সর্ববিধ সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্তা হ'ল রাষ্ট্র ; রাষ্ট্র আইন করে, বিধিপ্রণয়ন করে এবং সে বিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থা করে। সমাজের সব মানুষই যাতে নিরাপদে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র। এই নিরাপত্তাটুকু না থাকলে কিন্তু মানুষের নৈতিক জীবন সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রের শৃঙ্খলার মধ্যেই মানুষের নৈতিক জীবন স্ফূর্তি-লাভ করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হ'ল জাতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, রেলপথ স্থাপন ও তার সম্প্রসারণ করা, ডাক বিলির ব্যবস্থা করা, দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা এবং আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার সম্যক রক্ষা করা। দেশের মানুষের নিরাপত্তা, ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য যা কিছুই করণীয় তার দায়িত্ব এই রাষ্ট্রের। অতএব বলা চলে যে সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হ'ল এই রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রর আশ্রয়েই মানুষের নৈতিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আত্মোন্নতির পথে যে আত্মোপলব্ধির কথা নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে তা কেবল মাত্র সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যে সম্ভব হ'তে পারে। কেন না রাষ্ট্রই মানুষের ধন, প্রাণ রক্ষা ক'রে শান্তিতে বসবাসের সুযোগ ক'রে দিলে তবেই তো সামাজিক মানুষের পক্ষে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

কর্তব্য ও অধিকার

কর্তব্য ও অধিকারের স্বরূপ নির্ণয়—মানুষের প্রাণধারণের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কাজ করার অধিকার, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তি সম্পাদনের অধিকার, মানুষের কর্তব্যকর্ম : জীবনের তথা জীবের প্রতি শ্রদ্ধা ; মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার জন্য শ্রদ্ধা, অপরের সম্পত্তির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা—বিবেক বিচার বিদ্যা (Casuistry)—কর্তব্য-কর্ম : সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতা—কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ।

চতুর্দশ অধ্যায়

কর্তব্য ও অধিকার (Rights and duties)

মানুষের অধিকারকে সমাজ স্বীকার করে এবং সে অধিকারের একটা নৈতিক চরিত্র আছে। সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য সে কর্তব্যটুকু আমরা করে উঠতে না পারলে নীতিগতভাবে আমরা সমাজের কাছে ঋণী হ'য়ে থাকব। সে নৈতিক ঋণ শোধ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। অতএব আমাদের অধিকারের সঙ্গে এই কর্তব্যের নৈতিক চরিত্রকে স্বীকার করতে হবে। দার্শনিক বোসাংকে বললেন—"সমাজ মানুষের বাঁচবার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সমাজের মানুষেরা সমাজের কাছ থেকে সেটুকু দাবী করতে পারে।" মানুষের অধিকার সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষকে আশ্রয় করে থাকে। তার আত্মোপলব্ধির জন্য যে সব বস্তুর প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে তার উপরে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আছে। কর্তব্য বলতে আমরা এক ধরনের নৈতিক দায়িত্বকে বুঝি। রামের অধিকারকে স্বীকার করা শ্যামের নৈতিক কর্তব্য। আবার রামেরও আপন অধিকারকে অপরের কল্যাণের জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যবহার করার গুরুদায়িত্ব রয়েছে। অতএব একই নৈতিক বিধির উপরে অধিকার ও দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমাজ সামাজিক মানুষকে যে অধিকার দিয়েছে সে অধিকারটুকুকে সে ব্যবহার করবে তার আপন স্বার্থের ও সমাজের বৃহত্তম স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারটুকু হ'ল সমাজের দান। সে অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে। এই সামাজিক কল্যাণকে বাদ দিলে মানুষের অধিকারের কোন অর্থই থাকে না। সামাজিক বিবেক বা Social conscience ব্যক্তি মানুষের অধিকারকে রক্ষা করে। নৈতিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্রের উপর থাকে না। আত্মোপলব্ধির জন্য সমাজের মানুষদের এই নৈতিক অধিকারটুকু স্বীকার করা হয়। এই নৈতিক অধিকারের মাধ্যমেই ব্যক্তি মানুষ যেমন তার আপন স্বার্থসিদ্ধি করে অন্য দিকে আবার এই পথেই সে সামাজিক কল্যাণ সাধন করে।

অতএব আমরা বলতে পারি যে অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা হ'ল

পরস্পরের পরিপূরক। কর্তব্যবোধের মধ্যে একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকে। অধিকার বললেই একটা বাধ্যবাধকতার কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে। আমার অধিকারকে স্বীকার করার বাধ্যবাধকতা সমাজের আর পাচজনের উপর রয়েছে এবং সে অধিকারটুকুকে সকলের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করার গুরুদায়িত্বটুকু রয়েছে আমার উপর। আইনগত (Legal obligation) বাধ্যবাধকতার সঙ্গে এই ধরনের নৈতিক বাধ্যবাধকতার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। দেশের আইন মানুষকে সে আইন মানতে বাধ্য করে, না মানলে শাস্তির ভয় আছে। কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব পালন না করলে দেশের আইন শাস্তি দিতে পারে না। নৈতিক দায়িত্ব পালন না করলে লোকনিন্দা হয়; লোকনিন্দার ভয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সে নৈতিক দায়িত্বটুকু পালন করি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে মানুষের নৈতিক অধিকার ও নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও সেদিকে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়াও সমাজের কাজ। এ সম্বন্ধে সমাজের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রয়েছে। রামের অধিকার শ্যাম স্বীকার করছে কিনা, রাম আপন অধিকারের অপব্যবহার করছে কিনা, এ সব দেখার কাজ হল সমাজের। (সমাজস্থ মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা হ'ল সমাজের কাজ।) সমাজের নৈতিক বিধিবিধান, সমাজস্থ মানুষদের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু নির্ণয় করে। নৈতিক জীব হিসাবে মানুষ তার আপন লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয় এই সমাজজীবনকে আশ্রয় ক'রে। মানুষের চরিত্রের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে এক দ্বন্দ্বহীন সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। সমাজ না থাকলে মানুষের অধিকার ও দায়িত্বের কথা অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। Green তাঁর Prolegomena to Ethics গ্রন্থে বললেন: মানুষ তার অধিকার লাভ করে তখনই যখন সে (১) কোন সমাজের মধ্যে বাস করে এবং (২) সেই সমাজের সকল মানুষের সামনে একটি সামগ্রিক কল্যাণের সর্বস্বীকৃত আদর্শ বিরাজ করে। সমাজের সকলেই এই কল্যাণের আদর্শটিকে আপন আদর্শ-রূপে গ্রহণ করে। "No one can have a right except (1) as a member of a society, and (2) of a society in which some common good is recognised by the members of the society as their own ideal good, as that which should be for each of them." অর্থাৎ Green বললেন, সমাজের বাইরে মানুষের কোন ব্যক্তিগত অধিকারের প্রশ্নই ওঠে না এবং সমাজের সকলের কাছে সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সামাজিক আদর্শ ছাড়া ব্যক্তি মানুষের অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে এই সামাজিক আদর্শকে তার আপন আদর্শ বলে স্বীকার

করতে হবে। ব্যক্তিমানুষকে সমাজ যে অধিকার দেয় তা কতকগুলি সর্তের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, অধিকার লাভ করার পূর্বে এই অধিকার লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অধিকার লাভ করার পরে এই অধিকারের যথাযোগ্য ব্যবহার তাকে করতে হয়। এখন আমরা বিচার করে দেখব যে মানুষের এই ধরনের অধিকার বলতে আমরা কি বুঝি ?

মানুষের মৌল অধিকার :—মানুষের অধিকার বলতে আমরা যে মুখ্য অধিকারগুলিকে বুঝি তারা হ'ল মানুষের জীবন ধারণের অধিকার, মানুষের শিক্ষা লাভের অধিকার, তার কাজ করার অধিকার, তার স্বাধীন থাকার অধিকার, তার সম্পত্তির অধিকার এবং তার চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার। প্রথমে আমরা মানুষের প্রাথমিক মৌল অধিকার নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হ'ল মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার।

(ক) মানুষের প্রাণ ধারণের অধিকার (Right to live)

সম্পূর্ণতাবাদীরা যে আত্মোপলব্ধির কথা বললেন, সে আত্মোপলব্ধি হ'ল মানুষের নৈতিক জীবনে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সেই আদর্শকে সত্য করে তোলার জন্য মানুষের বেঁচে থাকার দরকার। অতএব সমাজের সকলকে মানুষের এই জীবন রক্ষার পবিত্র দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে। আমরা আজও, মানুষের এই বেঁচে থাকার অধিকারকে স্বীকার করি না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় আমরা মানুষকে কামানের গোলা ছাড়া (Cannon Fodder) আর কিছু মনে করি না। এক্ষেত্রে আমরা মানুষের এই মৌল অধিকারটুকুকে স্বীকার করি না। অতীত ইতিহাসেও মানুষের এই মৌল অধিকারটুকু স্বীকার না করার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। মানুষের বাঁচার এই মৌল অধিকারকে স্বীকার করলে আমরা একদিকে যেমন আত্মহনন করতে পারব না অন্যদিকে অপরকে হত্যা করাও গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হবে। আমাদের নিজের জীবন এবং অপরের জীবনের বিবর্ধন করার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের উপর এসে পড়বে।

(খ) শিক্ষার অধিকার (Right of Education)

মানুষের বাঁচার অধিকারের পরেই তার যে মৌল অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে তা হ'লো শিক্ষার অধিকার। তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভের অধিকার তার জন্মগত। যেটুকু শিক্ষা তার আপন শক্তি সামর্থ্য অনুসারে পাওয়া উচিত সেটুকু তাকে পেতেই হবে। এ সম্বন্ধে তার একটা

নৈতিক বাধ্যবাধকতা (Moral obligation) আছে। এই শিক্ষা পেয়েই যখন তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে কেবলমাত্র তখনই সে সার্বিক সামাজিক কল্যাণের পথে সামাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। মানুষের আত্মোন্নতির এবং আত্মপ্রকাশের জন্য এই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা মানুষের বুদ্ধি ও অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে।

(গ) কাজ করার অধিকার (Right to Work)

মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুকে স্বীকার করে নিলে তার কাজ পাবার ও কাজ করার অধিকারটুকুকেও স্বীকার করে নিতে হয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য তার কাজের প্রয়োজন আছে এবং এই জীবিকা নির্বাহছাড়া জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না। বেঁচে থাকলে তবেই তো মানুষ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারবে ; এবং কাজ ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অতএব মানুষের ভোগ করার অধিকারটুকু অবশ্য স্বীকার্য।

(ঘ) স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার (Right of Freedom)

আত্মোপলব্ধি হ'ল মানুষের মহত্তম কল্যাণের আকর। মানুষ আত্মোপলব্ধি ক'রে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে চালিত করে। অতএব জীবনের এই মহত্তম লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তার পূর্ণ স্বাধীনতাটুকু থাকা দরকার। অপরের নির্দেশে কাজ কললে অর্থাৎ কর্তার কর্ম করার স্বাধীনতা না থাকলে সে আত্মোপলব্ধি করতে পারে না। অবশ্য এই স্বাধীনতা বলতে আমরা উদ্দাম বল্গাবিহীন জীবনের যথেচ্ছ আচরণকে বুঝি না। স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছাচার (License) নয়। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে সামাজিক সংহতি বজায় রেখে, সমাজে প্রত্যেকটি মানুষকে তার আপন স্বাধীনতাটুকুকে ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তিকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেবে। অতএব মানুষের স্বাধীনতার অধিকার মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রিত ও স্ববশ করে তুলবে, এটুকুই অভিপ্রেত।

(ঙ) সম্পত্তির অধিকার (Right of Property)

মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার থেকেই মানুষের সম্পত্তির অধিকারটুকু নির্গত হয়। আমি যদি আমার অর্জিত সম্পদকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পাই তবে আমি আমার আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারব। মানুষের সম্পদ ও তার ব্যক্তিত্ব, এই দুয়ের মধ্যে একটি প্রায়োজনিক

সম্পর্ক আছে ; মানুষের ব্যক্তিত্ব বোধহয় গড়ে উঠতে পারে না যদি না সে আপন সম্পত্তি ও বিত্ত সম্বন্ধে সচেতন হয়। অর্থাৎ এই মতানুসারে বিত্তবান মানুষের ব্যক্তিত্ব সহজেই গড়ে ওঠে। মানুষের এই সম্পত্তির অধিকারকে Real Right বলা হয়েছে। দার্শনিক হেগেল বললেন, সম্পত্তির অধিকার হ'ল মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার এবং রাষ্ট্রকে এই অধিকার রক্ষা করতে হবে। হেগেল এই প্রসঙ্গে আরোও বললেন যে রাষ্ট্রকে দেখতে হবে যে মানুষের সম্পত্তির লোভ যেন খুব বেড়ে না যায়। সম্পত্তি পাওয়ার ইচ্ছা মানুষের জন্মগত। মানুষ আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। সম্পত্তির মালিক না হলে মানুষের ব্যক্তিত্বের সম্যক প্রকাশ ঘটে না। অতএব ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যও মানুষের সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করতে হবে। আমরা দেখেছি সমাজ বিবর্তনের পথে মানুষের এই সম্পত্তির অধিকারটুকুকে স্বীকার করতে অনেক সময় লেগেছে। তার ব্যক্তিত্বকে, সম্পত্তিতে তার ব্যক্তিগত অধিকারকে সমাজ অনেক দেরীতে স্বীকৃতি দিয়েছে। অবশ্য মানুষের সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির উপর এই নৈতিক দায়িত্ব এসে পড়েছে। সে যেন এই সম্পত্তিকে 'বহুজনহিতায়' ব্যবহার করে। মহাদার্শনিক প্লেটো সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার স্বীকার করেন নি ; সে অধিকার সমাজের। Aristotle সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকারকে স্বীকার করেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিকে সামাজিক কল্যাণের জন্য সে সম্পত্তি ব্যবহার করবে হবে। ধনতন্ত্রবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতিষেধক রূপে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন না ঘটলে তার এই সম্পদের জন্য যে একটা আকাঙ্ক্ষা বা মোহ রয়েছে তা সমূলে বিনষ্ট করা যাবে না। অতএব সম্পত্তি অর্জন করার স্পৃহাটুকুর মূলোচ্ছেদ না ক'রে আমরা তার যথাযোগ্য সামাজিক ব্যবহারের কথা চিন্তা করতে পারি।

চুক্তিসম্পাদনের অধিকার (Right of Contract)

মানুষের অন্যান্য মৌল অধিকারের মত তার চুক্তি সম্পাদন করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। এই চুক্তি সম্পাদন করার অধিকারটুকু এসেছে তার সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষার অধিকার থেকে। সম্পত্তি থাকলেই তাকে রক্ষা করার জন্য, তার বিবর্ধনের জন্য চুক্তি করার প্রয়োজন হয়। চুক্তির ফলেতে উভয় পক্ষেরই করণীয় কতকগুলি কর্তব্য থাকে এবং উভয়পক্ষই এই চুক্তির ফলে কতকগুলি অধিকার অর্জন করে। তবে এই ধরনের চুক্তির ফলে

এমন কোন অধিকার অর্জন করা যায় না যা নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। আবার এই চুক্তির ফলে কোনও অনৈতিক কাজ করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায় না। চুক্তি হবে সবসময়ই যৌক্তিক চুক্তি, নৈতিক চুক্তি। রাম হরিকে মারার জন্য শ্যামের সঙ্গে কোনও চুক্তি সম্পন্ন করলে সে চুক্তির আদৌ কোনও মূল্য থাকবে না আইনের চোখে। এ ধরনের চুক্তি হ'ল (Void ab initio)। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে উন্নত সমাজব্যবস্থায় মানুষের এই চুক্তির অধিকারটুকু যথাযথভাবে রক্ষিত হয়। আদিম সমাজব্যবস্থায় এই অধিকারটুকু রক্ষিত হত না।

মানুষের কর্তব্য কর্ম (Duties of Man)

অধিকার এবং কর্তব্য এরা হল পরস্পর পরিপূরক শব্দ; একে অপরের সঙ্গ প্রায়োজনিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ। সুনির্দিষ্ট অধিকার তার সঙ্গে বহন করে আনে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের বোঝা। এই দায়িত্বের বোঝাকে আমরা কর্তব্য বলি; কর্তব্য ব্যক্ত হয় আদেশ বা অনুজ্ঞারূপে (Commandment)। প্রত্যেকটি অধিকারের সঙ্গে যেমন দায়িত্ব যুক্ত থাকে তেমনি প্রত্যেকটি দায়িত্বও পরিপূরক কর্তব্যকে সূচিত করে। দায়িত্ব (কর্তব্য) ও অধিকার সাপেক্ষ সম্বন্ধে আবদ্ধ। মানুষের পক্ষে আত্মোপলব্ধির গুরু দায়িত্ব পালন করা অবশ্য করণীয় কর্তব্য। এই প্রধান দায়িত্ব থেকেই, এই মুখ্য কর্তব্যের ধারণা থেকেই অন্যান্য কর্তব্য বা দায়িত্বের ধারণা গৃহীত হয়। আমরা নীতিশাস্ত্রবিদ Mackenzie-কে অনুসরণ ক'রে কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করতে পারি ;—

(ক) জীবনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম।
(খ) মানষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা,
(গ) সম্পত্তির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা,
(ঘ) সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা,
(ঙ) সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা,
(চ) প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা।

(ক) জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা

বাইবেলের অনুজ্ঞাটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : "Thou shalt not 'Kill'" অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থে প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে আদেশ জারী করা হল। আমাদের প্রথম নৈতিক কর্তব্য হ'ল এই আদেশটি পালন করা। আমরা যেমন আত্মহত্যা করব না তেমনি অন্যের প্রাণহানিও করব না; অপরকে যেমন হত্যা

করব না তেমনি অপরের অন্য কোনও ক্ষতি সাধন করব না। অহিংসার অর্থই হ'ল হত্যা না করা। জীবনে অহিংস হওয়াই আমাদের প্রথম কর্তব্য এবং এই কর্তব্যের কথা এ যুগে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন মহাত্মা গান্ধী ;

(খ) মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা

সমাজের সকল মানুষের ব্যক্তিত্বকে, তাদের স্ববশ্যতা ও স্বাধীনতাটুকুকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে ; এটি আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য। অকারণে অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং এইভাবে তার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আমরা যখন আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যান্য মানুষকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করি—তখন আমরা তাদের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করি। দার্শনিক Kant তাঁর Critique of Practical Reason গ্রন্থে যে নির্দেশ দিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : আপনার ব্যক্তি-সত্তাকে এবং অন্যান্য মানুষের ব্যক্তি-সত্তাকে সবসময়ে উপেয় বা End হিসেবে গ্রহণ করতে হ'বে ; উপায় হিসেবে তাদের বিচার করা চলবে না। 'Treat humanity whether in thyself or in others always as an end never as a means...', আমরা যখন মানুষকে উপেয় হিসেবে দেখি তখনই প্রকৃত-পক্ষে তার ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাধানতাটুকুকে সম্মান করি। এই ব্যক্তিত্বের ধারণার মধ্যেই অবশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাটুকুও অনুস্যূত ; তাই দার্শনিক Hegel যখন বললেন : 'Be a person and respect others as persons', তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই দ্বিতীয় কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। এই কর্তব্যটি মানবসমাজ যদি সুষ্ঠুভাবে পালন করে তাহলে সমাজ থেকে দাস প্রথা, শ্রেণীশোষণ এবং অনুরূপ অন্যান্য অন্যায় অবিচার অন্তর্হিত হবে। মানুষের চরিত্রের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা সে শ্রদ্ধাও তার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার অন্তর্ভুক্ত, মানুষের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করাই হ'ল তার চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। আমরা যখন মহৎ চরিত্র ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা এই দ্বিতীয় কর্তব্যটি সম্পন্ন করি।

(গ) সম্পত্তির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা

এটি আমাদের তৃতীয় কর্তব্য। সমাজে ধনবন্টনের বৈষম্যের ফলে বিত্তবান মানুষের বিত্তের প্রতি সাধারণ একটা লোভ থাকে; সেই লোভকে সংযত করার জন্য খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থে বলা হ'ল 'thou shalt not steal'. অর্থাৎ তুমি চুরি করবে না। আমরা যেমন অপরের ধনে লোভ করব না তেমনি আপন

সম্পত্তিরও অসদ্ব্যবহার করব না। অপরের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন বলতে আমরা তাদের ধন, মান, ঐশ্বর্য, সময়, এসবই বুঝব। অর্থাৎ সজ্ঞানে আমরা এমন কোনও কাজ করব না যাতে অপরের অর্থনাশ, বিত্তনাশ, অপযশ, এই ধরনের কোন ক্ষতি হয়। আমরা যেমন অপরের ধনসম্পত্তির ক্ষতি সাধন করব না তেমনি আমরা আমাদের ধনসম্পত্তিরও অপব্যবহার করব না। অপব্যবহার করার অর্থ হ'ল আমাদের আপন সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। অতএব এই তৃতীয় কর্তব্যটি এই ধরনের অপব্যবহারের বিরোধিতা করে।

(ঘ) সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা

সামাজিক সংস্থাগুলির উপরে সমাজস্থ মানুষের নৈতিক অগ্রগতি নির্ভর করে। এই সামাজিক সংস্থাগুলিকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতে হবে। এগুলিকে রক্ষা করতে না পারলে, এগুলিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে না পারলে ব্যক্তির জীবনে নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হবে না। তাই আমাদের চতুর্থ কর্তব্য হল এইভাবে সামাজিক সংস্থাগুলির কাজকর্মে অযথা হস্তক্ষেপ না করা। আমরা যে সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভূত তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের পরিবারকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। রাষ্ট্রের বিপর্যয়ে রাষ্ট্রকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। এটিও আমাদের এই চতুর্থ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা

'সদা সত্য কথা বলিবে', এই নির্দেশটির সঙ্গে আমাদের আবাল্য পরিচয় ঘটে; সত্য কথা বলা, সত্যকে প্রকাশ করা এটি আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অন্যতম প্রধান অনুশাসন হলো : "thou shalt not lie'. অনৃত ভাষণের বিরুদ্ধে এই নির্দেশ সর্বদা পালনীয়। সত্য রক্ষা করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন। আমরা যে চুক্তি করি, আমরা যে অঙ্গীকার করি সেগুলি যাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের কর্তব্য; কথায় ও কার্যে যেন কোনও বৈষম্য না থাকে। আমরা যা বলি, আমরা যা ভাবি, তার সঙ্গে যেন আমাদের কর্মের সঙ্গতি থাকে। সত্যের ব্যবহারিক অর্থ হ'ল কাজ ও কথার মধ্যে সঙ্গতি এবং কথার ও চিন্তার মধ্যে সঙ্গতি। এই দ্বিবিধ সঙ্গতি রক্ষা ক'রে তবেই সত্যের প্রতি যথোচিত মর্যদা প্রদর্শন করা যেতে পারে।

(চ) প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা

মানুষের প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখান, সেই প্রগতিকে রক্ষা করার চেষ্টা

করা আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ। এই কর্তব্যটুকু করতে পারলে আমরা পৃথিবীর উন্নতি সাধন করতে পারব। আমাদের প্রত্যেককে আমাদের অবস্থানুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। কায়মনোবাক্যে আমরা আমাদের এই কর্তব্যটুকু পালন করব। তা না করলে সমগ্র মানবজাতির প্রগতি সম্ভব হবে না।

বিবেক-বিচার বিদ্যা (Casuistry)

Casuistry কথাটিকে আমরা বিবেক-বিচার-বিদ্যার সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করেছি। এই বিদ্যা নৈতিক বিধিবিধানের ভাষ্যটিকা রচনা করে, সঠিক ব্যাখ্যা করে কোনও একটি জটিল নৈতিক সমস্যার সমাধানের পথনির্দেশ করে। ব্যবহারিক জীবনে অনেকসময় দেখা যায় যে হয়তো অপরের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে আমরা সত্য রক্ষা করিতে পারি না। অথবা সত্য রক্ষা করতে চাইলে জীবনকে বিসর্জন দিতে হয়। জীবন রক্ষা করা ও সত্য রক্ষা করা, এ দুটোই আমাদের কর্তব্য। সুতরাই এক্ষেত্রে আমরা কোন্ কর্তব্যটি পালন করব? দুটি কর্তব্যের যখন সংঘাত ঘটে তখন আমাদের অন্তরের বিবেকই আমাদের পথনির্দেশ করে। বিবেক বলে দেয় কোন কাজটি আমাদের করা উচিত। এক্ষেত্রে একটি কর্তব্য পালন করলে অন্য কর্তব্যটি লঙ্ঘিত হয়; অতএব আমরা নৈতিক বিধানকে খর্ব করি। Casuistiny বা বিবেক বিচার বিদ্যা আমাদের বলে দেয় কি ধরনের অবস্থার মধ্যে আমরা কোন্ কোন্ নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করতে পারি।

এই ধরনের কর্তব্যে কর্তব্যে যখন বিরোধ বাধে তখন সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করার জন্য জেস্যুইট সম্প্রদায় এই বিবেক-বিচার-বিদ্যার (Casuistry) আশ্রয় নিতে বললেন। প্রখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ্ G. E. Moare বললেন যে মানুষের জীবনে কর্তব্যের সংঘাত থাকবেই। সুতরাং নৈতিক অনুসন্ধান কার্যও অব্যাহতভাবে চলবে। অতএব তিনি বললেন যে নৈতিক জিজ্ঞাসার লক্ষ্যস্থল হল এই Casuistry বা বিবেক-বিচার-বিদ্যা। দার্শনিক Bradley বললেন যে নীতিশাস্ত্র প্রয়োগবিদ্যা (Art) নয়। সুতরাং কর্তব্যের সংঘাত নিরসনের কাজ নীতিশাস্ত্রের নয়।

এই কর্তব্যের সংঘাত-তত্ত্বের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো যে সত্যিকারের কর্তব্যের সংঘাত ঘটে না। জীবনের কোনও একটি পরিস্থিতিতে আমাদের একটিমাত্র কর্তব্যই থাকে। আমরা যখন পরিস্থিতিটিকে বুঝতে ভুল করি তখনই আমাদের কর্তব্য কর্মটি অন্য রূপ নেয়। দার্শনিক

Green বললেন, জীবনের প্রত্যেকটি পরিস্থিতেই আমাদের একটিমাত্র কর্তব্যই থাকে। অবশ্য ঘটনার জটিলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের কর্তব্য বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আমরা আমাদের কর্তব্যটুকু সঠিক বুঝতে পারি না। নৈতিক অন্তর্দৃষ্টির বলে আমরা আমাদের এই কর্তব্যটিকে সহজেই ধরতে পারি। কিন্তু আমাদের কুসংস্কার, আমাদের আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের বিচারকে আচ্ছন্ন করে দেয় বলে আমাদের কর্তব্যের স্বরূপটিকে আমরা ধরতে পারি না। তখন একই পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের কর্তব্যের কথা ভাবে। আমাদের নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যখন ঠিক-মত কাজ করে না, আমরা যখন স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হই, আবেগের দ্বারা চালিত হই, তখনই আমাদের নৈতিক বিচারের বিভ্রান্তি ঘটে। একই পরি-স্থিতিতে রাম যাকে কর্তব্য বলে মনে করে, শ্যাম তাকে কর্তব্য বলে মনে করে না। এই যে একই পরিস্থিতিতে কর্তব্যের রকমফের হচ্ছে এটা একেবারেই অযৌক্তিক। যদি কর্তব্যের হেরফের না হয় তাহলে বিবেক-বিচার-বুদ্ধি বা Casuistry-র কোন মূল্য থাকে না।

Casuistry আমাদের কর্তব্য বিচ্যুতির একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে সাহায্য করে। আমরা যখন নির্দ্ধারিত কর্তব্য পালনে অপারগ হই এবং বিকল্প কর্তব্য করে মনে করি যে আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছি তখন নৈতিক বিধি লঙ্ঘনের কারণ প্রদর্শন করার জন্য, এই ব্যতিক্রমকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা Casuistry-র শরণাপন্ন হই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে Casuistry পরোক্ষ ভাবে নৈতিক অনাচারের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে।

আমরা তখনই কর্তব্যের দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের কথা বলি, যখন আমরা এই পরিস্থিতিতে একাধিক কর্তব্যের কথা ভাবতে পারি। এই একাধিক কর্তব্যের কথা আমরা তখনই বলতে পারি যখন আমরা স্বীকৃত নৈতিক বিধি-বিধানগুলির আক্ষরিক পালনে উৎসাহিত হই। যদি আমরা অবস্থার তারতম্য অনুসারে কারকের অভিপ্রায়, প্রেরণা, ও মনোবৃত্তি অনুসারে কর্তব্য কর্মের রূপটি নির্দেশ করার চেষ্টা করি তাহলে কর্তব্যের সংঘাত' কথাটি অর্থহীন হয়ে পড়বে; Casuistry'ও অবান্তর বলে প্রতীয়মান হবে।

বিধিবদ্ধ নৈতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা যখন কাজ করতে পারি তখন সেই কাজ হবে নীতিসঙ্গত; এই মত হল Casuistry বাদীদের মত। অতএব বলা যেতে পারে যে Casuistry-র মতে কার্যের নৈতিক মূল্য-নির্ধারণের মানদণ্ড হল সমাজ স্বীকৃত আইন (Legal View of Morality)। এই আইনের সঙ্গে আমাদের কাজের অসংগতি ঘটলে সে কাজ নীতিভ্রষ্ট হয়ে

পড়বে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে Casuistry বাদীদের মতে কর্মীর কোনও স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা নেই ; বাহ্য, নৈতিক বিধিবিধান মানলেই তাদের কাজ ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য হবে ; তাদের নৈতিকবোধটুকু জাগ্রত না হলেও চলবে। কিন্তু এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয় ; কেন না স্বীকৃত নৈতিক বিধিবিধান মেনে আমরা আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারি না। এই আত্মোপলব্ধির পথই হল শাশ্বত নৈতিক মূল্যের পথ। সেই আত্মোপলব্ধিই (Self realisation) হল এই শাশ্বত নৈতিক মূল্য। এ পথ ছাড়া কোনও দ্বিতীয় পথ নেই : নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

কর্তব্য কর্ম : সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতা (Duties : Perfect and Imperfect obligation)

কর্তব্য কর্মের স্বরূপ কি ; এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা খুবই শক্ত। দার্শনিক কাণ্ট কর্তব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে দুই শ্রেণীর কর্তব্য আছে : (ক) Duties of perfect obligation অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাধ্য বাধক কর্তব্য এবং (খ) Duties of Imperfect obligation অর্থাৎ অসম্পূর্ণ বাধ্য বাধক কর্তব্য। সম্পূর্ণ বাধ্য বাধক কর্তব্যগুলির চরিত্র প্রধানতঃ অনর্থক (Negative) হয়। যেমন হত্যা করিও না ; চুরি করিও না ; মিথ্যা কথা বলিও না—এ সবই হ'ল সম্পূর্ণ বাধ্য বাধক কর্তব্যের উদাহরণ। কেন না চুরি করা ; খুন করা ; মিথ্যা কথা বলা ; এ সবই খুব গর্হিত কাজ ; এবং আমাদের কর্তব্য হ'ল এর কোনটি না করা। এই 'না করার' নির্দেশের কোনও ব্যতিক্রম নেই ; এর কোনও রূপভেদ বা প্রকারভেদও নেই।

কিন্তু অসম্পূর্ণ বাধ্য বাধক কর্ম হ'ল সদর্থক বা Positive। যেমন দয়া দাক্ষিণ্য। দীন দরিদ্রকে দয়া করা আমাদের কর্তব্য ; কিন্তু এই কর্তব্যের স্বরূপটুকুর চরিত্র বহুলাংশে নির্ভর করে স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। এই ধরনের কর্তব্যের মধ্যে নিরপেক্ষ বাধ্যবাধকতার (Absolute obligation) এর স্থান নেই। দার্শনিক Mill এই ধরনের সূত্র অবলম্বন ক'রে ন্যায় বিচার (justice) এবং দয়া দাক্ষিণ্যের ভেদটুকু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ বাধ্যবাধক কর্তব্যকে তিনি ন্যায় বিচার বা Justice এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন : এই ধরনের কর্তব্যের সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ অধিকার ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই অধিকারগুলির হানি ঘটালে Mill শাস্তিদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এক শ্রেণীর কর্তব্য রয়েছে যেগুলি রাষ্ট্র অথবা সমাজ কেউই জোর করে নাগরিকদের করাতে পারে না ; এ ধরনের কর্তব্যগুলি স্বেচ্ছাবৃত্ত।

এগুলি (Benevolence) দয়া দাক্ষিণ্যের পর্যায়ভুক্ত। এগুলিকে অসম্পূর্ণ বাধ্যবাধক কর্তব্য বলা হয়।

Kant এবং Mill কথিত কর্তব্যের এই শ্রেণীকরণ গ্রাহ্য নয়। যে কর্তব্য ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে করাতে হয় সে কর্তব্য তার নৈতিক মূল্য হারিয়ে ফেলে। আমাদের মতে যেগুলি আমাদের কর্তব্য সেগুলি সম্পন্ন করতে আমরা সব সময় বাধ্য ; কর্তব্য বললে আমরা সম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতাকেই বুঝব এবং এই কর্তব্যটুকু সুসম্পন্ন করার আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে। দার্শনিক Kant ও Mill এর বিচার এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয় নি। কারণ তাঁরা সু-বিচারের দৃষ্টিকোণ (Justice) থেকে এই পার্থক্যটুকু করেছেন, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাঁদের এই বিভ্রান্তি ঘটত না।

"আমার সামাজিক অবস্থা ও আমার কর্তব্য" : দার্শনিক Bradley-র মত।

মানুষের জন্মগত অধিকার উপজাত হয় তার পিতামাতা, তার পরিবার ও তার পরিবেশ থেকে ; সে কতকগুলো বিশেষ ধরনের শক্তিসামর্থ্য নিয়ে জন্মায়। সে যে ঘরে জন্মেছে সে পরিবেশেই তার কর্তব্য কর্ম, তার জীবনের কল্যাণ অকল্যাণ, এ সবকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। কর্মকারের ছেলে কর্মকার হিসেবে তার কর্তব্য সম্পাদন করবে; আর যদি কর্মকারের ছেলে স্বর্ণকার হয়, সেদিকেই তার প্রতিভা বিকাশের পথ খোঁজে, তবে তার কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারিত হবে স্বর্ণকার হিসেবেই। স্বর্ণকার হিসেবে কর্মকারের কাজ সে করবে না ; সে সম্বন্ধে তার কোনও দায়িত্ব থাকবে না। সমাজে সে যে বৃত্তিগ্রহণ করেছে তার সে বৃত্তিগত স্থানই তার কর্তব্য, তার নৈতিক আদর্শ এসবই নির্দিষ্ট করে দেবে। একজন শিক্ষকের যে কর্তব্য এবং নৈতিক আদর্শ তা একজন ছাত্রের নৈতিক আদর্শ ও কর্তব্যের থেকে ভিন্ন ; বিচারপতি এবং আইনজীবি এ দু'জনার আদর্শে ও কর্তব্যে অনেক প্রভেদ। শাসক ও শাসিতের আদর্শ ও কর্তব্য এক নয়। অতএব দার্শনিক Bradley কথিত সত্যটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যে প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারিত হবে তার সামাজিক বৃত্তি ও পদমর্যাদা অনুসারে। এই আলোচনার সূত্র অনুসরণ ক'রে আমরা কর্তব্য কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম শ্রেণীর কর্তব্য হ'ল : অপরের এবং নিজের ধন প্রাণ ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। এই ধরনের সাধারণ কর্তব্য অন্য দশজনের মত আমাকেও পালন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমাকে সমাজে আমার

বিশেষ স্থান ও পদমর্যাদা অনুসারে কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য করতে হবে। এই কর্তব্যগুলি সাধারণতঃ আমি যে বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাস করি তার উপর নির্ভরশীল, এই ধরনের সামাজিক পরিবেশ প্রধানত স্থিতিশীল এবং এই ধরনের কর্তব্যগুলিও তাই পরিবর্তনশীল হয় না। এরা হ'ল দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তব্য। এছাড়াও আর এক শ্রেণীর কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এগুলিও মূলতঃ আমাদের পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমাদের কোন কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রায়ই পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তমান পারিপার্শ্বিকের উপরে নির্ভরশীল যে সব কর্তব্য তারও পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ দিই : একজন জননেতা যখন মন্ত্রী হ'ন তখন তাঁর কর্তব্যকর্মের যে পরিবর্তন ঘটবে এ কথা বলাই বাহুল্য। জননেতা ও মন্ত্রীর কর্তব্য এক নয়। এই ধরনের কর্তব্য হ'ল তৃতীয় শ্রেণীর কর্তব্য।

আমাদের প্রধানতম কর্তব্য :

আমাদের কর্তব্যাকর্তব্যের মধ্যে প্রধান হ'ল আত্মোপলব্ধি করা। আত্ম উপলব্ধি বলতে আমরা বুঝি আমাদের আদর্শসত্তাকে জীবনে সত্য করে তোলা ; এই আদর্শ সত্তাকে সত্য করে তোলার অর্থ হ'ল আমাদের বুদ্ধিগত জীবন, আমাদের সামাজিক জীবন, এক কথায় আমাদের সার্বিক মূল্যবোধের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। অতএব আত্মোপলব্ধি করাই হ'ল আমাদের প্রধানতম কর্তব্য। এই মূল এবং মুখ্য কর্তব্য থেকেই অন্য সব গৌণ কর্তব্য নির্গত হয়। এই যে প্রধানতম কর্তব্যরূপে আত্মোপলব্ধিকে চিহ্নিত করা হ'ল, এই আত্মোপলব্ধিই আবার প্রধানতম নৈতিক বিধিকে নির্দিষ্ট করে দেয়। প্রধানতম নৈতিক বিধি কী ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে এই বিধির স্বরূপ লক্ষণ হ'ল যে এই বিধি আমাদের আত্মোপলব্ধি করতে নির্দেশ দেয়। আমাদের আদর্শ জীবনে বুদ্ধিগত আদর্শ, মূল্যগত আদর্শ এ সবই সত্য হয়ে ওঠে। এই আদর্শকে জীবনে বাস্তব করে তোলার অর্থই হল আত্মোপলব্ধি। আত্মোপলব্ধির ধারণা এতো ব্যাপক যে এর অর্থকে সুনির্দিষ্ট করে তুলতে হলে কতকগুলি নির্দিষ্ট নৈতিক বিধিবিধানের প্রয়োজন হয়। যখনই এই সব বিধিবিধানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায় তখনই আমাদের আত্মোপলব্ধির মুখ্য কর্তব্যটির দিকে লক্ষ্য রেখে এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে হয়।

কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ

কর্তব্যকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :—

(ক) নিজের প্রতি কর্তব্য ; (খ) অপরের প্রতি কর্তব্য ; (গ) ভগবানের প্রতি কর্তব্য। অর্থাৎ কর্তব্যকে আত্মকেন্দ্রিক, পরকেন্দ্রিক ও আদর্শকেন্দ্রিক কর্তব্য, এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিজের প্রতি কর্তব্য বা আত্ম-কেন্দ্রিক কর্তব্য বলতে আমরা বুঝি (১) শারীর কর্তব্য (Physical duty) (২) অর্থনীতিগত কর্তব্য (Economic duty) (৩) বুদ্ধিগত কর্তব্য (Intellectual duty) (৪) সৌন্দর্যগত কর্তব্য (Aestheitc duty) ও (৫) নৈতিক কর্তব্য (Moral duty).

শারীর কর্তব্য বা দেহগত কর্তব্য বলতে আমরা বুঝি আত্মরক্ষা করা, নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং একটু আধটু আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে অবকাশ বিনোদন করা। এ সবই হ'ল আমাদের শারীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের নৈতিক শক্তির জন্যই শরীরটাকে সুস্থ এবং সবল রাখা দরকার ; শরীর সুস্থ না থাকলে উচ্চতর মানের কোন জীবন সাধনাই সম্ভব হয় না। আত্মহত্যা করার আমাদের কোন অধিকার নেই ; কেননা আমাদের জীবনে অপরের অধিকার আছে।

সুন্দরভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত আয় বাড়ানো উচিত। আমাদের মিতব্যয়ী হতে হবে ; অর্থের অপচয় যুক্তি-সংগত নয়। সম্পদ বা বিত্তের অর্থনৈতিক মূল্য আছে। অর্থ ছাড়া পরমার্থের সন্ধান করা যায় না। উচ্চমানের মূল্যগুলিকে জীবনে সত্য করে তুলতে হলে অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য অর্থোপার্জনকে উপেয় হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। আমরা আমাদের মহত্তর নৈতিক আদর্শকে জীবনে সত্য করে তোলার উপায় হিসেবে অর্থসম্পদকে ব্যবহার করব ; এটাই হ'ল আমাদের অর্থনৈতিক কর্তব্য। বুদ্ধির সম্যক্ ব্যবহার ক'রে আমাদের জ্ঞানকে পূর্ণায়ত করতে হবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিবর্ধনের জন্য তার বুদ্ধির সম্যক্ বিকাশ ঘটাতে হবে। এটা আমাদের বুদ্ধিগত কর্তব্য ; এটি না করলে আমাদের বুদ্ধি খর্ব হয়ে থাকবে।

আমাদের সৌন্দর্যের জন্য যে তৃষ্ণা সে তৃষ্ণা মেটাতে হবে সুন্দর শিল্প-কলার সৃষ্টি ক'রে এবং সুন্দরের ধ্যান ক'রে। এটি আমাদের Aesthetic duty বা সৌন্দর্যের পিপাসা পূরণগত কর্তব্য। এই কর্তব্য আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে, আমাদের বিষম ক্ষুধাকে, আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে এবং আমাদের পাশব উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তবেই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিবর্ধন ঘটবে ; আমাদের নৈতিক কর্তব্য হ'ল আত্মসংযম ও আত্মশ্রদ্ধা অর্থাৎ নিজেকে শ্রদ্ধা করাও এই নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কল্যাণের উপাদান হিসেবে আমরা

সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করব। বুদ্ধিগত, সৌন্দর্যগত এবং নীতিগত মূল্যকে আমরা আত্যন্তিক মূল্যের সমার্থক জ্ঞান করব। এসব কর্তব্য হ'ল নিজের প্রতি কর্তব্য। প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই এই সব কর্তব্যগুলি অবশ্য করণীয়। এই আত্মকেন্দ্রিক কর্তব্যগুলি পালনের জন্য কতকগুলি আত্মকেন্দ্রিক ধর্ম বা সদ্‌গুণের প্রয়োজন হয়। এই গুণগুলি হ'ল সাহসিকতা, সংযম, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, মিতব্যয়িতা ও সংস্কৃতি। অপরের প্রতি কর্তব্য বা পরকেন্দ্রিক কর্তব্য বলতে আমরা আপনার পরিবার-পরিজনের প্রতি কর্তব্য, সমাজস্থ অন্যান্য মানুষের প্রতি কর্তব্য, দেশের প্রতি কর্তব্য, মনুষ্য সমাজের প্রতি কর্তব্য, প্রাণীজগতের প্রতি কর্তব্য এবং উদ্ভিদ জগতের প্রতি কর্তব্যকে বুঝি। পরিবার পরিজনের প্রতি কর্তব্য বলতে আমরা আমাদের পিতামাতার প্রতি কর্তব্যকে বুঝি। বাপ-মাকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা, আমাদের পবিত্র কর্তব্য। বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের সেবা করা আমাদের পুণ্য ব্রত। আমাদের ছেলে-মেয়েদের ভালোবাসাও আমাদের অন্যতম কর্তব্য। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের শিক্ষার প্রসার করা, এবং চরিত্রকে রক্ষা করা এ সবই আমাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। ছেলে-মেয়েদের জীবিকা নির্বাহের পথ দেখিয়ে দেওয়াও পিতামাতার কাজ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত। তারা পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, একে অপরকে আপনার সমান বলে ভাববে। স্বামী যেন স্ত্রীকে কখনও নিজের থেকে ছোট না ভাবে। সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতি কর্তব্য প্রধানতঃ সত্য, সমতা-বোধ, ঔদার্য প্রভৃতি গুণকে আশ্রয় ক'রে আবর্তিত হবে। সত্য কথা বলার অভ্যাস আমাদের করতে হবে। আমাদের কথায় ও কাজে কোন ব্যবধান থাকবে না। কোনও অঙ্গীকার করলে সে অঙ্গীকার রাখার জন্য আমাদের সকল সময় চেষ্টা করতে হবে। মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা নিজেরা অপরের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার আশা করব যেন ঠিক সেই ব্যবহারই অপরের প্রতি করি। অপরের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ ক'রে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা যেন কখনও সচেষ্ট না হই। অপরের ব্যক্তিত্বকে উপায় হিসাবে গণ্য করা পাপ। অতএব তাকে উপেয় হিসেবে গণ্য করা উচিত। সমাজের অন্যান্য মানুষকে উপেয় হিসেবে গণ্য করলে তাদের স্বাধীনতা ও সম্পদ অপহরণ ক'রে আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করতে পারব না। অপরের অখ্যাতি রটিয়ে আমি যেন নিজের স্বার্থসিদ্ধি না করি। অপরের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হওয়া পাপ। সেটা করলে আমি আমার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব। আমি অপরের যদি প্রাণনাশ করি

তাহলে সেটা হবে মহাপাপ। হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে সবার জন্য সদিচ্ছা ও শুভেচ্ছার বাণী বহণ ক'রে আনা আমার কর্তব্য। আমি যেন চিন্তায় এবং কর্মে অন্য মানুষের ক্ষতি সাধন না করি। মানুষের সমদৃষ্টির কল্যাণের জন্য এইসব কর্তব্যগুলি আমার অবশ্য পালনীয়। আর্তের জন্য দয়া ও সেবা করা হ'ল ঔদার্য; সমাজের সবার প্রতি উদার ব্যবহার করা আমার কর্তব্য। দেশের মানুষের সেবা করা, দেশকে ভালবাসা, দেশের সর্ববিধ অবস্থার উন্নতি সাধন করা, দেশের গৌরবে গৌরব বোধ করা, এ সবই আমার কর্তব্য। এক কথায় দেশপ্রেম হ'ল মানুষের মুখ্য কর্তব্যগুলির অন্যতম। দেশকে ভালবাসা ছাড়াও সমগ্র মানবসমাজকে ভালবাসার একটা দায়িত্ব আমাদের আছে। সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্য, জাতিগত শ্রেষ্ঠতার ধারণা এবং সংকীর্ণ দেশপ্রেমকে পরিত্যাগ ক'রে আমাদের বিশ্বপ্রেমের সাধনা করতে হবে। যে সমাজে আমরা বাস করি তার নিয়মশৃঙ্খলায় আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। সমগ্র মানব জাতির প্রগতিতে আমাদের আস্থা স্থাপন করতে হবে। বিশ্বমানবিকতার ধর্ম পালন হবে আমাদের কর্তব্য। জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, তাদের যথা-যথ পরিপালন, আমাদের কর্তব্য। তাদের ক্ষুধায় অন্ন দেওয়া, আশ্রয় দেওয়া, রোগে তাদের ঔষধ পথ্য দেওয়া এ সবই আমাদের করণীয়। আমাদের ক্ষণিক আনন্দের জন্য আমরা যেন তাদের হনন না করি, যেন তাদের প্রতি নিষ্ঠুর না হই। এই প্রাণাজগতের প্রতি যেমন আমাদের দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের একটা কর্তব্য আছে— তেমনি সেটা রয়েছে উদ্ভিদ জগতের প্রতিও। আমরা যেন গাছপালা লতাগুল্মের যথাযথ পরিচর্যা করি; এগুলি হ'ল প্রকৃতির প্রতি আমাদের কর্তব্যের অন্তর্গত। এই পরকেন্দ্রিক কর্তব্যগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে গুণ বা ধর্ম থাকে তাকে পরকেন্দ্রিক ধর্ম বলা হয়। এই পর-কেন্দ্রিক ধর্ম হ'ল দ্বিবিধ :— ন্যায়পরায়ণতা, ও পরহিতৈষিতা।

তৃতীয় শ্রেণীর কর্তব্য হ'ল আমাদের আধ্যাত্মিক কর্তব্য বা ভগবানের প্রতি মানুষের কর্তব্য। তাঁর কাছে প্রতিদিন আমাদের প্রার্থনা করা উচিত; প্রার্থনার পথে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত। নিয়ত প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ভগবানকে পূজা করব, তাঁকে শ্রদ্ধা করব, তাঁকে বলব, তিনি যেন আমাদের রক্ষা করেন। তাঁর ইচ্ছায় আমাদের ইচ্ছাকে সমর্পণ করব; আমাদের সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ ক'রে তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসব। এইভাবে আমাদের ভগবদ্ প্রেম প্রকাশ পাবে এবং সেটুকু করাই হ'ল আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অবশ্য এ ভগবদ্ প্রেম প্রকাশ পাবে মানুষের প্রতি ভালোবাসায় ও মানুষের সেবায়। মানুষকে ভালো না বাসলে, মানুষের সেবা

না করলে ভগবানের প্রতি কর্তব্য কর্মের কোনও অর্থ থাকবে না। এ মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আমাদের যে গুণ বা ধর্মটুকু থাকা একান্ত প্রয়োজন তাহ'ল বুদ্ধিগত গুণ (Intellectual virtue), নৈতিক গুণ (Moral Virtue) এবং সৌন্দর্য সম্পর্কিত গুণ (Aesthetic Virtue).

পঞ্চদশ অধ্যায়

কর্তব্য ও ধর্ম

কতব্য ও ধর্মের (বাধ্যবাধ্যকতা বোধ) ব্যাখ্যা—কর্তব্যের স্বরূপ—কর্তব্য ও ধর্মের সম্পর্ক নিরূপণ—কর্তব্য ও ধর্মের মিশ্র শ্রেণীবিভাগ—আত্মকেন্দ্রিক কর্তব্য ও ধর্ম—পরকেন্দ্রিক কর্তব্য ও ধর্ম—পরকেন্দ্রিক ধর্ম : ন্যায়পরায়ণতা ও পর-হিতৈষণা—আদর্শগত কর্তব্য ও ধর্ম—কর্তব্য ধর্মের শ্রেণীবিভাগ ও তার সমালোচনা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কর্তব্য ও ধর্ম (Duties and virtues)

কর্তব্য ও ধর্মের সম্বন্ধ নিরূপণ করতে হলে প্রথমেই আমাদের যে কথাটি মনে পড়ে সেটি হ'ল কর্তব্যের স্বরূপ কি? কর্তব্য কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, যে কাজ আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছে দেবার পথে সহায়ক হয় তা হ'ল কর্তব্য কর্ম; এই কর্তব্য কর্মই হল ন্যায়সঙ্গত কাজ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কর্তব্য কর্মের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত কর্মের একটা আত্যন্তিক যোগ আছে। এই যোগটুকু থাকার জন্যই কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আমরা এক ধরনের বাধ্যবাধকতা বোধ করি। কোন কাজকে আমার করণীয় কর্ম বলে বুঝতে পারলে অর্থাৎ তাকে কর্তব্য বলে মনে করলে সেই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য এক ধরনের বাধ্যবাধকতাবোধ (Sense of obligation) আমাদের পীড়া দেয়। যতক্ষণ না সেই কাজটি সম্পন্ন করতে পারছি ততক্ষণ শান্তি পাই না। এই কর্তব্য কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নীতিশাস্ত্রবিদ Lillie বললেন: কর্তব্যের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় যে সার্বিক কল্যাণের নামে সমাজের মানুষেরা একক-ভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে যখন আমাদের কাছে কোন বিশেষ দাবী নিয়ে উপস্থিত হয় তখন সেই দাবী পূরণের জন্য আমরা যে বাধ্যবাধকতাবোধ অনু-ভব করি, তা হ'ল কর্তব্যের নামান্তর। অর্থাৎ আমার কর্তব্য সমাজের অন্যান্য মানুষদের দাবী ও প্রত্যাশার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।" 'A duty may thus be defined as the obligation of an individual to satisfy a claim made upon him by the community, or some other individual member or members of that community in the name of the common good.' লিলীর এই সংজ্ঞার অর্থ হ'ল এই যে সমাজের মানুষেরা সমাজের জনগণের কল্যাণের নামে কোন একটি দাবী নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়; তখন সেই দাবী মিটিয়ে দেবার জন্য আমি মনে মনে যে বাধ্যবাধকতা অনুভব করি সেই বাধ্যবাধকতার বোধই হলো আমার কর্তব্যের অনুসঙ্গী।"

এই যে আমরা কর্তব্যের চরিত্র ব্যাখ্যা করলাম এই ব্যাখ্যার পরি-প্রেক্ষিতে আমরা ধর্ম বা Virtue শব্দটির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করব। আমরা

ধর্ম বলতে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করবার স্থায়ী অভ্যাসটুকুকে বুঝি। আমরা যখন প্রতিনিয়ত আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে করতে সে সম্বন্ধে একটি স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তুলি এবং সেই অভ্যাসবশেই কর্তব্য করে যাই তখন সেই স্থায়ী অভ্যাসকেই আমরা ধর্ম বলি। এই ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরকে বিশ্বাস বা ঐ ধরনের কোন অলৌকিক আনুষঙ্গিক ব্যপারের যোগ নেই। এই কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের অভ্যাস আমাদের স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়; তখন আমরা নিজেদের সৎ বা ধার্মিক বলি। তাহলে বোঝা গেল যে ধর্ম বা Virtue হ'ল অভ্যাসগত। আমরা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে এই অভ্যাস গঠন করতে পারি। দার্শনিক Aristotle বললেন : "ধর্ম হ'ল আমাদের স্থায়ী মানসিক অবস্থা; ইচ্ছার দ্বারা এই মানসিক অবস্থাটি সৃষ্ট হয়; বাস্তব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এই মানস অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই শ্রেষ্ঠ আদর্শটি অবশ্য আমাদের যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ওঠে।" 'Virtue is a permanent state of mind, formed with the concurrence of the will and based upon an ideal of what is best in actual life— an ideal fixed by reason'. অর্থাৎ এ্যারিষ্টট্‌ল্ বললেন যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা গঠিত মনের স্থায়ী অবস্থাকে ধর্ম বলা যেতে পারে। এই ধর্মের ভিত্তি হ'ল মানুষের বিচার বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সর্বোৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ; অর্থাৎ আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা যে পরমতম আদর্শকে বিচার বুদ্ধির দ্বারা পরিমাপ ক'রে নিয়ে জীবনে গ্রহণ করি তা হল আমাদের ধর্মের ভিত্তি। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে এ সত্যটি সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে কর্তব্য সম্পাদন করার প্রবৃত্তির সঙ্গে এই ধর্ম বা Virtue-র একটা আত্যন্তিক যোগ রয়েছে, একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মানুষকে এই ধর্ম অর্জন করতে হয়। এ ধর্ম মানুষের স্বভাবজাত নয়। এ ধর্মকে আমরা অর্জিত গুণ বলতে পারি। দার্শনিক Muirhead বললেন যে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার যথোপযুক্ত গুণই হ'ল ধর্ম বা virtue। অতএব এই অর্থে কর্তব্য কর্ম ও ধর্মের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

কর্তব্য ও ধর্মের সম্পর্ক নিরূপণ :—

কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের জন্য আমাদের মনের যে স্থায়ী ভাব তাকেই আমরা ধর্ম বলেছি। অতএব বলা চলে কর্তব্য এবং ধর্ম হ'ল একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন দিক। এদের মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। মানসিক বা মনের ব্যাপারকে আমরা ধর্ম বলি; এবং সেই মানস প্রবৃত্তি যখন আচরণে প্রকাশ পায় তখন তাকে বলি কর্তব্যকর্ম। অন্তরের গুণই হল ধর্ম এবং

সেই ধর্মের বাইরের প্রকাশটুকুই হ'ল কর্তব্য। উদাহরণ দিই পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি বা শ্রদ্ধা হল সন্তানের গুণ বা ধর্ম (virtue)। এই ধর্মকে চোখে দেখা যায় না, এ হল অন্তরের জিনিস। আবার আচার আচরণের মাধ্যমে সন্তানের পক্ষে তার পিতামাতার প্রতি এই অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই হ'ল সন্তানের কর্তব্য। অতএব আমরা বলতে পারি যে কর্তব্য এবং ধর্মের মধ্যে যে আত্যন্তিক যোগটুকু রয়েছে তা হ'ল কর্তব্যের মধ্য দিয়ে ধর্ম আপনাকে প্রকাশ করে। তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় কর্তব্য এবং ধর্ম, duty and virtue, এরা হ'ল সাপেক্ষ পদ বা co-relative terms। ধর্মকে আমরা যদি চরিত্রের সৎ গুণ বা excellence বলি তাহলে কর্তব্যকর্মকে বলব মানুষের আচার আচরণের মধ্য দিয়ে ঐ সৎ গুণের প্রকাশ।

কর্তব্য ও ধর্মের মিশ্র শ্রেণী বিভাগ (Combined classifications of duty and virtue)

কর্তব্য ও ধর্মের প্রকৃতিগত একরূপতা থাকার জন্য একই বিজ্ঞানে নীতির অনুসরণ ক'রে আমরা এদের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। কর্তব্য ও ধর্মকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে :— (১) আত্মকেন্দ্রিক (self-regarding) (২) পরকেন্দ্রিক (other regarding) এবং (৩) আদর্শ কেন্দ্রিক (ideal-regarding)।

আত্মকেন্দ্রিক কর্তব্য ও ধর্ম (Self-regarding duties and virtues)

আমরা আমাদের আপন আপন কল্যাণের জন্য যে সব কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে থাকি তাকে আত্মকেন্দ্রিক কর্তব্যকর্ম বলা হয় ; এবং এই ধরনের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যে সব সৎ গুণের প্রয়োজন হয় তাকে আত্মকেন্দ্রিক ধর্ম বলা হয়। আত্মকেন্দ্রিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যে সব সৎ গুণের প্রয়োজন হয় তারা হ'ল : (ক) সাহসিকতা বা courage, (খ) সংযম বা temperance, (গ) শ্রমশীলতা বা industry, (ঘ) অধ্যবসায় বা perseverance, (ঙ) মিতব্যয়িতা বা frugality এবং (চ) কৃষ্টি বা culture।

প্রথমেই আমরা সাহসিকতা বা courage নিয়ে আলোচনা করব। দুঃখ বোধের ভয়কে দমন করার বৃত্তিই হলো সাহসিকতা। কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে আমরা নানা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হই ; নানা বাধা বিপত্তি আসে। দুঃখ কষ্ট এবং বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হলে সাহসিকতার একান্ত প্রয়োজন হয়। কর্তব্য কর্মের সম্পাদনের জন্য এই সাহসিকতার গুরুত্বকে অস্বীকার করা চলে

না ; তাই Plato বললেন যে প্রাথমিক স্তরের গুণ হিসাবে সাহসিকতার গুরুত্ব অসাধারণ।

দ্বিতীয় ধর্ম হ'ল সংযম। সংযম আমাদের নৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান গুণ। আমরা আমাদের বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের প্রবৃত্তির নিম্নগামিতাকে রুদ্ধ করে দিয়ে যখন বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের উচ্চতম প্রবৃত্তিগুলিকে প্রাধান্য দিতে পারি তখনই সংযম বা temperence আমাদের মধ্যে প্রকট হয়। সংযম আমাদের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ।

তৃতীয় ধর্ম হ'ল শ্রমশীলতা বা industry ; আমরা জীবনে যে ধরনের পরিশ্রম করি, তা মুখ্যতঃ ভবিষ্যতে উচ্চতর কল্যাণ লাভের দিকে প্রধাবিত হয়। অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতে ভালো হবে এই আশায় বর্তমানে কঠোর পরিশ্রম করি ; অনেক সময়ে এর ফলে আমরা বর্তমানে আরাম ও সুখ শান্তিকেও ত্যাগ করে থাকি। শরীর মনকে এই ভাবে সক্রিয় করে তোলাই হ'ল শ্রমশীলতা। এই শ্রমশীলতাই আমাদের বিভিন্ন সদ্‌গুণ অর্জনে সহায়তা করে।

চতুর্থ ধর্ম হ'ল অধ্যবসায় বা perseverance ; অধ্যবসায় হ'ল কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বারবার চেষ্টা করা। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ক'রে যারা আপন লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে Robert Bruce এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যবসায়ী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর নাম স্মরণীয়। নীতিশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যবসায় বলতে আমরা বুঝি, উপস্থিত দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করে সাময়িক আরাম ও সুখ শান্তির দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে স্থায়ী ও উচ্চতর কল্যাণ লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করা।

পঞ্চম ধর্মটি হল মিতব্যয়িতা বা frugality ; আমরা অনেক সময়ে অর্থ, শক্তি এবং সামর্থ্যের অপচয় এবং অপব্যবহার করি। অকারণে শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং সামর্থ্যের অপব্যয় না করার যে গুণ তাকে বলা হয় মিতব্যয়িতা।

ষষ্ঠ ধর্মটি হ'ল কৃষ্টি বা culture ; কৃষ্টি বলতে আমরা বুঝি আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ ; এর ফলেই আমাদের ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট হয়। সুতরাং বলা চলে যে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের যে প্রচেষ্টা তা হ'ল আমাদের অন্যতম প্রধান নৈতিক ধর্ম।

পর-কেন্দ্রিক কর্তব্য ও ধর্ম (Other regarding duties and virtues)

আমরা যেমন আপন আপন কল্যাণ সাধনের জন্য কিছু কিছু কর্তব্য সমাধা করি, তেমনি কখন কখন সমাজের অন্যান্য মানুষদের কল্যাণ সাধনের

অন্যাও কিছু কিছু কর্তব্য করে থাকি। এই ধরনের কর্তব্যকে পর-কেন্দ্রিক কর্তব্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই ধরনের কর্তব্য সাধনের লক্ষ্য বস্তু হ'ল অপরের কল্যাণ। একে পর-কেন্দ্রিক কর্তব্য বলা হয়েছে এবং এই ধরনের কর্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে গুণ তাকে পর-কেন্দ্রিক ধর্ম বা other regarding virtue বলা হয়েছে। এই পর-কেন্দ্রিক ধর্ম দ্বিবিধ : (ক) ন্যায়-পরায়ণতা (justice) এবং (খ) পরহিতৈষণা (benevolence)।

প্রথমেই আমরা (ক) ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে আলোচনা করব। ন্যায়-পরায়নতা বলতে আমরা বুঝি সমাজের অন্যান্য মানুষদের সকল প্রকার ন্যায় সঙ্গত অধিকারকে স্বাকার করা। ন্যায্য পাওনাটুকু দিয়ে দিতে হয়। এই ধরনের অপরের অধিকার এবং তার ন্যায্য পাওনাটুকুকে স্বীকার করে নেওয়াই হল ন্যায়পরায়ণতার মর্ম কথা। 'Live and let live' অর্থাৎ আপনার বাঁচার অধিকারটুকুকে যেমন স্বতঃসিদ্ধরূপে আমরা গ্রহণ করে থাকি ঠিক তেমনি করেই অপরের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুকেও স্বীকার করতে হবে। অতএব ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে পক্ষপাতহীন আচরণ করা একান্ত প্রয়োজন ; এই ধরনের পক্ষপাতহীন, সাধু, কৃতজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের আমরা সাধারণতঃ ন্যায়পরায়ণ আখ্যা দিয়ে থাকি।

আমরা (খ) পরহিতৈষণার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলব যে মানুষের মধ্যে অপরের মঙ্গলসাধনের যে প্রবৃত্তি রয়েছে তাকেই সাধারণতঃ পর-হিতৈষিতা বলা হয়। অপরকে ভালোবাসা, অপরের প্রতি সহানুভূতি দেখান, অপরের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করা, এ সবই পরহিতৈষিতার অন্তর্ভুক্ত। আমরা সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে দুই ধরনের পরহিতৈষিতা ধর্মের দেখা পাই : (১) সামাজিক কাজে কর্মে আমি যাদের সঙ্গে স্ব-ইচ্ছায় সম্পর্ক গড়ে তুলেছি (voluntarily related) তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। যেমন আমি যদি কোন ক্লাব বা সংস্থার সদস্য হই, তবে সেই ক্লাব বা সংস্থার সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি দেখান আমার কর্তব্য। এ হ'ল এক ধরনের পরহিতৈষিতা (২) দ্বিতীয় ধরনের পরহিতৈষিতা হ'ল তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান যাদের সঙ্গে আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছি (involuntarily related) ; এ ক্ষেত্রে আমি যাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাই তাদের সঙ্গে সম্পর্কটুকু রাখা না রাখা আমার ইচ্ছার উপর নিভর করে না। যেমন ভাই-বোনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। সেই সম্বন্ধ জন্মগত। এ সম্বন্ধ আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরে নির্ভর করেনা। অতএব ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের যে সহানুভূতি সেই সহানুভূতি এই দ্বিতীয় ধরনের পরহিতৈষিতার অন্তর্গত।

আদর্শগত কর্তব্য ও ধর্ম : (Ideal regarding duties and virtues)

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে যে আদর্শগত কর্তব্য ও ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি। আদর্শগত কর্তব্য বলতে আমরা বুঝি সেই সব কর্তব্যকে যে সব বিশেষ বিশেষ কর্তব্য আমাদের কোন এক বিশেষ ধরনের আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করতে সাহায্য করে। যে গুণ বা ধর্ম থাকলে আমরা এই ধরনের আদর্শগত কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারি তাকেই আদর্শকেন্দ্রিক ধর্ম বলা হয়েছে। আমরা সাধারণতঃ তিনটি মহৎ আদর্শের সাধনা করি, জীবনে তাদের সত্য করে তোলার চেষ্টা করি। সেই আদর্শগুলি হ'ল সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শ।

সত্যের আদর্শকে জীবনে সত্য করে তুলতে হলে আমাদের কর্তব্য হবে সত্যের অনুসন্ধান করা। এই সত্যের যথাযথ অনুসন্ধান আমাদের পক্ষে তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের মধ্যে intellectual virtue অর্থাৎ বুদ্ধিগত-গুণ বা ধর্মটি প্রাধান্য পাবে। এই ধর্মটিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি সত্য কথা বলায়, সত্য কথা শোনায় এবং সত্যের উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে।]

সত্যের আদর্শের পরে যে আদর্শটি আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় সেটি হ'ল শিব বা কল্যাণের আদর্শ। এই আদর্শটিকে জীবনে সত্য করে তোলার জন্য আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত এবং এই ধরনের অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য যে সামগ্রিক প্রয়াস করতে হয় তার জন্য প্রয়োজন হয় moral virtue বা নৈতিক ধর্মের। নৈতিক ধর্ম হ'ল মঙ্গলময় ভগবানের, সর্ব নৈতিকগুণের আধার মঙ্গলময় ঈশ্বরের চিন্তা ও অনুধ্যান করা। এই ধরনের নৈতিক জীবন হ'ল সর্বাঙ্গসুন্দর। এই ধরনের সুন্দরকে লাভ করার জন্য মানুষের চেষ্টা করা উচিত; এটিও তার অন্যতম কর্তব্য। সুন্দরকে দেখা, সুন্দরকে ভালবাসা, সুন্দর পরিবেশে থাকার ইচ্ছা এ সবই হ'ল সুন্দরের পূজার অঙ্গ; এদেরই বলা হয়েছে সৌন্দর্যগত ধর্ম বা aesthetic virtue; অতএব সত্য, শিব ও সুন্দরকে লাভ করার জন্য যে সব কাজ আমাদের অবশ্য করণীয় তা হ'ল আদর্শকেন্দ্রিক কর্তব্য এবং সেই ধরনের কর্তব্য করার জন্য যে সব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন তারা হল আদর্শকেন্দ্রিক ধর্ম।

কর্তব্য ধর্মের শ্রেণী বিভাগের সমালোচনা

কর্তব্য ধর্মের সাধারণতঃ যে ধরনের শ্রেণী বিভাগ করা হয় যাকে তা মূলতঃ logical division বা তর্কশাস্ত্র সম্মত বিভজনের নীতির বিরোধী। আত্মকেন্দ্রিক, পর-কেন্দ্রিক ও আদর্শকেন্দ্রিক এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করলে

এই বিভাগকে cross division বা বহুভিত্তিক বিভজন দোষে দুষ্ট বলা যেতে পারে। যে কর্তব্যকে এবং ধর্মকে পরকেন্দ্রিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা মূলতঃ পরকেন্দ্রিক হলেও কিয়ৎপরিমাণে তা আত্মকেন্দ্রিকও বটে ; কেননা মানুষ যখন অপরের কল্যাণের সাধনা করে তখন সে আপন নৈতিক উন্নতি বিধানও করে। অপর পক্ষে যে কর্তব্য ধর্মকে সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক বলা হয়ে থাকে সেগুলিও কিছু পরিমাণে পরকেন্দ্রিক। যেমন আমরা যখন আত্ম-উন্নতির জন্য সাহসী এবং শ্রমশীল হয়ে উঠি তখন আমাদের সেই সদ্‌গুণের দ্বারা সমাজের অন্যান্য মানুষদের কল্যাণ সাধিত হয়। অতএব আত্মকল্যাণ এবং পরকল্যাণ এ দুয়ের মধ্যে অপরিবর্তণীয় সীমারেখা টানা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। আবার এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আদর্শকেন্দ্রিক কর্তব্য এবং ধর্ম যিনি কর্তা তাঁর পক্ষেও কল্যাণকর হয়ে থাকে। অর্থাৎ যিনি আদর্শের জন্য কর্তব্য করেন তাঁর আত্ম কল্যাণও সাধিত হতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে সত্য শিব এবং সুন্দরকে যিনি জীবনে লাভ করার চেষ্টা করছেন তিনি আত্ম-কেন্দ্রিক কর্তব্য সম্পাদন করছেন এবং আত্মকেন্দ্রিক ধর্মে অনুিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। অবশ্য এই শ্রেণী বিভাগকে তর্কশাস্ত্র সম্মত না বললেও এই শ্রেণী বিভাগের যে ব্যবহারগত প্রয়োজন রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনে কর্তব্য পালনে এবং নৈতিক ধর্ম আচরণে আমরা এই শ্রেণী বিভাগের উপযোগিতাটুকু বুঝতে পারি।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

শাস্তিতত্ত্ব

শাস্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা—প্রাকৃতিক দর্যোগ, ভ্রান্তি পাপ ও অপরাধের প্রকৃতি ব্যাখ্যা —শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্য—নিবৃত্তিমূলক শাস্তি তত্ত্ব: অপরাধীর সংস্কার তত্ত্ব: অন্যায়ের প্রতিকারে প্রতিবিধানতত্ত্ব—মৃত্যুদণ্ডাদেশ, তার যথার্থ্য ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা—মৃত্যুদণ্ডাদেশের উপযোগিতা।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

শাস্তিতত্ত্ব

প্রাকৃতিক দর্যোগকে আমরা Physical Evil অথবা প্রাকৃতিক অন্যায় আখ্যা দিয়েছি। প্রকৃতির এই ধরনের বিকারের মধ্যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোন ক্রিয়া নেই। এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতির নিয়মের অধীন। আমাদের সুখশান্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিঘ্নিত হয়। ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, পঙ্গপালের উপদ্রব এসবই আমাদের দু:খকে বাড়িয়ে দেয়। আমাদের ইচ্ছাকে, অভিলাষকে পূর্ণ হতে দেয় না। এদের আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Evil) বলি। এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেই আমাদের ক্লিষ্ট জীবন আরও পীড়িত হয়ে পড়ে। এদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু এদের সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করতে না পারলেও আমরা এদের প্রভাবকে ব্যক্তিগত চেষ্টায় খর্ব করতে পারি। প্রাকৃতিক অন্যায় ও নৈতিক অন্যায়ের মধ্যেকার বিভেদটুকুকে আমরা এই ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি।

(ক) প্রাকৃতিক অন্যায় মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ কাজ অর্থাৎ নৈতিক অন্যায় মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অতএব নৈতিক অন্যায়ের জন্য কোন না কোন ব্যক্তিকে দায়ী করা যায়। প্রাকৃতিক অন্যায়ের জন্য প্রকৃতি ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করা চলে না।

(খ) অতএব প্রাকৃতিক অন্যায়কে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বা Non-volintary বলা চলে। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার নৈতিক বিচার করা চলে না। অতএব প্রাকৃতিক অন্যায় অ-নৈতিক। নৈতিক কর্ম ইচ্ছা-প্রসূত; সুতরাং নৈতিক অন্যায়, নৈতিক বিচারের অধীন।

(গ) প্রাকৃতিক অন্যায়ের নিয়ন্ত্রণ মনুষ্যশক্তির আয়ত্তাধীন নয়। নৈতিক অন্যায়ের নিয়ন্ত্রণ মানুষের আয়ত্তাধীন। আমরা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ক'রে নৈতিক অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারি।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করার সময় আমরা যদি ভুল করি তবে তার প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর হয়। কোন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমরা যখন যেসব উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তার বিচার বিবেচনা করি এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই তখন আমাদের ভুল হয়

বা ভ্রান্তি ঘটে। ভুল বা ভ্রান্তি হল ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিচার বিবেচনা ক'রে আমরা যে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনাত হই সেই সিদ্ধান্ত, নীতি সম্পর্কিত বা নৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত হতে পারে। আমরা কোন একটি বিশেষ নৈতিক বিধিকে ভুল করে আরেক ধরনের কাজের উপর আরোপ করতে পারি। তার ফলে বিচারটি ভ্রান্ত হয়। অতএব, ভুল করে ভাবতে পারি যে যে কোন একটি বিশেষ ধরনের কাজ আমাদের আত্মউপলব্ধির সহায়তা করবে কিন্তু পরিণামে দেখা গেল যে তা সহায়তা করল না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে নৈতিক বিচারে ভুলভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু যাকে আমরা নীতিগত অন্যায় বা Moral Error বলি তার সঙ্গে এই ভ্রান্তি বা Error-এর অনেক পার্থক্য আছে। আমরা স্বেচ্ছায় যেসব অতি-নৈতিক (extra-ethical) বিচারের দ্বারা প্রভাবিত হই তা সর্বদাই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কেউ বুদ্ধিগত বিচারের ত্রুটির জন্য ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় অথবা যে সিদ্ধান্তে ইচ্ছা শক্তির যথাযথ রূপে প্রয়োগ করা হয় না, সেক্ষেত্রে ভ্রান্ত নৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য দুষ্কৃতকারীকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

তাহলে আমরা কাকে নৈতিক বিচ্যুতি বলব? মানুষ যদি স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করে, ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য, দুষ্ট অভিপ্রায় পূরণের জন্য যখন সে নৈতিক নীতিকে অগ্রাহ্য করে তখন সে নৈতিক অন্যায়ের জন্য নিন্দিত হয়। প্রকৃতির দুর্যোগ এবং বুদ্ধি ভ্রান্তি থেকে এই নৈতিক অন্যায়ের ক্ষতি করে সত্য কিন্তু তারা অ-নৈতিক (Non-moral)। বুদ্ধি বিচারে ত্রুটি ঘটলে Error বা ভুল হয়। এক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি তখন কাজ করে না। অতএব ভুল ভ্রান্তির জন্য মানুষকে নৈতিক দায়িত্ব দেওয়া চলে না। এই দুই ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাকে আমরা নৈতিক অন্যায় বলেছি, তাহল ভিন্ন ধরনের। পাপী স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করে। তাই নৈতিক অন্যায় নিন্দনীয়।

যাকে আমরা নৈতিক অন্যায় বলেছি, তাকে দুটি দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করা চলে। একটি হ'ল, ভিতরের দৃষ্টিকোণ, আরেকটি হল বাইরের দৃষ্টিকোণ। আমরা যখন কোন একটি চারিত্রিক ত্রুটিকে চরিত্রের কলঙ্ক হিসেবে বিচার করি তখন তা হল নৈতিক অন্যায়ের ভিতরের দিক। আবার আমরা তাকে কুকার্য রূপেও গণ্য করতে পারি ; এটি হ'ল নৈতিক অন্যায়ের বাইরের দিক। যখন নৈতিক অন্যায়কে চরিত্রের কলঙ্ক রূপে দেখি তখন তাকে Vice বা নীতি-ভ্রষ্টতা রূপে গণ্য করতে পারি। আর যখন তাকে ক্রিয়া রূপে দেখি তখন তাকে পাপ বা অপরাধ বলে গণ্য করি। পুণ্য যেমন চরিত্রের মহিমা বর্ধন

করে তেমনি নীতিভ্রষ্টতা চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। এরা উভয়েই চরিত্রের প্রকৃতি রূপে স্বীকৃত হয়েছে। আমরা যখন অভ্যাসের বশে প্রতিনিয়ত নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করি তখন তাকে Vice বা নীতিভ্রষ্টতা বলা হয়। এ হ'ল মনুষ্যচরিত্রের স্থায়ী নৈতিক বিকৃতির প্রকাশ; এই বিকৃতিটুকু ঘটে ব্যক্তির অসংযমের ও কুঅভ্যাসের ফলে। Vice-কে পাপাচার ও বলা হয়েছে। এর মূল থাকে মনুষ্যচরিত্রের গভীরে। Mackenzie এই প্রসঙ্গে বললেন: 'Vice corresponds to Virtue and means a general habit of character issuing in paticular bad acts'; এই ধরনের নীতিভ্রষ্টতার জন্ম হয় মানুষের দুষ্ট অভ্যাস থেকে। নানান ধরনের কু-অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে আমরা যখন প্রতিনিয়ত নৈতিক বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করি তখন এই ভ্রষ্টতা-বোধের উৎপত্তি হয়। নীতিভ্রষ্টতা থেকেই পাপের জন্ম। মানুষের দুষ্ট মানসিক প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত দুষ্কর্মে রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই দুষ্প্রবৃত্তি আমাদের কর্মকে প্রভাবিত করে। অতএব বলা চলে যে পুণ্য (Virtue) এবং নীতিভ্রষ্টতা (Vice) হ'ল চরিত্রের গুণাগুণ।

আমাদের দুষ্প্রবৃত্তি বা নীতিভ্রষ্টতা যখন চরিত্রকে কলুষিত করে এবং সেই কলুষ যখন আমাদের বিভিন্ন কর্মকে প্রভাবিত করে তখন আমরা যে দুষ্কর্মটিকে প্রত্যক্ষ করি তাকে Sin বা পাপ বলা হয়েছে। আমাদের পাপ -প্রবৃত্তি (নীতিভ্রষ্টতা) যখন কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তখন তাকে পাপ (Sin) এই আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। আমরা যখন স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আমাদের কর্তব্য থেকে বিরত হই, তখন আমরা এই পাপ করি। খারাপ কাজ করলে পাপ করা হয়; ভালো কাজ না করলেও পাপ করা হয়। হয়তো আমাদের ভালো কাজ করার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই আমাদের সেই ইচ্ছার দার্ঢ্য বা দৃঢ়তা থাকে না। এর ফলে আমরা আমাদের সত্য অভিপ্রায়কে সৎ কর্মে চালিত করতে পারি না। অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের মন্দ অভিপ্রায় ও শক্তি এবং উৎসাহের অভাবে মন্দ কর্মের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে দুষ্কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের দুষ্ট অভিপ্রায় সত্য হয়ে না উঠলেও আমাদের দুষ্প্রবৃত্তি আমাদের চরিত্রকে কলুষিত করে। যদি সেই দুষ্প্রবৃত্তিকে কর্মের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করা যেত তবে বোধহয় কাজের মধ্য দিয়ে তা নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে আমাদের চরিত্রকে আর কলুষিত করত না। অতএব বলা চলে যে আমাদের মনের মধ্যে যেসব সদ্ অভিপ্রায় আছে, তারা সৎ কর্মের মত অত ভালো নয়। কিন্তু আমাদের দুষ্প্রবৃত্তি দুষ্কর্মের থেকেও অনেক বেশী মন্দ। পাপের শিকড় থাকে এই দুষ্প্রবৃত্তির মধ্যে: 'Sin as

used by christian writers refers more ofen to the inner disposition of the heart, want of purity in the motive and the like'. পাপ বলতে আমরা সাধারণতঃ ধর্মের অনুশাসনকে লঙ্ঘন করা বুঝলেও পাপ যে নীতিবিরুদ্ধ এটাও স্বতঃসিদ্ধ। নৈতিক আদর্শকে লঙ্ঘন করাও পাপ।

প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে আমরা পাপ বলতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কৃত অন্যায় কর্মকে বুঝেছি। অপরাধ বা Crime বলতে আমরা বুঝেছি সেই অন্যায়কে যা সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। আধুনিক নীতিশাস্ত্রের পরিভাষায় Crime বা অপরাধ বলতে আমরা যা বুঝি তা Sin বা পাপের থেকে সঙ্কীর্ণতর। আমরা আজকের দিনে অপরাধ বলতে বুঝি সেই অসামাজিক কর্মকে যাকে রাষ্ট্রবিধানে দুষ্কর্ম বলা হয়েছে; এই ধরনের দুষ্কর্ম করলে রাষ্ট্রবিধানে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সব পাপই অপরাধ নয় এবং আমরা কেবল সেই ধরনের অন্যায়কে পাপ বলব যেগুলি রাষ্ট্রবিধানে শাস্তির যোগ্য। যেমন, চুরি করা ; চুরি করলে রাষ্ট্রবিধানে শাস্তি পেতে হয়। অকৃতজ্ঞতাও পাপ ; অকৃতজ্ঞ হলে দেশের আইনে সাজা দেবার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সামাজিক বিধানে অকৃতজ্ঞতা নিন্দনীয়। Mackenzie অপরাধের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বললেন : 'The term crime denotes only those offences against society which are recognised by national law and which are liable to punishment. *

অপরাধের শাস্তি বিধান আছে। যদিও কবি রবীন্দ্রনাথ দুষ্কৃতকারীকে ঘৃণার দাহনে দগ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে"

নীতিশাস্ত্রের বিধান কিন্তু ভিন্ন প্রকারের। নীতিশাস্ত্রে বলা হল যে, অন্যায় যে সহ্য করে তার আত্মা, মন এবং চিত্ত এই অন্যায়ের দ্বারা খর্ব হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় করে সে দুষ্কৃতকারী। নৈতিক পুণ্যের মানদণ্ডে সে খর্ব হয়ে গেছে। যে মানুষ ভালো কাজ করে সে পুরস্কৃত হয় এবং যে মানুষ অন্যায় কাজ করে তার শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে অপরাধী, সে স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধি বিধানকে লঙ্ঘন করেছে। এই নৈতিক বিধি বিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে অপরাধীর শাস্তি বিধান হওয়া একান্তই দরকার। যাকে শাস্তি দেওয়া হল, তাকে শাস্তি দিয়ে একথাই বোঝানো হয় যে, 'তুমি যে কাজ করেছিলে, তা অন্যায়।' দুষ্কৃতকারীর মনে এই বোধটুকু আনার জন্যই শাস্তি দেওয়ার

*A Manual of Ethics, পৃঃ ২২৭

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শাস্তির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Seth বললেন: নৈতিক জগতের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে শাস্তিদান প্রথা; মানুষ-কৃত অপরাধ এই নৈতিক বিধির জগতে ছিদ্র রচনা করে:" 'Punishment is in its essence, a rectification of the moral order of which crime is the notorious breach.'*

শাস্তি বিধান তত্ত্ব

কি কারণে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, এবং শাস্তি দানের উদ্দেশ্যই বা কি? এই সম্বন্ধে তিনটি মতবাদ প্রচলিত:— এদের মধ্যে প্রথমটি হল নিবৃত্তিমূলক তত্ত্ব; দ্বিতীয়টি হল সংস্কার তত্ত্ব এবং তৃতীয়টি হল প্রতিবিধান তত্ত্ব।

(ক) নিবৃত্তিমূলক তত্ত্ব:

এই তত্ত্ব অনুসারে বলা হয়েছে, যে দুষ্কৃতকারী সে তা কাজটা করেই ফেলেছে তবে তাকে আবার শাস্তি দেওয়া কেন? তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এই কারণে যাতে করে আর কেউ ওই ধরনের অপরাধ না করে। যে লোকটা গাড়ী চোর তার শাস্তি বিধান ক'রে তাকে বলব যে, "তোমাকে গাড়ী চুরি করার জন্য শাস্তি দেওয়া হল না। তোমাকে শাস্তি দেওয়া হল, যেন ভবিষ্যতে আর কেউ গাড়ী চুরি না করে।" অর্থাৎ ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজ দেহের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং এই তত্ত্বানুসারে আমরা মৃত্যুদণ্ডকেও স্বীকার করতে পারি। দুষ্কৃতকারীকে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে এমন সাজা দেওয়া হল যার ফলে ভবিষ্যতে কেউ আর অনুরূপ অপরাধ করবে না। এই ধরনের শাস্তি তত্ত্বকে Deterrent Theory of punishment বলা হয়েছে।

কিন্তু এইযে মৃত্যু দণ্ডকে সমর্থনযোগ্য বলা হল, ভবিষ্যতে যাতে এ জাতীয় অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রেখে— এটা কিন্তু খুব যুক্তি সঙ্গত বক্তব্য নয়। এক্ষেত্রে আমরা দুষ্কৃতকারাকে উপায় হিসেবে গণ্য করছি, উপেয় হিসেবে নয়। পৃথিবীটাকে সৎ করে তোলার জন্য, ভবিষ্যতের মনুষ্যসমাজের চোখে অপরাধকে নিন্দিত করার জন্য আমরা যদি কাউকে শাস্তি দিই সেই শাস্তি অযৌক্তিক হবে। অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য আমরা কোন একটি মানুষকে উপায় হিসেবে গণ্য ক'রে তার শাস্তি বিধান করতে

*A Study of Moral Principles, পৃ: ৩১৫

পারি না। মানুষকে মানুষের মূল্যে বিচার করলে তাকে অপরের মঙ্গলের বা কল্যাণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করা যায় না। তবে যদি দুষ্কৃতকারীকে কঠোর সাজা দিয়ে আমরা দুষ্কৃতকারীর পাপ প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন করতে পারি, সেক্ষেত্রে কিন্তু নিবৃত্তিমূলক শাস্তিতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

(খ) সংস্কার তত্ত্ব (Reformative Theory) :

এই তত্ত্বানুসারে শাস্তিদানের উদ্দেশ্য হল দুষ্কৃতকারীর মনের সংস্কার সাধন করা। দুষ্কৃতকারীকে তার দুষ্প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তাকে সুশিক্ষা দেওয়া হল শাস্তি দানের উদ্দেশ্য। আধুনিক যুগে আমরা যে মানবিক বিধি বিধানের আওতায় বাস করছি, সেই মানবিক বিধিবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই তত্ত্বটি গৃহীত হয়েছে। এই তত্ত্ব মানুষকে উপায় হিসেবে গ্রহণ না ক'রে তাকে উপেয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। দুষ্কৃতকারীর সাজা দেওয়া হয়, অপরাধীর শাস্তি বিধান করা হয়, অপরাধীর কল্যাণের জন্য। অপরের কল্যাণের জন্য দুষ্কৃতকারীকে সাজা দেওয়া হয় না। দুষ্কৃতকারীকে শিক্ষা দেওয়া বা তার চরিত্রের সংস্কার সাধন করাই শাস্তি দানের উদ্দেশ্য। অপরাধ বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেকটি অপরাধী ব্যক্তি হল এক ধরনের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। এক ধরনের পাগলামি অথবা জন্মগত দৈহিক ত্রুটি মানুষকে অপরাধ কর্মে লিপ্ত করে। এগুলিকে যদি মানসিক ব্যাধি বলে গণ্য করা হয়, তাহলে অপরাধীকে তার অপরাধ প্রবণতার জন্য চিকিৎসা করতে হবে। শাস্তি দিয়ে তাকে ব্যাধি মুক্ত করা যাবে না। অপরাধ বিজ্ঞান বলছে যে অপরাধীরা স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করে না। মানুষের অভাব, তার জৈবিক ও মানসিক অসুস্থতা তাকে নানান ধরনের অপরাধ কর্মে লিপ্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ Kleptomania-র কথা বলি। যাদের এই ধরনের অপরাধ -প্রবণতা আছে তাদের সত্যিকারের অভাব না থাকলেও তারা চুরি করে। অতএব এসব ক্ষেত্রে শাস্তি দিলেও সেই শাস্তি নিরর্থক হবে। এই ধরনের অপরাধ প্রবণতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার ; হাসপাতালে কিংবা মনসমীক্ষাবিদের চেম্বারে অথবা উন্মাদ আশ্রমে এদের চিকিৎসা হতে পারে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সকল অপরাধী ব্যক্তি এই ধরনের মানসিক অসুস্থতার তত্ত্বটিকে গ্রহণ করতে রাজী হবে না ; কেননা এই ব্যাখ্যাটি তাদের আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর। Mackenzie যথার্থই বলেছেন : "The ordinary criminal, whether he be a pathological

or not, will not submit to be treated as a patient or a Case'. অতএব অপরাধকে মানসিক ব্যাধিরূপে দেখলে অপরাধীর অপরাধের সঠিক চরিত্র নির্ণয় যে সব সময়ে হয় এবং এই ধরনের চারিত্র্য নির্ণয় যে অপরাধীর মানসিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়, একথা জোর ক'রে বলা চলে না।

অবশ্য আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে মানসিক অসংলগ্নতা অথবা দৈহিক এবং জৈবিক ত্রুটি বিচ্যুতির ও অসম্পূর্ণতার জন্যই সব সময় যে মানুষ অপরাধ করে, তা নয়। যাকে আমরা নীতিশাস্ত্রে অপরাধ বলি সেই ধরনের অপরাধীর সংখ্যাও কম নয়। এই ধরনের অপরাধীরা স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধি-বিধানকে লঙ্ঘন করে। অতএব তাদের শাস্তি হওয়া দরকার। যারা Kleptomania-তে ভুগছে তাদের শাস্তি বিধানের পক্ষপাতী আমরা নই: তাদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় অপরাধ করে তাদের অপরাধ শাস্তির যোগ্য। যে লোকটা পাগল হয়ে গেছে সে তার কাজের জন্য দায়ী নয়। তাকে আমরা ব্যক্তি বা Person বলে গণ্য করি না ; তাকে বস্তু বা Thing হিসেবে গণ্য করা হয়। তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যায়। বাইরের শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে সে চলে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে শাস্তিতত্ত্বের ব্যতিক্রম করা যেতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধানকে যারা লঙ্ঘন করে, যারা সমাজের চোখে অপরাধী তাদের শাস্তি বিধান অবশ্য কর্তব্য। যারা সমস্ত অপরাধকে মানসিক বিকৃতি, দৈহিক ত্রুটি অথবা জৈবিক ত্রুটির কারণে জাত বলে মনে করে তারা সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বহু দূরে সরে গেছে ; তাদের মত গ্রহণযোগ্য নয়।

এই সংস্কার তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানমূলক অপরাধ তত্ত্বের (criminal sociology) উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ যখন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠে, তার উপর যখন অন্যায়, অবিচার নির্বিচারে চলে, সে যখন দেখে তার চারপাশের জগতে অবিচার এবং অন্যায় ঘটে চলেছে তখন সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে ; প্রচলিত বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করে। যদি সে চুরি করে, তখন বুঝতে হবে যে তার দারিদ্র্যই তার এই অপরাধের জন্য দায়ী। সুতরাং দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান ক'রে অপরাধীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি না ঘটিয়ে যদি আমরা তাকে কঠোর সাজা দিই তাহলে একদিকে যেমন অপরাধীর ক্ষতি করা হবে, অন্যদিকে তা সমাজের পক্ষেও বিষময় ফল প্রসব করবে। যদি আমরা সমাজে ধন-সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সবাইকে সমান সুযোগ দিতে পারি তাহলে দেখা যায় যে ক্রমে অপরাধীর সংখ্যা কমে আসছে।

যারা এই মতের পোষকতা করেন, তাদের বলা হয় Criminal Psychologist বা অপরাধ-সংস্কার-পন্থী মনস্তত্ত্ববিদ।

উপরের আলোচনায় আমরা অপরাধকে সামাজিক অসাম্যের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখেছি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেটাও আবার সত্য নয়। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মানুষ চুরি করে সত্য কিন্তু বহু ক্ষেত্রে যাদের ধনী বলা হয় তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য চোরাকারবারে লিপ্ত হয়। সেক্ষেত্রে অন্ততঃ সামাজিক অসাম্যের তত্ত্ব দিয়ে অপরাধকে ব্যাখ্যা করা চলবে না। অবশ্য এইসব ধনী তস্করদের, দুষ্কৃতকারীদের প্রাপ্য শাস্তি দিয়েও তাদের দুষ্ট স্বভাবের সংস্কার সাধন করা যায় এমন কথা জোরের সঙ্গে বলা যাবে না। অবশ্য শাস্তি দিলেই যে উল্লেখ-যোগ্য ফল ফলে এমন কথা স্বীকার করা যায় না। যে প্রথমবারের মত অপরাধ করেছে শাস্তি দিয়ে তাকে দাগা আসামীতে পরিণত করা হয়। অতএব সাজা দিয়ে উল্টা ফলই ফলতে দেখা গেছে। হয়তো সদয় ব্যবহার করলে অপরাধীরা সৎ পথে ফিরে যেতে পারে। সে হয়তো তার ভুল বুঝতে পারে, হয়তো সে অনুতাপ করে। এইভাবে অপরাধীর মনের হয়তো পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীচৈতন্যের জগাই মাধাই-এর গল্পের কথা স্মরণ করতে পারি :

'মেরেছো কলসীর কানা
তাই বলে কি প্রেম দেব না?'

মহাপ্রভুর প্রেম এবং করুণা জগাই মাধাই-এর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। অতএব দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিয়ে তাকে প্রত্যাঘাত ক'রে তার চরিত্রের পরি-বর্তন করার চেষ্টা না ক'রে চৈতন্যদেব মায়া মমতা দিয়ে তাদের সৎ পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সংস্কারতত্ত্বে মানুষকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার কোন অবকাশ নেই। মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড এবং তার অনুগামীরা বলেছেন যে, অপরাধ এবং অসামাজিক কাজকর্মের জন্য মানুষের অবদমিত যৌন ইচ্ছাই দায়ী। ওঁদের মতে যৌন ইচ্ছার অবদমনের জন্য মানুষের মনে spite wishes বা অপরের ক্ষতি করার ইচ্ছা বলবতী হয়। সুতরাং এদের শাস্তি বিধানের চেয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে বেশী। মনঃসমীক্ষণ (Psycho-Analytic Method) পদ্ধতিতে এদের চিকিৎসা হওয়া দরকার। এই ধরনের অবদমিত যৌন ইচ্ছার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষকেরা যৌন ইচ্ছার অবদমনের উৎসটিকে খুঁজে বার করেন ও যেসব কারণে এই অবদমন ঘটেছে সেগুলিকে আবিষ্কার ক'রে সমাজ স্বীকৃত সুস্থ পথে সেই অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে চালিত করেন। তবে

এখানে এই সত্যটুকুকে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের সকল অপরাধের মূলেই অবদমিত ইচ্ছা নেই। এই প্রসঙ্গে আমরা ম্যাকেঞ্জি নির্দিষ্ট পাঁচ রকমের অপরাধের কথা বলতে পারি।

(১) কিছু কিছু অপরাধ বা কোন কোন অপরাধ মানুষের সাময়িক উন্মাদনার ফল।

(২) কোন কোন অপরাধ মানুষের জৈবিক ত্রুটির ফল।

(৩) মানুষ কতকগুলি অপরাধ করে সাময়িক Obsession বা মানসিক বন্ধের জন্য।

(৪) কতকগুলি অপরাধ সঙ্ঘটিত হয় আমাদের ভ্রান্ত নৈতিক বিচারের জন্য।

(৫) কোন কোন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধি-বিধান লঙ্ঘন করার জন্য মানুষ অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

প্রথম এবং দ্বিতায় শ্রেণীর অপরাধের জন্য আমরা উন্মাদ আশ্রম অথবা হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি। তৃতীয় শ্রেণার অপরাধ চিকিৎসার জন্য রয়েছে মনঃসমীক্ষকের দল (Psycho-analysts)। চতুর্থ শ্রেণীর অপরাধীর অপরাধ নিরসন করা যেতে পারে অপরাধার বিচারের ভ্রান্তিটুকু দূর করে দিয়ে। কিন্তু পঞ্চমবিধ যে সব অপরাধীর কথা আমরা বলেছি তাদের শাস্তি দেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। নৈতিক বিধি বিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্য এই ধরনের অপরাধীদের সাজা হওয়া একান্ত দরকার। এই ধরনের অপরাধী যখন শাস্তি পায় তখন তারা শাস্তির যৌক্তিকতাটাকে উপলব্ধি করে এবং তাদের মনে অনুতাপ আসে। এই অনুতাপের ফলেই তাদের মনের সংস্কার সাধিত হয়। এতে শুধু এরাই যে উপকৃত হয় তা নয়। এদের মত আরও পাঁচজনের মনে এই ধরনের অপরাধ-প্রবণতা যদি থেকে থাকে তবে তারাও তা থেকে মুক্ত হতে পারে।

(গ) প্রতিবিধানতত্ত্ব (Retributive Theory)

এই মতে অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হয় ন্যায় বিচারের জন্য। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অপরাধীর শাস্তি বিধান করতে হবে। শাস্তি-দান উপায় মাত্র নয়, শাস্তি দান হল উপেয় (End in itself)। অপরাধী যে অন্যায় করেছে সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই হল শাস্তি দানের উদ্দেশ্য; শাস্তি দিয়ে নৈতিক বিধি বিধানের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। অপরাধী যখন নৈতিক বিধিকে ক্ষুণ্ন করে তখন ন্যায় ধর্ম দাবী করে যে অপরাধীর সাজা

হওয়া উচিত। অপরাধীকে সাজা দিলে তবেই ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। নৈতিক বিধির মর্যাদা যাতে কখনও ক্ষুণ্ন না হয় সে জন্যই শাস্তি বিধানের একান্ত দরকার। কেউ যদি অপরাধ ক'রে শাস্তি না পায় তাহলে নৈতিক বিধির মর্যাদা এবং মহিমা ক্ষুণ্ন হয়। সমাজের কল্যাণ অথবা অপরাধীর কল্যাণের জন্য শাস্তি বিধান করা হয় না। আমাদের ন্যায় বিচারের বোধ যাতে ক্ষুণ্ন না হয় তার জন্য অপরাধীর শাস্তি বিধান করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার কথাও এই প্রতিবিধান তত্ত্বে আছে। মানুষের বেঁচে থাকবার অধিকার তার মৌল অধিকার। যদি কেউ আমার সেই মৌল অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে তাহলে ন্যায় বিচার দাবী করবে যে হত্যাকারীরও প্রাণ-দণ্ড দেওয়া হোক। কিন্তু এই যুগের নব্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোয় প্রাণ-দণ্ডকে সমর্থন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। অনেকে বলেছেন যে, প্রাণদণ্ডের বিধানটি হল প্রতিহিংসা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টীয় ন্যায়-শাস্ত্রে প্রতি-হিংসার নিন্দা করা হয়েছে। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অপরাধীর শাস্তি বিধান করা হয় না। ন্যায়াধীশ পক্ষপাতশূণ্যভাবে বিচার ক'রে অপরাধীর দণ্ড বিধান করেন। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীর শাস্তি বিধেয়।

দার্শনিক এ্যারিষ্টটল বললেন যে, শাস্তি পাওয়া অসদর্থক (Negative) পুরস্কার। যে স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করে, তারই এই পুরস্কার প্রাপ্য। দার্শনিক কাণ্ট বললেন যে, অপরাধীর সাজা হওয়া দরকার, কেন না, সে যে অন্যায় করেছে তা সে নিজের অথবা পরের কল্যাণের জন্য করে না। কাণ্ট এই প্রতিবিধান তত্ত্বে বিশ্বাস করেছেন। তিনি বললেন যে, সমাজের কল্যাণের জন্য অথবা অপরাধীর কল্যাণের জন্য শাস্তি বিধানের কোন অর্থই হয় না। শাস্তি বিধান হল এক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। নৈতিক বিধানকে লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতেই হবে। দার্শনিক হেগেলও কাণ্টের অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বললেন যে, অপরাধী অপরাধ করেছে বলেই সে শাস্তি পাবার যোগ্য। নৈতিক বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে সে এই অসদর্থক পুরস্কারটি অর্জন করেছেন। এই কারণে দেখা যায় যে কোন কোন অপরাধী রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় না পড়লেও স্ব-আরোপিত, স্বেচ্ছাকৃত শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছেন। হেগেলের এই মতটা নব্য হেগেলীয় দার্শনিক ব্র্যাডলিও গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে শাস্তি গ্রহণ ক'রে দুষ্কৃতকারী তার ধার শোধ করে। যদি অন্য কোন কারণে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে ব্র্যাডলির মতে তা হবে অবিচার। অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই। অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে শাস্তি বিধান করলে তা বিচার প্রহসন হবে মাত্র।

মনে রাখতে হবে শাস্তি দান হল সুবিচার ; নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করলে একমাত্র প্রতিবিধানই হল শাস্তি দান।

প্রতিবিধান তত্ত্বকে স্বস্থ এবং গ্রহণযোগ্য-তত্ত্ব বলে মনে করা যেতে পারে। যদি শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হয় নৈতিক বিধি বিধানের মহত্ত্ব প্রচার করা তাহলে তা দুই ভাবে করা যেতে পারে ; প্রথমটি হল অপরাধীর দুষ্প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন করা এবং দ্বিতীয়টি হল অপরে যাতে সেই অপরাধ না করে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই দুটির কোন একটি উদ্দেশ্যও সফল হবে না যদি না আমরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি যে, শাস্তি দানের উদ্দেশ্য হ'ল নৈতিক বিধি বিধানের মর্যাদা এবং কর্তৃত্বকে স্বীকার করা। যখন অপরাধী মনে মনে বোঝে যে তাকে শাস্তি দেওয়া হল শুধুমাত্র নৈতিক বিধির মহত্ত্ব এবং মর্যাদা বর্ধিত করার জন্য এবং সে যে শাস্তি পাচ্ছে সেটাই তার নিজের ন্যায্য পাওনা, কেবলমাত্র তখনই সে তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয় ; তখনি তার দুষ্প্রবৃত্তির যথার্থ সংস্কার সাধিত হয়। এইভাবে একদিকে, যেমন অপরাধীর অপরাধ-প্রবণতা হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমনি অন্য মানুষেরাও অপরাধ করা থেকে বিরত হয়। এই প্রতিবিধানতত্ত্ব মূলত দুটি রূপ নেয়। এদের প্রথমটি হল কঠোর প্রতিবিধান এবং দ্বিতীয়টি হল কোমল প্রতিবিধান (Mollified)। কঠোর (Rigoristic) প্রতিবিধান তত্ত্বের মতে অপরাধের গুরুত্বের উপর শাস্তির কঠোরতা নির্ভর করবে। যদি অন্যায় গুরুতর হয় তবে শাস্তিও কঠোর হবে। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দেওয়া চলবেনা, লঘু অপরাধের দণ্ডও লঘু হবে। যদি কেউ আমার চোখ উপড়ে নেয় তবে আমি তার কেবল চোখটাই উপড়ে নেব। এই তত্ত্বে আমরা আনুষঙ্গিক কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অথবা মানসিক অবস্থার বিচার বিবেচনা ক'রে শাস্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করি না। আবার কোমল প্রতিবিধান তত্ত্বে লঘু শাস্তি দানের কথা বলা হয়েছে। অপরাধী দুষ্কর্ম করার সময় তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে তার শাস্তি বিধান করতে হবে। যদি কখন উত্তেজিত হয়ে কোন অপরাধ সে করে এবং যদি অপরাধীর বয়স কম হয় এবং তার অভিপ্রায়ও মন্দ না হয়ে থাকে তাহলে অপরাধ গুরুতর হলেও তাকে লঘু শাস্তি দেওয়া উচিত। অর্থাৎ অপরাধীর অপরাধ করার সময়ে তার মানসিক অবস্থা এবং তার প্রতিকূল পারি-পার্শ্বিক অবস্থা যে তাকে অপরাধ মূলক কর্মে অনেকখানি প্রেরণা দিয়েছে এই সত্যটুকু স্বীকার করে নিয়ে শাস্তির প্রকৃতি এবং চরিত্র এই তত্ত্বে নির্ণীত হয়। আমাদের মতে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রতিবিধানযোগ্য। অবশ্য দার্শনিক Rashdall এই তত্ত্ব গ্রহণ না ক'রে সংস্কার তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা

করেছেন। তিনি প্রতিবিধানতত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই তত্ত্বে আমাদের প্রতিহিংসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করে।

প্রাণদণ্ড কি সমর্থন যোগ্য ?

আধুনিক কালে চরম শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ড সমর্থনযোগ্য কি না সে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। নরহত্যা প্রমুখ ঘৃণ্যতম অপরাধের শাস্তি হিসাবে অনেকেই প্রাণদণ্ডের সমর্থন করেছেন অতীতে। Retributive theory অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, এই শাস্তিতত্ত্বকে স্বীকার করলে হয়তো প্রাণদণ্ডের সমর্থন করা যায়। কেননা যে অপরের প্রাণ হরণ করেছে তার প্রাণ হরণ করা এই তত্ত্বে বিধেয়। অবশ্য যাঁরা বলেন যে হত্যাকারী হত্যাকালে সাময়িক ভাবে উন্মত্ত হয়ে যায় এবং এই সাময়িক উন্মত্ততা ব্যতীত নরহত্যা সম্ভব নয়, তাঁদের মতে মৃত্যুদণ্ডের উচ্ছেদ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরা বলেন, যে বিচারকের নির্দেশে অপরাধের বিচার ক'রে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় তাঁরও ত ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ সময়ে সময়ে ভ্রান্ত বিচারের সহায়ক হয়। মানুষের বাঁচার অধিকারটুকু হ'ল তার মৌলিক অধিকার। তাই কোন অবস্থাতেই তার এই মৌলিক অধিকারটুকু খর্ব করা চলে না। নরহত্যা করলে প্রাণদণ্ড ছাড়া অন্য যে কোন ধরনের দণ্ড তাকে দেওয়া যেতে পারে। যদি আমরা নরঘাতককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না ক'রে অন্য ধরনের শাস্তি দিই তবে হয়, তার মনে অনুতাপ আসতে পারে ; এই অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে সে আবার হয়তো সুস্থ, স্বাভাবিক ও সৎ জীবন যাপন করতে পারে। প্রাণদণ্ড মকুব পেয়ে সাধু জীবন যাপন করেছে এমন অপরাধীর সংখ্যা বিরল নয়।

যাঁরা প্রাণদণ্ড রদ করতে চেয়েছেন তাঁরা বলেন যে শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ড একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কেননা দীর্ঘ দিন প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও দেশ থেকে আজও নরহত্যা লুপ্ত হয়ে যায় নি। সুতরাং শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ডের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। এতদ্ব্যতীত শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ডকে গ্রহণ করা বিষয়ে আর একটি বড় নৈতিক প্রশ্ন বার বার উত্থাপিত হয়েছে। সে প্রশ্নটি হল, যে জীবন আমরা দিতে পারি না সে জীবন নেবার কোন নৈতিক অধিকার আমাদের কি আছে? বাইবেল প্রমুখ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন আমাদের হনন না করতে বলেছে। কেননা আমরা যে প্রাণ দিতে পারি না সে প্রাণ নেবারও কোন নৈতিক অধিকার আমাদের নেই। যাঁরা প্রাণদণ্ড বিধানকে

সমর্থন করেন তাঁরা এই মৌল সত্যটিকে অস্বীকার করেন। যদি আমরা এই সত্যটুকু কে স্বীকার করি, যে প্রাণ আমি দিতে পারি না সে প্রাণ কোন অবস্থাতেই হরণ করার নৈতিক অধিকার আমার নেই তবে শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ডকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করা চলে না। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ডকে সমর্থন করা যায় না। কেননা যাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় শাস্তি কিন্তু তার হয় না। সে তো সমস্ত দুঃখ সুখের অতীত হয়ে যায়। যারা শাস্তি ভোগ করে তারা হল ঐ শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবার ও সন্তানেরা। প্রকৃতপক্ষে বিচারকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হত্যাকারীর শাস্তি বিধান করে না; যারা শাস্তি পায় তারা হল হত্যাকারীর হতভাগিনী স্ত্রী ও অভাগা সন্তানেরা। কোন অপরাধ না করেই এরা কিন্তু কঠোর সাজা পায়। তাদের দুঃখ ভোগের অন্ত থাকে না। এক্ষেত্রে নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পায়। এটি নিশ্চয়ই কোন নীতিশাস্ত্র সমর্থন করতে পারে না।

যাঁরা প্রাণদণ্ড সমর্থন করেন তাঁদের বক্তব্য হল শাস্তি অপরাধের অনুরূপ হওয়া উচিত। যারা নৃশংসভাবে নরহত্যা করে তাদের মৃত্যু দণ্ডই হ'ল যোগ্য শাস্তি। অপরাধী যখন ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বাপর বিবেচনা ক'রে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠান করেন, তখন সে ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই বিধেয়। এই ভাবে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয় বলেই বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে ইতস্তত: করে। যারা হত্যাকাণ্ডের মত জঘন্য অপরাধকে নিবারণ করতে চায় অর্থাৎ যাঁরা Preventive theory-তে বিশ্বাস করেন, তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করা যায়। আবার যাঁরা হত্যাকাণ্ডকে বিশেষ গুরুত্ব দেন তারাই ভয়াবহ নরহত্যার যোগ্য শাস্তি প্রাণদণ্ডকে সমর্থন করেন; এঁরা Retributive theory-তে বিশ্বাসী। তাহলে একথা বলা চলে যে সমাজে নরহত্যার মত জঘণ্য অপরাধকে নিবারণ করতে হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার তত্ত্বে (Retribution) যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে হয়তো এই চরম শাস্তি দেওয়ার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্য কোন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিশেষ করে মানবতা-বোধ-সম্পন্ন কোন উদার দৃষ্টি-কোণ থেকে প্রাণদণ্ডের সমর্থন করা যায় না। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা ক'রে যারা নরহত্যা করে, যাদের কোন ক্রমেই অসুস্থ বা বিকৃত মস্তিষ্ক বলা যায় না, তাদের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড দেওয়া অপরাধের নয়। তবে যদি আমরা শাস্তির উদ্দেশ্য হিসাবে সংস্কার তত্ত্বে (Reformative theory) বিশ্বাস করি তবে নিশ্চয় আমরা প্রাণদণ্ডকে সমর্থন করতে পারি না। কেননা সংস্কারের প্রথম কথাই হল যা

সংস্কার করতে চাই তাকে বাঁচিয়ে রাখা। অপরাধী যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় তবে আর তার সংস্কার কিভাবে করা হবে? তাই সংস্কারবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণদণ্ড কখনই সমর্থন-যোগ্য নয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতি

চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতির ব্যাখ্যা—আচরণ ও চরিত্র—নৈতিক আদর্শ ও অগ্রগতি—নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়—নৈতিক অগ্রগতি ও তার সর্তাবলী।

সপ্তদশ অধ্যায়

চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতি (Character and moral progress)

প্রথমেই এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে যে প্রশ্নটি জাগে সেটি হল চরিত্র কাকে বলব? চরিত্র বলতে আমরা বুঝি আমাদের স্থায়ী মানসিক প্রবণতাকে (disposition)। এই প্রবণতা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আমরা যখন স্ব-ইচ্ছায় কোন বিশেষ ধরনের কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আমরা সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাকেই বলি যার মধ্যে সৎ কাজ করার একটা প্রবণতা থাকে ; এই প্রবণতাটুকু ধীরে ধীরে জন্মায় যখন আমরা সৎ কাজ ক'রে ক'রে সৎ কাজ করবার একটা অভ্যাস গড়ে তুলি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সৎ কাজ করার প্রবণতা নির্ভর করে সৎ কাজ করার অভ্যাসের ওপর এবং এই অভ্যাসের মাধ্যমে প্রবণতাটুকু না গড়ে তোলা পর্যন্ত আমরা কোন মানুষকে সচ্চরিত্র বলতে পারি না। আবার যারা অসৎ কাজ ক'রে ক'রে অসৎ কাজ করার একটা অভ্যাস গড়ে তোলে তখন তাদের মধ্যে অসৎ কাজ করার একটা প্রবণতা জন্মায়। এই প্রবণতাটুকু লক্ষ্য করেই আমরা তাকে অসৎ চরিত্র ব্যক্তি আখ্যা দিই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে চরিত্র গঠনের ব্যাপারে অভ্যাসের প্রধান ভূমিকা রয়েছে। তবে অভ্যাসের ভূমিকা প্রধান হলেও অভ্যাসই কিন্তু চরিত্র গঠনের সবটুকু নয়। আমাদের চরিত্র বহুলাংশে নির্ভর করে আমাদের সহজাত ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি, অর্জিত প্রবৃত্তি ও অভ্যাস এবং আপনার বিচার বুদ্ধির উপর। আমরা আমাদের জন্মগত ও অর্জিত প্রবৃত্তিকে বিচার বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি এবং এভাবেই আমাদের চরিত্র গঠিত হয়। মানুষের চরিত্র প্রধানতঃ নির্ভর করে তার স্বভাবগত ক্ষমতা এবং তার অর্জিত গুণাবলীর ওপর। তবে এই স্বভাবজাত ক্ষমতাও অর্জিত গুণাবলীর যথাযথ সদ্ব্যবহার করলে তবেই আমাদের চরিত্র যথোপযুক্তভাবে গঠিত হতে পারে। নীতিশাস্ত্রবিদ্ Mackenzie বললেন : "চরিত্র বলতে আমরা একটা পরিপূর্ণ ইচ্ছার জগতকে বুঝি। এই ইচ্ছাগুলি সবই এক শ্রেণীর বা একই ধরণের ইচ্ছা।" "Character means the complete uriverse or system constituted by acts of will of a particular kind). অর্থাৎ এক বিশেষ ধরনের ইচ্ছা বা কর্মের যে পরিপূর্ণ জগৎ সেই পরিপূর্ণ ইচ্ছা

বা কর্মের জগতই হ'ল চরিত্র। এই যে ইচ্ছার জগতের সঙ্গে চরিত্রের সমীকরণ করার কথা Mackenzie বললেন, এর অনেক আগে এই ধরনের কথা বলেছিলেন Novalice ; তাঁর দেওয়া চরিত্রের সংজ্ঞাটি হ'ল : সম্পূর্ণভাবে গঠিত ইচ্ছাই হ'ল চরিত্র।

আমরা দেখেছি যে অভ্যাসগত পৌনঃপুনিক আচরণের মধ্য দিয়েই চরিত্র গঠিত হয়। অতএব একথাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমরা কাকে আচরণ বলব? কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় আমরা যে সব কাজ করি তা হ'ল আমাদের আচরণের অন্তর্ভুক্ত। আচরণ সব সময়েই উদ্দেশ্য অভিমুখী হবে। উদ্দেশ্য বিহীন কোন কাজ আচরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকে আচরণ আখ্যা দেওয়া যায় না কেননা অনৈচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক নয়। আচরণ বলতে আমরা বুঝি সেইসব কাজকে যেগুলির মূলে ইচ্ছা বা অভিলাষ কাজ করে অর্থাৎ যা ঐচ্ছিক এবং যে কাজগুলি আমরা অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছি। আচরণের এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চরিত্র এবং আচরণের সম্বন্ধটুকু নির্ণয় করা সঙ্গত।

আচরণকে আমরা চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বলতে পারি। অর্থাৎ আচরণের মধ্য দিয়েই মানুষের চরিত্র প্রকাশিত হয়। অতএব বলা চলে যে চরিত্র ও আচরণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। চরিত্র যাঁর সৎ তাঁর আচরণও সৎ হবে এবং অসৎ চরিত্র ব্যক্তির আচরণ স্বভাবতই অসৎ হবে। তাহলে এ কথাটি বোঝা যাচ্ছে যে আচরণের সঙ্গে প্রকাশের একটা আত্যন্তিক সম্বন্ধ আছে। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়। এই অন্তর্নিহিত গুণই হ'ল চরিত্র। অতএব বলা চলে যে আচরণ চরিত্রকে প্রকাশ করে। এই আচরণ এবং চরিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ দ্বিমুখী। আচরণ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বলেই আচরণের উপর চরিত্রের প্রভাব থাকে। কিন্তু আবার আমরা কখন কখন দেখেছি যে চরিত্রের উপর আচরণের প্রভাবও কাজ করে। যেমন বস্তির নৈতিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেও কোন ব্যক্তি যদি বাল্যকাল থেকেই সদ্‌আচরণে অভ্যাস্ত হয়ে ওঠে তাহলে তার চরিত্রও সদ্‌ভাবে গঠিত হয়। এক্ষেত্রে আচরণ চরিত্রের উপরে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

অতএব আচরণের সঙ্গে চরিত্রের যে আত্যন্তিক সম্পর্কের কথা বলা হ'ল তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে অভ্যাসগত কর্মের দ্বারা আমরা চরিত্রের উন্নতি সাধন করতে পারি। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে মানুষের চরিত্রের উন্নতি ও অবনতি এ দুটোই ঘটতে পারে। মানুষের চরিত্র বলতে আমরা

মানুষের আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী মানস প্রবণতাকে বুঝি। এই মানসিক প্রবণতা বহুল পরিমাণে তার জন্মগত প্রবৃত্তি, অভ্যাস ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জন্মগত প্রবৃত্তি চরিত্রের ভিত্তিভূমি হলেও চরিত্রের উন্নতি অবনতি বহুলাংশে নির্ভর করে আমাদের পরিবেশের (Environment) ওপর। সৎ পরিবেশে অসৎ মানুষও সৎ হয়ে উঠেছে এমন দৃষ্টান্ত আছে। আবার অসৎ পরিবেশে সৎ মানুষও অসৎ হয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় গণিকা বৃত্তি নিরোধ ক'রে গণিকাদের গণিকালয় থেকে উদ্ধার ক'রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; এটা করা হয়েছিল যাতে ক'রে তারা সুস্থ পরিবেশে সৎ নাগরিক জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। যে সব অঞ্চলে তাদের বসবাস করতে দেওয়া হয়েছিল সেই অঞ্চলের লোকেরাও কিন্তু জানত না তাদের পুরাতন পাপবৃত্তির কথা। রুশীয় সমাজ-তত্ত্ববিদেরা এবং মনস্তত্ত্ববিদেরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন যে মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও মানুষ ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে পারে। যদি সে একাগ্র ও আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা তার চরিত্রকে উন্নত করতে চায় এই ধরনের একাগ্র ও আন্তরিক প্রচেষ্টাই চরিত্রের উন্নতি সাধন করার সোপান। এই একাগ্র প্রচেষ্টা বলতে আমরা বুঝব (ক) বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ প্রবণতার উন্নতি সাধন করা (intellectual and cmotiona), (খ) সৎ ব্যক্তির দেওয়া উপদেশ গ্রহণ ও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, (গ) আত্মসংযম অভ্যাস করা, (ঘ) সংকল্পে দৃঢ় হ'য়ে থাকা, (ঙ) কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা, (চ) জীবনের কর্তব্য নিয়মিতভাবে সমাধা করা, (ছ) নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা। তাহলে এই কথা বলা চলে যে চরিত্রের উন্নতি ও বিকাশ সাধন করতে হলে উপরোক্ত বিষয়গুলির ওপর বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। আমাদের বুদ্ধিগত ও অনুভূতিগত জীবনের সামগ্রিক উন্নতি করতে হবে ; আত্মসংযম করতে হবে ; সৎ কর্ম করার সংকল্পকে সুদৃঢ় করতে হবে ; সৎ এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের দেওয়া উপদেশ গ্রহণ করতে হবে ; তাঁদের উপদেশ মত চলতে হবে এবং তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের জীবনকে গঠিত করতে হবে। আমাদের কর্তব্যটুকুও নিয়মিত সম্পাদন করা দরকার এবং সেই কর্তব্য নিয়মিত সম্পাদন করতে হ'লে কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার। কর্তব্য সম্বন্ধে এই সঠিক ধারণা-টুকু পেতে হলে যে নৈতিক আদর্শের দ্বারা এই কর্তব্য নিয়মিত ও নিরূপিত হয় সেই নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে হ'বে।

নৈতিক আদর্শ ও অগ্রগতি :

আমরা যে চরিত্রের উন্নতির কথা বলেছি সেই উন্নতি কোন একটি বিশেষ নৈতিক আদর্শকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠে। এই নৈতিক আদর্শের স্বরূপটুকু না বুঝলে আমরা মানুষের চরিত্রের উন্নতি সম্বন্ধে অথবা নৈতিক অগ্রগতি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণায় পৌঁছুতে পারব না। আমরা যে চরিত্রের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি সে উন্নতি নির্ভর করে আমাদের প্রয়াস বা স্বেচ্ছাকৃত কর্মের উপরে। এক কথায় আমাদের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার একটা লক্ষ্য থাকে এবং এই লক্ষ্যই হ'ল আমাদের নৈতিক আদর্শ। আবার এই আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করা হ'ল আমাদের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। নানান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে আমরা নিরন্তর প্রয়াসের দ্বারা একটি চরম লক্ষ্যের দিকে (ultimate end) এগিয়ে যাই। এই চরম লক্ষ্যই হল আমাদের নৈতিক আদর্শ বা moral ideal। এই নৈতিক আদর্শই আমাদের নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এখন প্রশ্ন হবে যে নৈতিক আদর্শ বলতে আমরা কি বুঝব। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবে অধিকাংশের মতে জীবনে পূর্ণতা লাভই হ'ল নৈতিক আদর্শের পরাকাষ্ঠা।

ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা আমরা ধীরে ধীরে আমাদের নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হই। এই পরিপূর্ণতাই হ'ল আমাদের নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াকে নৈতিক জীবনের অগ্রগতি বা moral progress বলা হয়েছে। হঠাৎ এই দূরস্থিত নৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। নিরন্তর নৈতিক প্রয়াসের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনের নানান্ ধরনের পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তন গুলিকেই অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপ বা স্তর বলা হয়েছে। ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হই। নৈতিক অগ্রগতি এই ভাবে একটি ধাপ থেকে আর একটি ধাপে ধীরে ধীরে উপনীত হয়। এই অগ্রগতির নিম্নতর ধাপে উপনীত হলেই নৈতিক আদর্শ আমাদের উচ্চতর ধাপে ওঠার জন্য আহ্বান জানায়; মাঝপথে কোথাও থেমে থাকবার উপায় নেই। আমাদের মধ্যে যে নৈতিকতার বীজ সুপ্ত থাকে, সেই বীজ ক্রমে উপ্ত হয়; ধীরে ধীরে তা বিকাশ লাভ করে। নৈতিক অগ্রগতির অর্থ হ'ল নৈতিক জীবনের নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নত হওয়া; অনৈতিক অবস্থা থেকে নৈতিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া নয়। অধ্যাপক Seth এই মর্মে রায় দিয়ে বললেন যে নৈতিক অগ্রগতির অর্থ হ'ল নৈতিকতার পরিমণ্ডলের মধ্যে অগ্রগমন; অর্থাৎ সমগ্র গতিটা হ'ল নৈতিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই

নৈতিক অগ্রগতি বা morat progress চলতে থাকে ; আদর্শে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই গতি কখনও দ্রুত ছন্দে কখন বা মন্দাক্রান্তা তালে এগিয়ে চলে ; আবার কখন বা এই গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে আসে। তবে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে এই নৈতিক আদর্শে কখনই পৌঁছানো যায় না। কেননা আমরা আদর্শের দিকে যতই এগিয়ে যাই ততই আদর্শটা আরও বড় হয়ে ওঠে আরও দুরধিগম্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মানুষের নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার আদর্শও বৃহত্তর ও দূরাশ্রিত হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে আমরা এই নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে (moral progress) নৈতিক আদর্শের (moral ideal) সম্পর্কটুকু নির্ণয় করার চেষ্টা করতে পারি। একথা অনস্বীকার্য যে এই নৈতিক অগ্রগতি ও নৈতিক আদর্শ বা এরা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। নৈতিক অগ্রগতি সব সময়েই নৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে চলে। অতএব বলা চলে যে নৈতিক আদর্শ নৈতিক অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। নৈতিক অগ্রগতির অর্থই হ'ল নৈতিক আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমরা যে সব নৈতিক কাজ করি সে কাজগুলো সব সময়ে নৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে করা হয়। কিন্তু একথাও সত্য যে নৈতিক অগ্রগতি বা moral progress পরোক্ষভাবে নৈতিক আদর্শকে প্রভাবিত করে। আমাদের নৈতিক অগ্রগতি বা moral progress যতই বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ নৈতিক আদর্শের দিকে আমরা যতই অগ্রসর হই নৈতিক আদর্শও সেই অনুপাতে বড় হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং নৈতিক অগ্রগতি যতই দ্রুত হোক না কেন যতই পূর্ণাঙ্গ হোক না কে,ন তা কোন দিনই নৈতিক আদর্শে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না.। নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক আদর্শও দূরাশ্রিত হ'য়ে পড়বে। তাকে ধরা যাবে না।

নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায় (Different stages of moral progress)

নৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের জীবনের যে নৈতিক অগ্রগমন (moral progress) ঘটে তার মধ্যে তিনটি পর্যায়কে আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি। অর্থাৎ এই নৈতিক অগ্রগতি বা moral progress এর তিনটি স্তর বা পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়টি হ'ল বিচারকে বাইরে থেকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া (transition from external to an internal view)। দ্বিতীয় পর্যায়টি হল কঠোর গুণ বা ধর্মগুলিকে কোমল গুণ বা ধর্মের আওতায় নিয়ে আসা (subordination of the sterner to the gentler virtues) ;

তৃতীয় পর্যায়ে আমরা ধর্ম বা গুণ সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি (wider scope of virtue)।

নৈতিক অগ্রগতির প্রথম পর্যায় হ'ল বাইরে থেকে ভিতরে যাওয়া অর্থাৎ কর্মের বাইরের ফলাফল দেখে কার্যের বিচার না ক'রে কর্মকর্তার প্রেষণা ও অভিপ্রায় দেখে কার্যের বিচার করা। অর্থাৎ প্রেষণা বা অভিপ্রায় হ'ল মানুষের কাজের নৈতিক মূল্যায়নের নিয়ামক। এই প্রেষণা ও অভিপ্রায় মানুষের চরিত্রকে প্রকাশ করে। সুতরাং এক অর্থে এরা হল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। এই পর্যায়ে আমরা মানুষের চরিত্রকে নৈতিক বিচারের বিষয়-বস্তুরূপে গণ্য করি এবং এই বিচারের মাপকাঠি হয় বিবেকের বাণী। নৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা আমাদের দৈহিক ক্ষমতা সাহস এবং শক্তির উপর বহুলাংশে নির্ভর করি। আমাদের নৈতিক ধর্মকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। আমাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা আমাদের বলবীর্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর করি। এই ধর্মগুলি প্রধানতঃ দেহগত। নৈতিক অগ্রগতির ফলে এই ধর্মের রূপান্তর ঘটে। আমরা আমাদের শক্তি সামর্থ্য ও সাহসের ওপর নির্ভর না ক'রে আমরা ধৈর্য, পরোপকারিতা, ক্ষমা, বিনয়, দয়া প্রমুখ অপেক্ষাকৃত কোমল ধর্মের অনুশীলন করি। অর্থাৎ নৈতিক জীবন মহাভারতের ভীমসেনের আদর্শ থেকে যুধিষ্ঠিরের জীবনাদর্শের দিকে প্রধাবিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে কঠোর নৈতিক ধর্মগুলিকে কোমল নৈতিক ধর্মের আওতায় আনা হয়। ক্ষমা, বিনয়, দয়া, প্রমুখ কোমল ধর্মগুলি এই পর্যায়ে খুবই মূল্যবান এবং মর্যাদাসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। তৃতীয় পর্যায়ে মানুষ নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। নৈতিক অগ্রগতির ফলে ক্রমে ক্রমে সে আত্মকেন্দ্রিক থেকে পরকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে। তখন সে নিজের কল্যাণের কথা চিন্তা না ক'রে অপরের কল্যাণের কথা চিন্তা করে; সে সমাজের কল্যাণ চিন্তা করে, আপন জাতীয় কল্যাণ চিন্তা করে এবং সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তাও তখন তার পক্ষে সহজ হ'য়ে ওঠে। নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার স্ব-জাতীয় কল্যাণ চিন্তা ক্রমে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ চিন্তায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের উদাহরণ আমরা দেখেছি দার্শনিক Bacon-এর নীতি তত্ত্বে। অপরের কল্যাণ এবং নিজের কল্যাণকে অভিন্ন মনে করাই এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের মর্মার্থ। Bacon বললেন 'the social good is called duty'; আমরা যখন সামাজিক কল্যাণের আদর্শকে আরো বড়ো ক'রে তাকে সমগ্র প্রাণী জগতের আদর্শে পরিণত ক'রে আমাদের সামনে তুলে ধরতে

পারব তখনই এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ব্যক্তি মানুষের নৈতিক অগ্রগতির কথা আলোচনা করতে পারি (moral progress in the individual) ; নৈতিক জীবনের শুরুতেই আমরা নৈতিক নিয়ম সম্পর্কে খুব একটা সচেতন থাকি না ; নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের ধারণাও খুব একটা স্পষ্ট থাকে না। এই স্তরে আমরা ন্যায় কর্মকে অন্যায় কর্ম থেকে পৃথক করতে শিখি এবং অন্যায় কাজকে বর্জন ক'রে যা ন্যায় সেই ধরনের কাজকে গ্রহণ করে থাকি। এই প্রাথমিক স্তরে আমরা স্বাধীনভাবে ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে পারি না কেননা তখনও আমাদের নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। এই প্রাথমিক স্তরে আমরা প্রধানত: নিজেদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার না করে আমাদের গুরুজনদের উপদেশকে গ্রহণ করি ; এই প্রাথমিক স্তরে আমাদের উপর আমাদের পিতামাতা, শিক্ষক, ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রভাব বহুলাংশে কাজ করে। আমাদের নৈতিক অগ্রগতির দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা সমাজের আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্পর্কে সচেতন হই। সামাজিক রীতি নীতি যা ভালো বলে গ্রাহ্য করি। আর যাকে ভালো বলে না অর্থাৎ যা অন্যায়, তাকে বর্জন করি। এই পর্যায়ে মূলত: আমরা আমাদের নৈতিক জীবনে সামাজিক রীতি নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই। সামাজিক রীতি নীতির ভালো-মন্দের বিচার আমরা এই পর্যায়ে করি না। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের এই অ-বিবেচনার অবস্থা খুব বেশী দিন থাকে না।

এর পরেই আসে নৈতিক অগ্রগতির তৃতীয় পর্যায় বা স্তর। এই পর্যায়ে আমরা নৈতিক বিধি সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হই। আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বিচার বুদ্ধি তখন কিছু পরিমাণে বিকশিত হতে থাকে ; তবে এই পর্যায়েও আমাদের নৈতিক বিচার ঠিক ভাবে কাজ করে না ; কেননা আমরা নৈতিক বিধির সঙ্গে বাস্তব বিধি বা নিয়মকে (positive laws) মিশিয়ে ফেলি। এই মিশ্রন দোষ ঘটে কেননা এই স্তরে ও বাস্তব নিয়ম ব্যক্তির জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এর পরের পর্যায়ে আমাদের নৈতিক বিচার অনেকটা পরিণত রূপ নেয়। এই পর্যায়ে আমরা নৈতিক বিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হই এবং নৈতিক বিধি যে ব্যবহারিক জীবনের লাভালাভের বাস্তব বিধি নয় এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারি। সব সময় কাজের বাইরের ফলটা দেখে কাজের যে নৈতিক ফলটা বিচার করা উচিত নয় এই সত্যটুকু উপলব্ধি করি। কাজের ফলকে নৈতিক বিচারের উপজীব্য না ক'রে এই

পর্যায়ে আমরা কর্তার অভিপ্রায়কে বিচার করি। অভিপ্রায় ভাল হলে সে কাজের ফলাফল যাই হোক না কেন সেই কাজকে আমরা ভালো বলি। কাজের জগতে, বাঁচার জগতে আমাদের কাজ কি প্রভাব বিস্তার করল সেটি না দেখে আমরা বিচার করি কর্তার অন্তরের অভিপ্রায়টুকুকে। এই পর্যায়ে আমাদের নৈতিক দৃষ্টি অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। এর পরের পর্যায়ে আমরা দেখি নৈতিক চেতনা আরও গভীর হয়েছে। আমরা এই পর্যায়ে সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি আচার প্রথা প্রভৃতির যথার্থ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হই, তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ধারণ করতে শিখি। তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : সমাজের নিয়মকে মেনে চলব, না নৈতিক নিয়মকে মেনে চলব? এ প্রশ্নটি বড় প্রশ্ন, বিবেকের প্রশ্ন। এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে গেলে আমাদের নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে। অবশ্য নৈতিক অগ্রগতির মূলে শুধু আদর্শের চেতনাটাই একমাত্র কার্যকরী শক্তি নয়। এই নৈতিক অগ্রগতিকে বাঁচিয়ে রাখে স্কুল কলেজ প্রমুখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এটা হ'ল সমাজের বহিরঙ্গের দিক। এই বহিরঙ্গের সঙ্গে আমাদের বিবেককে যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ বিবেকের নির্দেশের সঙ্গে সামাজিক বিধির সম্বন্ধ ঘটাতে হবে। এই সমন্বয়ের মধ্যেই রয়েছে মানুষের নৈতিক অগ্রগতির নিশানা। এই ভাবেই তার নৈতিক অগ্রগতি (moral progress) চলতে থাকে।

নৈতিক অগ্রগতি ও তার সর্তাবলী (Conditions of moral progress)

জীবনের কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে হ'লে যেমন কতকগুলি সর্ত পূরণ করতে হয় অর্থাৎ সেই আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছুতে হ'লে যা যা করণীয় তা করতে হয় ঠিক তেমনি ধারা আমাদের নৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত ভাবে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের কয়েকটি সর্ত পূরণ করতে হ'বে ; যেমন, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন। বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার ছাড়া আমরা আমাদের আদর্শ ও কর্তব্যের জ্ঞান ও ধারণাকে পরিণত রূপ দিতে পারি না। কোন নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হ'লে আমাদের কি করা উচিত সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকলে নৈতিক অগ্রগতি সম্ভবপর হয় না। অতএব বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন ক'রে নৈতিক অগ্রগতির পথে আমাদের প্রথম পদক্ষেপটি করতে হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল আত্মসংযম বা self-contral। আমাদের আবেগের জীবন, অনুভূতির জীবন যদি অসংযত হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের পক্ষে নৈতিক অগ্রগতি করা সম্ভবপর হয় না। বিচার বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত

রেখে যদি আমরা আমাদের কামনা বাসনা আবেগ অনুভূতিকে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলেই নৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হবে।

নৈতিক অগ্রগতির পথে তৃতীয় পদক্ষেপ হ'ল সৎ সংসর্গ বা good association। যথাযথভাবে নৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের জীবনে এই সৎ সংসর্গের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সতত চেষ্টা করা উচিত যাতে আমরা মন্দ লোকের সাথে না মিশে, ভালো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি। সৎ সংসর্গ নৈতিক অগ্রগতির পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

নৈতিক অগ্রগতির পথে চতুর্থ পদক্ষেপ হ'ল বিনয় বা নম্রতা (modesty); আমরা যদি আমাদের নৈতিক জীবনে অস্থির অব্যবস্থিত-চিত্ত এবং অবিবেচক ব্যক্তির মত আচরণ করি তবে আমাদের নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। আমাদের নম্র হতে হবে, ধীর স্থির এবং সুবিবেচক হতে হবে। এই গুণগুলি ছাড়া নৈতিক অগ্রগতিকে সহজ এবং সাবলীল করার অন্য পথ নেই।

নৈতিক অগ্রগতির পথে পঞ্চম পদক্ষেপটি হ'ল নৈতিক আদশের অনুসরণ করা (pursuit of moral ideal)। আমরা যখন নৈতিক আচরণ করি তখন আমাদের চেষ্টা হয় কোন একটি সুনির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করা। নৈতিক অগ্রগতি করতে হলে সব কাজের সময়েই একটা নৈতিক আদশকে আমাদের সামনে খাড়া ক'রে রাখতে হয়। এই আদর্শ অনুসারে আমরা কাজ করি; আমাদের নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করি। এই আদর্শ অনুসারে কাজ করলে সে কাজ আমাদের নৈতিক অগ্রগতিকে সম্ভব করে এবং এই আদর্শের পরিপন্থী কোন কাজ করলে আমাদের পক্ষে কোন নৈতিক অগ্রগতি করা সম্ভবপর হয় না।

নৈতিক অগ্রগতির পথে ষষ্ঠ পদক্ষেপটি হ'ল মহামানবদের এবং মহাপুরুষদের জীবন কথা অধ্যয়ন করা। উন্নত চরিত্র এবং মহৎ ব্যক্তিরা কিভাবে জীবন যাপন করেছেন, কি কি কাজ করেছেন এবং কি কি কাজ করেননি এসব সম্বন্ধে আমাদের যদি সুষ্ঠু ধারণা থাকে তাহলে তা আমাদের নৈতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে:

'Lives of great men all remind us,
We ean make our lives sublime'.

অতএব এই নৈতিক অগ্রগতির পথে আমাদের খুবই সহায়ক হবেন বুদ্ধ, চৈতন্য, সক্রেটিস, শঙ্কর, বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ। এঁদের জীবন-

ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকলে তা যে আমাদের নৈতিক অগ্রগতির পথে একান্ত সহায়ক হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

নৈতিক অগ্রগতির পথে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হ'ল অনুতাপ বা repentance। যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন: 'Repent and thy sin will be forgiven'। অর্থাৎ খ্রীষ্টদেব বললেন যে আমরা যদি আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করি তবেই আমরা ক্ষমা পাব। ভুল বশতঃ আমরা হয়ত কখন কখন অন্যায় কাজ করে ফেলি ; তবে অনুতাপ করলে সে পাপের স্খালন হয়। অনুতাপ করলে মানুষ পবিত্র হয়ে ওঠে ; সুতরাং বলা হয় যে অনুতাপ হ'ল নৈতিক অগ্রগতির সহায়ক।

নৈতিক অগ্রগতির পথে পরবর্তী পদক্ষেপটি হ'ল পরিবেশ পরিবর্তন বা change of environment। আমাদের জীবনে আমরা পরিবেশের প্রভাবকে স্বীকার না করে পারি না। যে সব ধরনের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়, যে সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের সামাজিক জীবনে এগুতে হয় তারা আমাদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতএব আমাদের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, এমন পরিবেশের মধ্যে বাস করতে হবে যা আমাদের নৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হবে। নৈতিক অগ্রগতির অনুকূলে তাই পরিবেশ পরিবর্তনও করতে হয়।

তার পরের সর্তটি হ'ল চৌর্যভাব পরিত্যাগ। 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' অর্থাৎ অপরের দ্রব্যকে, অপরের সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে ; অপরের সম্পত্তি হস্তগত করার লোভটুকু সম্বরণ করতে হবে। এভাবে আমাদের মনে যে চৌর্যভাব বা চুরি করার বাসনা থাকে তাকে দমন করতে হবে। এটুকু করতে না পারলে আমাদের নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। নৈতিক অগ্রগতির পথে সর্বশেষ পদক্ষেপটি হ'ল, নৈতিক অগ্রগতির সর্বশেষ সর্তটি হ'ল শুচিতা বা purity; আমরা যদি আমাদের শরীর ও মনকে পবিত্র না রাখতে পারি তবে আমাদের নৈতিক অগ্রগতি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হবে। তাইতো আমাদের শাস্ত্রেও রোমান ক্যাথলিক ধর্মের আচার বিচারে শুচিতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই শুচিতার প্রয়োজনে আমাদের আচরণকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে ; আমাদের মন থেকে কু-চিন্তাকে দূর করতে হবে। নৈতিক অগ্রগতির পথে শুচিতা অপরিহার্য। এ সর্তটি একটি কঠিন সর্ত। এ সর্তটিকে যথাযথভাবে পালন করতে না পারলে নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

পরিশিষ্ট

ভারতীয় নৈতিক আদর্শ

ভারতীয় নৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা—সন্ন্যাসের আদর্শ : অদ্বৈত বেদান্ত ও শ্রীরামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা : স্বামী বিবেকানন্দের Practical বেদান্ত—গীতায় কথিত নিষ্কাম কর্মের আদর্শ—গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার আদর্শ।

পরিশিষ্ট

ভারতীয় নৈতিক আদর্শ

এমন কথা পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, ভারতীয় দর্শনে নাকি নীতি চিন্তার অভাব রয়েছে। আমরা জানি যে, ভারতীয় দর্শনে নীতি শাস্ত্রকে পৃথক শাস্ত্র রূপে আলোচনা করা হয় নি। নীতিশাস্ত্র বিভিন্ন দর্শন মতের মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। অবশ্য বেদান্তের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথেই আমরা মোক্ষলাভ করতে পারি। মোক্ষলাভে আমাদের কর্ম বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব যিনি ব্রহ্ম জ্ঞানী তাঁর সংসারের কোন কর্তব্য থাকে না। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের Practical Vedanta তত্ত্বের অনুসরণ ক'রে বলা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষ সামাজিক সেবার কর্তব্য থেকে মুক্ত নয়। অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনে জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে যা কর্তব্য তারই ব্যাখ্যা পাই স্বামী বিবেকানন্দের Practical Vedanta দর্শন তত্ত্বে। আমাদের মূল ভারতীয় দর্শন মতে, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে যে, যাঁরা পরম জ্ঞান লাভ করেছেন তাঁদের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হলেও চলে। বেদান্তে আমরা যে জ্ঞানের কথা বললাম, সেই জ্ঞানই বিদ্যা-অবিদ্যার প্রভেদটুকু আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিদ্যার দ্বারাই মুক্তি; অবিদ্যাই সমস্ত বন্ধনের কারণ। ঈশ উপনিষদে বলা হল যে, ব্রহ্মকে না জেনে যে মানুষ দেবতার পূজা করে, সেই মানুষ গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। অতএব ভারতীয় দর্শন মতে জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়। জ্ঞানকে মুক্তির উপায় বলে স্বীকার করলেও ভারতীয় চিন্তায় নৈতিক বিচার বিবেচনার অসদ্ভাব নেই। মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য, ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে বহু আলোচনা আমরা ভারতীয় দর্শনে পেয়েছি। বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে মানুষের বিশুদ্ধ আচার আচরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাকে সেখানে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ জ্ঞান-মার্গকে প্রাধান্য দিলেও একথা বলেছে যে, বিশুদ্ধ জীবন চর্যা ব্যতীত সত্য-জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় সংযম ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনকে সত্য জ্ঞান লাভের সোপান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যোগ দর্শনেও যম এবং নিয়মকে আত্ম সংযমের উপায় হিসেবে দেখা হয়েছে। যম বা আত্মসংযমের পথগুলি হল, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। নিয়ম হল, শৌচ, সন্তোষ তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রনিধান। অতএব, একথা আমরা বলতে পারি যে,

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে নৈতিক শুচিতার বিধান দেওয়া হয়েছে; তারপর তাকে আমরা পেয়েছি পাশ্চাত্য দেশের নীতি দর্শনে। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে :

'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্চিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবার।।'

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি সকল নৈতিক কর্মের উর্ধে। অহং বুদ্ধির কাছে ক্ষুদ্রতার নাশ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারও অনুপস্থিত। অতএব তিনি তো দেহ হৃদি স্থিত হৃষিকেশকে তাঁর সকল কর্মের নিয়ন্তা রূপে প্রত্যক্ষ করবেন। সুতরাং দেহের কাছে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় এই ধরনের বিচার অবান্তর এবং অতিরিক্ত। ভগবানের ইচ্ছাই যদি মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায় তাহলে মানুষের সকল কর্মই মঙ্গলের বিধায়ক। তাইতো কবি প্রার্থনা করেন, 'তোমারই ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে'; দার্শনিক বলেন, 'What is real is rational and what is rational is real'। অতএব মনে হয় যে, ভারতীয় দর্শনে নৈতিক চিন্তার অভাব আছে, এই অভিযোগ একান্তই অযৌক্তিক। আমাদের মতের সমর্থনে আমরা Maxmüller-এর উক্তি উদ্ধৃত করি : 'Dangerous as this Principle seems to be, that whosoever kows Brahman can not sin, it is hardly more dangerous, if properly understood, than the saying of Saint John, that whosoever is born of God, sinneth not.* 'যদি বলা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পাপ করতে পারেন না, এ তত্ত্বটি নৈতিক জীবনধারার পরিবর্ধনের পক্ষে বিপজ্জনক, তা হ'লে সেন্ট জন কথিত সেই প্রখ্যাত তত্ত্ব যে ঈশ্বর সৃষ্ট কোন ব্যক্তিই পাপ করিতে পারেন না নৈতিক জীবনের উজ্জীবনের পথে আরো বেশী মারাত্মক। অবশ্য সেন্ট জন প্রচারিত তত্ত্বের নিহিতার্থটি যথাযথভাবে অনুধাবন করলে তবেই আমাদের উক্তিটির যাথার্থ্য অনুভূত হ'বে।'

সন্ন্যাসের আদর্শ : অদ্বৈত বেদান্ত

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি
সে আমার নয়'

একথা এ যুগের মহাকবি বললেও ভারতবর্ষের চিন্তা বহু সহস্র বৎসর ধরে সন্ন্যাসের আদর্শকে লালন পালন করেছে। শঙ্করাচার্য্যের বিশুদ্ধ জীবনের আদর্শ এই সন্ন্যাসের আদর্শকে আশ্রয় করে আছে। ব্রহ্মের চিন্তা যদি একমাত্র সত্য হয়

*Six Systems of Indian Philosophy, পৃঃ ১৬৮

তাহলে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের রূপ, তুমি আমি এই বোধ, এ সবই মিথ্যা হ'য়ে যায়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে জীবাত্মা ও পরামাত্মার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা ক'রে আমরা ব্রহ্মের নিত্য সত্যতা এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। কর্মের দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। যজ্ঞ, দান, ধ্যান, তপস্যা, এরা সংসারের, বৈদান্তিক রাজ্যের নয়। অতএব কর্মের পথে মুক্তির আশা করা মূঢ়তা। 'আমি সেই ব্রহ্ম', একথা বেদান্ত দর্শনে বারবার বলা হয়েছে। এর মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতেরা আমাদের ধৃষ্টতা প্রত্যক্ষ করে থাকলেও ম্যাক্সমুলার বলেছেন যে, মানুষের এবং ভগবানের মৌল একাত্মতাকে স্বীকার করা, কোন ধৃষ্টতার কথা নয়। শঙ্করের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞান মার্গই আমাদের ব্রহ্মলাভের একমাত্র পথ ; সেই মার্গে কর্ম ও ভক্তির স্থান নেই।' কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এইটুকু হল শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তের পারমার্থিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বে ব্যবহারিক উপদেশ নেই। শঙ্করাচার্য্য বললেন যে জ্ঞান মার্গে বিচরণের যোগ্য হয়ে উঠতে হলে আত্ম সংযম অভ্যাস করতে হবে, নৈতিক জীবন যাপনের পথেই এই পরাজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

এই নীতিসম্মত পথের আলোচনার অসদ্ভাব ভারতীয় দর্শনে নেই, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি ; জীবনের সাংসারিক নীতি, ব্যবসায়গত নীতি, সামাজিক নীতি এবং ধর্মীয় নীতি, এরা পৃথক নয়। জীবন এক এবং অবিভাজ্য। এই অবিভক্ত জীবনকে যে ধারণ করে থাকে তা-ই হল ধর্ম। তাই ভারতীয় দর্শনে সদাচারের নির্ঘণ্ট না থাকলেও আমাদের আচরণে বিশুদ্ধতা সংযম, করুণা ও মৈত্রী প্রমুখ উচ্চ মানবিক আদর্শের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীরামানুজাচার্য্য

শঙ্করের বেদান্ত জগতকে মায়া বা মিথ্যা বলে গ্রহণ করলেও শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জগতকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হয়েছে। সুতরাং রামানুজপন্থীদের মতে কর্মোদ্যগ শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। ইন্দ্রিয়ের সংযম করে বিশুদ্ধ সৎ জীবন যাপন করা, অপ্রমত্ত হয়ে অহং বোধের বিনাশ সাধন করা, সংসারের কর্তব্য পালন করা, এ সবই হ'ল মানুষের প্রথম কর্তব্য। ঈশ্বর সাধনকেও বিশুদ্ধ জীবনযাপনের উপায় রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা যে কাজ করি, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতে সেই কাজের জন্য আমাদের দায়িত্ব রয়েছে ; মানুষের মুক্তির জন্য ভক্তি এবং ঐশ্বর প্রসাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বলা হয়েছে। মানুষ আপন কর্মফলের দ্বারাই বন্ধন সৃষ্টি করে এবং তার আচরণের দ্বারা সে তার বন্ধন ক্ষয়ও করে ; এইভাবে পাপ ক্ষয়

হয়। বিশুদ্ধ জীবন এবং ভক্তি ব্রহ্ম লাভের পথ, একথা রামানুজ বললেন; মানুষ দুঃখ ভোগ করে আপন দুষ্কৃতির ফল হিসেবে। কর্মফলের ভোগের আগুনে দগ্ধ হয়ে মানুষ ঈশ্বরের কৃপা অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা লাভ করে এবং সেই কৃপালাভের পথেই তার ঈশ্বর-সান্নিধ্য ঘটে। তাহলে দেখা গেল, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদে যে বিশুদ্ধ জীবনযাপনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হল তা রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষদের জন্যই। তাইতো রামানুজাচার্য কথিত কর্ম দর্শনে সাধারণ মানুষ তার নৈতিক জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পায়।

স্বামী বিবেকানন্দের Practical বেদান্ত দর্শন :

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বৈদান্তিক বিবেকানন্দ এবং বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যে অনেক প্রভেদ। স্বামী বিবেকানন্দ যে Practical বেদান্তের কথা বললেন, সেই তত্ত্বে কর্মের স্থান আছে। জীবনে কর্তব্যকে অবহেলা করলে চলবে না। স্বামীজী বললেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষকেও নিস্পৃহ হয়ে সামাজিক কর্তব্য করতে হবে। পদ্মের পাতায় জল থাকলেও পদ্ম পত্রে যেমন তার কোন আভাস থাকে না অর্থাৎ জল যেমন পদ্ম পত্রকে সিক্ত করে তুলতে পারে না তেমনি ব্রহ্ম জ্ঞানী মানুষ প্রকৃত সন্ন্যাসী, সংসারের সকল কর্মে লিপ্ত হয়েও সেই কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত বা অভিভূত হয়ে পড়ে না। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আদর্শ স্বামীজী আমাদের দেখিয়েছেন। সিংহ-বিক্রমে বিপুল কর্মময় জীবনযাপন করার আদর্শ হল স্বামীজীর কর্মের আদর্শ। একেই আমরা স্বামীজীর কর্মযোগ বলতে পারি। সমাজের চোখে অদ্বৈত-বাদের অর্থ, শুধুমাত্র শুষ্ক জ্ঞানচর্চা নয়। তিনি বললেন, সংসারে বীরের মত আমাদের আপন আপন কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। তবে সেই কর্তব্য-কর্ম সমাধার মধ্যে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না। এই-তত্ত্বই হল শঙ্করের বেদান্তে সেই সন্ন্যাসের আদর্শ, গীতার সেই নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। অভীপ্সিত বস্তু লাভ করার জন্য মরণপণ সংগ্রামই হল স্বামী বিবেকানন্দের নীতি দর্শনের মৌল প্রত্যয়। স্বামীজী যে সেবা মন্ত্র মানুষকে দিলেন, সেই সেবার মন্ত্র তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে। 'সর্বজীবে দয়া'—এই তত্ত্বটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনঃপুত হয় নি। তিনি বললেন, জীবত শিব, অতএব শিবকে দয়া করা অসম্ভব। প্রকৃত নৈতিকতত্ত্ব হল, সর্ব জীবে সেবা। এই নরনারায়ণের সেবার মধ্য দিয়েই স্বামীজী ভগবানকে লাভ করার পথ দেখিয়েছিলেন। যে নৈতিক সাম্যবাদ হিন্দুদর্শনের মূল উপজীব্য, সেই তত্ত্ব-টিকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে পাই। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের অন্যান্য

প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে অন্যান্য বর্ণের মানুষের কাছে পূজা এবং সম্মান দাবী করে। স্বামীজী বললেন যে, এর চেয়ে মিথ্যা এবং অনাচার আর কিছুই হতে পারে না। স্বামীজির কথা উদ্ধৃত ক'রে দিই : আত্মার নিরিখে একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এই ধরনের মূল্যায়ন একেবারেই অর্থহীন হ'য়ে পড়ে।.... যেখানে জীবসত্তা সেখানেই তার অন্তরে নিত্যকালের জন্য মুদ্রিত হ'য়ে থাকে অনন্তের সেই বাণী ; সেই বাণীটি নেমে আসে উচ্চতম পরম সত্তার কাছ থেকে। 'In speaking of the soul, to say that one is superior to the other has no meaning...For the infinite message is there imprinted once for all in the heart of every being whereever there is a being, that being contains the infinite message of the Most High,* বিবেকানন্দের মতে জীবন শুষ্ক কঠোর নয় ; জীবন প্রেমের আধার, জগৎ ব্রহ্মময়। মানুষের সেবায় সর্বশ্রেষ্ঠ আধার হল জননী জন্মভূমি। তাইতো স্বামীজী চাইলেন এই জন্মভূমির বুক থেকে সর্ববিধ অনগ্রসরতাকে দূর করতে। তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ, দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মধ্যে, শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মধ্যে বিধৃত হয়ে রইল। তিনি তাঁর ধ্যানের জগতকে কর্মের জগতের সঙ্গে যুক্ত করে দেশকে বড় করতে চেয়েছিলেন। তিনি মিলের হিতবাদকে (Utilitarianism) গ্রহণ করেন নি। উপযোগবাদকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মানুষে মানুষে শত্রুতার অর্থ হয় না, কেননা, সকল মানুষইত ব্রহ্মের প্রকাশ। অতএব, এই বিশ্বাস থেকে আমাদের নৈতিক আচরণের সম্পূর্ণতা সহজেই উদ্ভূত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা ডয়সেনের Philosophy of the Upanishads গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই : বেদান্ত পাঠের সময় আমরা উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সন্ধান পাই। বাইবেলে প্রতিবেশীকে আপনার মত ক'রে ভালবাসবার যে অনুজ্ঞা জারী করা হ'য়েছে, সে অনুজ্ঞাটি নৈতিক আদর্শ হিসেবে যে অত্যুচ্চ, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই অনুজ্ঞাটি আমার পক্ষে কেন পালনীয় তার যুক্তিযুক্ত উত্তর বাইবেলে নেই। আমি'ত' কেবলমাত্র আমার নিজের সুখদুঃখটুকু অনুভব করতে পারি, আমি'ত' আমার প্রতিবেশীর সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারি না। তবে কেন বাইবেলের এই নির্দেশ? বেদের 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রে এই প্রশ্নের জবাব মিলেছে। এই মন্ত্রটিতে পরাতত্ত্ব ও নৈতিক আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে। The highest and the purest morality is the immediate consequcnce of the

* পূর্ণতর বিবরণের জন্য Vedanta and Privilege, Vol. I, পৃঃ ৪১৯—৪২৩ দ্রষ্টব্য।

Vedanta. The Gospel fits quite correctly as the highest law of morality, 'love your neighbour as yourself. But why should I do so, since by the order of the nature, 'I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbour ?' The answer is not in the Bible—but it is in the Vedas, in the great formula, 'That thou art'. 'Tvat Twamasi' which gives, in three words, Metaphysics and Morals together.

গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ :

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে,
'মধুবাতা ঋতায়তে
মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।

ঋগ্বেদের ঋষি বিস্ময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পানে তাকিয়ে দেখলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধুময়। তাঁরা জীবনকে মধুময় বলে জেনেছিলেন; বহুর মধ্যে এক বিশ্ব শক্তিকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমরা যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীকে দেখি, এবং জানি, তাঁরা সেইভাবেই দেবতাদের জেনেছিলেন। সেই বৈদিক যুগে জ্ঞান কাণ্ড এবং কর্মকাণ্ড এই দ্বিবিধ অর্থে কর্ম প্রধান হয়ে উঠেছিল। ব্রহ্ম চিন্তা এবং তত্ত্বচিন্তাই একমাত্র তৎকালীন মানুষের প্রধান কর্ম ছিল, এমন কথা ভাবলে ভুল ভাবা হবে। জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য মোটেই সে যুগের ধর্ম ছিল না। দীর্ঘ জীবন যাপন, স্বাস্থ্য সঞ্চয়, বিত্ত সঞ্চয়, বুদ্ধি বিবর্ধন ও শত্রু নিপাত প্রমুখ কাজে সিদ্ধিলাভের জন্য বুঝি তাঁরা যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করতেন। বিচিত্র কর্মকাণ্ডে বৈদিক যুগের আবহাওয়া মুখর হয়ে উঠেছিল। বেদে ক্রমে তাই যাগযজ্ঞকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতা ভাগ হল মন্ত্রের সমষ্টি বা মূল বেদ। ব্রাহ্মণ ভাগে রয়েছে এই মন্ত্র সমষ্টির ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মণের তিনটি ভাগ: ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ব্রাহ্মণের শেষভাগ হল আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষ ভাগ হল উপনিষদ। উপনিষদ বেদের অন্তভাগ বলে এর নাম হয়েছে বেদান্ত। এই উপনিষদের যুগে কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। উপনিষদ বললেন, জ্ঞানের দ্বারাই পাপ ছেদন করা যায় ও মুক্তি লাভ করা যায়। যজ্ঞের দ্বারা ভগবৎ লাভ সম্ভব নয়। আমরা উপনিষদে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার মধ্যে প্রভেদ করার চেষ্টা দেখি। পরাবিদ্যার

উদ্দেশ্য হল, শ্রেয়বস্তুকে লাভ করা এবং অপরা বিদ্যার উদ্দেশ্য হল প্রেয়কে লাভ করা। পণ্ডিত ব্যক্তি, প্রাজ্ঞজন এই পরাবিদ্যা লাভেই উৎসুক। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ— এদের অপরাবিদ্যা বলা হয়েছে। অপরপক্ষে যার দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাই-ই হল পরাবিদ্যা। এই পরাবিদ্যায় যে সদ্ বস্তুর প্রকাশকে আমরা পাই তাকে সহজভাবে বর্ণনা করা যায় না। নেতিবাচক বর্ণনার আশ্রয়ে আমরা তাকে বুঝতে চেষ্টা করি। কেনোপনিষদে বলা হল যে, সমস্ত দেবতা একই মূল উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। কঠোপনিষদে বলা হ'ল যে, সেই এক ব্রহ্মই নানা রূপে বিশ্ব জগতে প্রকট। বেদ এবং উপনিষদে মানুষের মুক্তির জন্য বিভিন্ন পন্থার নির্দেশ করলেও একটি বিষয়ে তারা একমত ; সেটি হ'ল এই যে সামাজিক কর্তব্য পালন ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনই সুখ শান্তি লাভের উপায়। এই সাংসারিক কর্তব্যের মূল হল গার্হস্থ্য ; গৃহী হিসেবে চিত্ত-শুদ্ধি করতে হবে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হবে এবং আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে জীবনের সুখ শান্তিকে আহরণ করতে হবে। গৃহস্থের জন্য যেসব কর্মের বিধান রয়েছে তা একদিকে যেমন গৃহস্থের সুখশান্তির অনুকূল, সাংসারিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সহায়ক তেমনি তা আবার সেবা, মৃদুতা, নম্রতা, ভীরুতা, ধীরতা, শক্তি, এবং শৌর্য, প্রমুখ সদ্‌গুণের উৎপাদক। এই পথে গৃহী মানুষ বিশ্বজীবনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। সাংসারিক জীবন অর্থহীন নয় ; পারলৌকিক কল্যাণের পরিপূরক হিসেবে সাংসারিক জীবনকে বিচার করতে হবে। একথা ভারতীয় দর্শনের কথা, বেদের কথা, উপনিষদের কথা। ভারতীয় চিন্তা নীতি-বিরুদ্ধ নয়। ভারতীয় চিন্তায় কর্মমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ এই দুটি পথের প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করেছি। এই দুটি ছাড়াও ভক্তিমার্গের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য বেদে ভক্তি মার্গের প্রাধান্য নেই। শ্রীশঙ্করাচার্যের বেদান্তে ভক্তির স্থান নেই। কিন্তু শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীমাধবাচার্য শঙ্করপন্থীদের এই বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গকে গ্রহণ করেন নি। অবশ্য বিশুদ্ধ ভক্তি-বাদ ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে অতি মাত্রায় প্রকট। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব কাল এই ষোড়শ শতাব্দী। এই সময়েই ভক্তিবাদ প্রবল শক্তিতে দেশ জুড়ে প্লাবন ঘটিয়েছিল। ভক্তিমার্গের অন্যান্য পথিকদের মধ্যে নানক, কবীর, মীরাবাঈ, দাদু ও রামকৃষ্ণের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। গীতায় বিভিন্ন দার্শনিক মতেরও সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বেদবাদ; বৈদিক কর্ম মার্গ, বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ও জ্ঞানমার্গ, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ ও কৈবল্য জ্ঞান,

সমাধি, যোগ, অবতারবাদ ও ভক্তিমার্গ এইসব আপাত বিরোধী মতবাদের সমন্বয় শ্রীমৎ ভগবত গীতায় রয়েছে। সমগ্র উপনিষদের প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান গীতার পত্রপুটে ধরা আছে এমন কথা বলা হয়েছে:

'সর্বোপনিষদো গাবোদোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥'

অর্থাৎ উপনিষদের সার হল, গীতা, যেমন বেদের সার হল উপনিষদ। মহাভারতের পরের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় হিন্দু সমাজে এমন কোন ধর্মমত বা দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যা গীতায় প্রতিষ্ঠিত সত্য থেকে আপনার শক্তি ও সামর্থ্যটুকু সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে নি। শঙ্করাচার্য, মাধ্বাচার্য প্রমুখ মনীষীরা গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন গীতা-ভাষ্য রচনা করেছেন এবং এযুগের মনাষী শ্রীঅরবিন্দ গীতাতে প্রত্যক্ষ করেছেন দিব্য জীবন সাধনার অভ্রান্ত পথ। মিল, বেন্থামের মার্জিত বহু সুখবাদের সূত্রটুকুতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন গীতার তত্ত্বকে ; বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গীতা থেকেই দেশ প্রেমের প্রেরণাটুকু সংগ্রহ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও এই গীতাতেই আপোষহীন সংগ্রামের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবাভাবে অহিংসা ও সর্বোদয় আদর্শের মিল কতটা তা এই শ্রীমদ্‌ভগবত গীতায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ দর্শনের মূল শূণ্যবাদ এবং সন্ন্যাসবাদের সঙ্গে গীতার ভক্তিবাদ ও নিষ্কাম কর্ম কর্মবাদের সমন্বয় সাধন ক'রে পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ দর্শনের মহাযানবাদের উদ্ভব হয়েছিল। এই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে ক্লৈব্য ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালনে আহ্বান জানিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করা অর্থাৎ পরোক্ষে মানুষকে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উপদেশ দেওয়া। তিনি অর্জুনকে বললেন,

'ময়ৈবৈতে নিহতা পূর্ব্বমেব
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন্।'

শাশ্বত আত্মার মৃত্যু নেই। নশ্বর দেহের যে মৃত্যু হয় সেই মৃত্যু সংসাধন করেন স্বয়ং ভগবান। মানুষ নামে মাত্র কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। আত্মা অবিনশ্বর, তাই দেহের বিকারের কথা চিন্তা ক'রে প্রাজ্ঞ মানুষের শোকগ্রস্ত হওয়া সাজে না। যাঁকে কর্তব্য বলে জানবে তা সাধন করতেই হবে। বুদ্ধি দীপ্ত পথে মানুষকে আপন আপন কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। কর্ম বন্ধন

আসে কলুষিত আকাঙ্ক্ষার পথে। মানুষ কোন কাজের কর্তা নয়। অহং-বোধ আমাদের চোখে নিজেদের কর্তা বলে প্রতিষ্ঠিত করে। নিয়ত কাজ করার কথা, গীতার উপদেশ। কাজ আমাদের করতে হবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে। সমস্ত ফল ভগবানে অপর্ণ করে গৃহীমানুষ আপন কর্তব্য সম্পাদন করবে ; কর্মেই ব্যক্তি মানুষের অধিকার। ফলের দিকে তাকিয়ে কাজ না করাই হল গীতার উপদেশ। গীতা আমাদের কর্ম ত্যাগ করতে বলে নি। আমাদের নৈতিক জীবনের পরিপূরক সকল কর্তব্য কর্মই আমাদের করতে হবে। শুধু আমি 'কর্তা' এই বোধটুকু ত্যাগ ক'রে কর্তা বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে যদি আমরা আমাদের কাজ করতে পারি তবে সংসার বন্ধনে আমরা আর আবদ্ধ থাকব না ; এই শিক্ষাই হল গীতার শিক্ষা। এই ধরনের নির্লিপ্ত কর্ম যোগীকে গীতায় 'প্রাজ্ঞ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে, যিনি, মনোগত সমস্ত কামনা বিসর্জন দিয়ে তুষ্ট থাকেন, তাকেই 'স্থিত প্রজ্ঞ' বলে জানবে। যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হননা, আবার সুখেও যার স্পৃহা নেই, এবং যিনি ভয় ও ক্রোধশূন্য, তাকে স্থিতধী বলা হয়ে থাকে। এই 'স্থিত প্রজ্ঞ' মানুষ হল সকল নৈতিক প্রয়াসের শেষ লক্ষ্য স্থল। এই স্থিত প্রজ্ঞা মানুষকে দেখেই আমাদের সুখ দুঃখকে সমজ্ঞানে দেখতে হবে, সংযত হতে হবে, শান্ত হতে হবে এবং নির্ভয় হতে হবে। এই স্থিত প্রজ্ঞা মানুষই সকল নৈতিক চেতনার আদর্শ। তার নিরুদ্বেগ শান্তি ও অসীম শক্তির মূলে রয়েছে ভগবানে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের পথে অহংবোধের বিলোপ ঘটে। বৈষ্ণব দর্শনের আধার চৈতন্য চরিতামৃতে ভগবানে সর্বকর্মের ফল সমর্পণ করাকে আত্মসমর্পণ বলা হয়েছে ; একে শরণাগতি বলা হয়েছে। এই শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ : 'ভগবানের প্রীতিজনক কার্যে সদা প্রবৃত্তি এবং তার প্রতিকূল কর্ম থেকে নিবৃত্তি', ভগবান ভক্তকে রক্ষা করেন এই তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ; ভগবান ভক্তকে আচ্ছন্ন করে থাকেন বলে তাঁরই কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁর কাছে দৈন্য ও আর্তি প্রকাশ। এই ছয়টি হল শরণাগতির লক্ষণ।

অতএব গীতায় নিষ্কাম কর্মের আদর্শে বলা হল যে গৃহী মানুষকে তার কর্তব্য করতে হবে ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে ; ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা। আমরা সকলেই সেই ভগবানের ভৃত্য মাত্র। যিনি সত্য জ্ঞানী, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এই ভাবেই গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এইরূপ কর্মানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন মানব জীবন একটি মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে; সেই যজ্ঞের বেদী জাগতিক হিত, ত্যাগ এবং আত্মবলিদান।

যজ্ঞেশ্বর হলেন স্বয়ং ভগবান। হিন্দু ধর্মে গৃহস্থের পক্ষে পাঁচটি যজ্ঞ অবশ্য কর্তব্য। গীতায় তাকে 'স্তেন' অর্থাৎ চোর বলে নিন্দা করা হয়েছে ; যে গৃহী মানুষ পিতৃ ঋণ প্রমুখ পাঁচটি ঋণ শোধের কোন চেষ্টা করে না। হিন্দুর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় গাতায় কথিত 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' নিষ্কাম কর্মের ভিতর দিয়ে। কর্তব্য কর্ম ক'রে আপন আপন সাংসারিক কল্যাণ সাধনের পথে মানুষ সকল কর্মের উদ্দেশ্যের মূল অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কল্যাণে উপনীত হয়। Bradley কথিত Man and his Station তত্ত্বে যে কর্তব্যসম্পাদনের কথা বলা হয়েছে তা গীতার উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যার অনুকূল। গীতা আমাদের বললেন যে, প্রত্যেককে কর্তব্যকর্মটুকু যথাসাধ্য সুন্দর করে করতে হবে ; সেখানেই তার সফলতা এবং এই কর্তব্য কর্মে অবহেলা করলে মানুষ প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। প্রত্যেক কর্তব্যই সমান মূল্যবান। গীতার এই নিষ্কাম কর্মের আদর্শ কিন্তু মিল, বেন্থামে পাই না। প্রেয়োবাদীদের মার্জিত স্বার্থ বুদ্ধির কথা গীতায় নেই। কাণ্টের কর্তব্য কর্ম কঠোর ও নিরানন্দ কিন্তু গীতোক্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা হয় স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ; ফল ভগবানে সমর্পণ করা হয়। এই জ্ঞান থেকেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে ভগবানই যথার্থ কর্তা। অর্থাৎ গীতার কর্তব্যের প্রেরণা আসে আত্ম উপলব্ধি থেকে। অতএব গীতায় যে কর্তব্য সম্পাদনের কথা বলা হল, তা আত্ম উপলব্ধির পথ।

গীতায় প্রথমে জ্ঞান তারপর কর্ম ও সব শেষে ভক্তির কথা আছে এবং এই তিনটির সমন্বয় ঘটেছে ভগবত প্রজ্ঞায়। এই প্রজ্ঞা মানুষকে আয়ত্ত করতে হয় অভ্যাস যোগের দ্বারা। এই কর্তব্য করার নির্দেশ আসে হৃদিস্থিত ভগবানের কাছ থেকে। তিনিই হলেন গীতার হৃষিকেশ। অতএব এক অর্থে গীতার আদর্শকে Intuitive বলা যেতে পারে। স্বজ্ঞার পথেই গীতার এই প্রজ্ঞাকে লাভ করা যায়। গীতার আদর্শকে পরিপূর্ণতাবাদের আদর্শ বলা চলে।

গান্ধিজীর সত্য ও অহিংসার আদর্শ

ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনা ও নৈতিক চেতনার উত্তর সাধক রূপে গান্ধিজী ভগবানের সত্যতায় বিশ্বাস করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভগবানকে যিনি সেবা করেন তিনিই সত্য। সেই ভগবান ছাড়া তার কোন উপাস্য নেই এবং সেই সত্য ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি গান্ধিজীর অনুরক্তি নেই ; তিনি যে এই সত্য ছাড়া অন্য কারও শাসন মানেন না একথাও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষনা করেছিলেন। গান্ধিজীর কাছে ভগবানই একমাত্র সত্য এবং অহিংসা ও

প্রেমের পথে এই ভগবানকে জানা যায়। তিনি সত্যাগ্রহী ছিলেন, তিনি বিশুদ্ধ জীবনযাপনের আদর্শকে সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ভগবানই সমস্ত নীতি ও সদাচারের মূল ; তাই জীবনে সদাচারী হলে ভগবানকে লাভ করা যায়। ভগবানই মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তিনিই সত্য এবং সত্যই হল ভগবান। তাই গান্ধিজী সজ্ঞানে কখনও মিথ্যাকে আশ্রয় করেন নি। গান্ধিজী বললেন যে, প্রেমের পথেই সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়া যায়। অহিংসা অর্থে যে প্রেমকে গান্ধিজী বুঝেছিলেন সেই মহত্তম প্রেমের পূজারী রূপে গান্ধিজী মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বললেন, যে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না এই দুই দল মানুষই সত্যের প্রয়োজনটুকুকে স্বীকার করেন। গান্ধিজীর নীতি দর্শনের মূল কথা হল, সত্য রূপে সেই ভগবানকে মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার পথ হল এই মানুষের সেবা করা। ভগবান পরিপূর্ণ ক্ষমা ও করুণার আধার। তিনিই মানুষের সকল কর্মের নিয়ন্তা।

গান্ধিজীর মতে সত্যই ভগবান এবং সত্যের পথের প্রথম পদক্ষেপ হল অহিংসা। হিংসা পরিহার করা নিষ্ক্রিয়তা বা আলস্য নয়। যিনি সমগ্র সৃষ্টির আধ্যাত্মিক সত্তাটুকু উপলব্ধি করেন, তিনি কাউকে 'অপর' বলে মনে করেন না। অতএব তার পক্ষে হিংসার আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব। যিনি অহিংসা পথের সাধনা করেছেন, তিনি হলেন সত্যের সেবক, গান্ধিজীর মতে তিনি যেমন একদিকে নির্ভয় তেমনি সকলের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। গান্ধিজীর মতে 'হিংসার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা ইহাই যে তীব্র সংগ্রামের সময়েও অন্তরে কোন ক্রোধ, ঘৃণা বা বিদ্বেষের লেশ মাত্র চিহ্নও থাকিবে না এবং সংগ্রামের অবসানে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হইবে।'

এই অহিংস সংগ্রামকে গান্ধিজী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেছিলেন ; প্রত্যেকটি ভারতবাসীর অন্তর থেকে ভয়কে নির্বাসিত ক'রে অভয়কে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে অবিচলিত আস্থা রেখে সত্যের অনুসরণ করাই হল সত্যাগ্রহীর একমাত্র কর্তব্য। সত্যাগ্রহী মনে মনে ক্রোধ, ভয় ও প্রতিহিংসার ইচ্ছাকে বর্জন করবেন এবং তাকে মৃত্যু ভয়ও জয় করতে হবে। গান্ধিজী শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে কাপুরুষের মত অন্যায়কে সহ্য না করতে বলেছেন : 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।' (রবীন্দ্রনাথ)

তিনি বললেন যে, কাপুরুষের মত অন্যায়কে সহ্য করার চেয়ে হিংসার পথে

আত্মসম্মান রক্ষা করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হিংসার পথে গেলেও আত্ম-সংযমের প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন অহিংসা হল শ্রেষ্ঠ বীরত্ব; তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই' "বহু বছর যাবৎ আমি যখন ভীরু ছিলাম তখন আমি হিংসার কথা চিন্তা করতাম। কিন্তু যখন হতে এই ভীরুতা ত্যাগ করতে শিখলাম তখন থেকে অহিংসার প্রকৃত মূল্য আমি বুঝতে শিখলাম।" গান্ধিজীর এই জীবনাদর্শটুকু গীতায় ব্যাখ্যাত কর্মযোগে থেকে নেওয়া হয়েছে। গান্ধিজী বলেছেন যে, তাঁর মনের সব সংশয়ের নিরসন হয়েছে গীতা পাঠ ক'রে। তাঁর মতে, 'এমন কোন অবস্থা কখনও আসে নাই যখন গীতার নিকট হইতে নির্ভুল নির্দেশ লাভ করি নাই। আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে গীতা ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করবার উদ্দেশ্যে হিংসার প্ররোচনা দেয়। প্রত্যেক মানুষের অন্তরের শুভ ও অশুভের যে সংগ্রাম, গীতা বিশেষভাবে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। সেখানে গান্ধিজী একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে 'মৃত্যু ভয় জয় করিয়া কর্তব্য পালনের উপদেশ দিয়াছেন। ফলাফল চিন্তা না করিয়া কর্তব্য পালনের এই উপদেশ গীতাতে দেওয়া হইয়াছে।' অতএব বলা হল যে গীতার কর্ম -বাদের আদর্শ হল, গান্ধিজীর সত্য ও অহিংসার মূল ভিত্তি। কঠোর ভগবৎ নির্ভরতা, আপন স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে কর্তব্য পালন ও সর্ব মানবের একতায় বিশ্বাস, এগুলি হল গান্ধিজীর নীতিদর্শনের ভিত্তি। এগুলি তিনি পেয়ে-ছিলেন শাশ্বত ভারতীয় চিন্তা ও কর্মের আদর্শ থেকে। গান্ধিজী বিশ্বাস করেছেন যে, সমস্ত ধর্মেরই মূল এক; সমস্ত ধর্মেরই উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবনকে মহৎ ও পবিত্র লক্ষ্যে উন্নীত করা। মানুষ যাতে মহৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়, সেদিকে আগ্রহ সৃষ্টি করাই হল সকল ধর্মের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা বলতে পারি যে, উন্নততর জীবনের পথ নির্দেশ ক'রে গান্ধিজী আমাদের সকল ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুললেন। তিনি বললেন যে, ধর্মীয় জীবন ভোগের জীবন নয়, এ হ'ল ত্যাগের জীবন। আবার সংসার থেকে পলায়ন করে এই ধর্ম-জীবন ও নৈতিক জীবনযাপন করা যায় না। অভাব বাড়তে না দিয়ে যে ভোগ্যপণ্য সকল মানুষের করায়ত্ত নয় তাকে স্বেচ্ছায় বর্জন করে গান্ধিজী জীবনচর্যায় উপনিষদিক তত্ত্বের নূতন করে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি গীতাকে অনুসরণ করে বললেন, 'জীবনের যে সব মহার্ঘ সুখ সুবিধা জন-সাধারণ ভোগ করতে পারে না আমাদের উচিত হবে দৃঢ়ভাবে তা ভোগ করতে অস্বীকার করা; এই অস্বীকৃতির ক্ষমতা হঠাৎ একদিনে আসে না। তাঁর মতে আমাদের প্রথম কাজ হ'ল 'সর্বসাধারণের যাহা ভোগ করবার সম্ভাবনা নাই, তাহা ভোগ করিব না'—এই মনোভাব সৃষ্টি করা এবং তারপর চেষ্টার দ্বারা

জীবনকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা যাতে তখন ভোগের দ্রব্য ত্যাগ করাও চলতে পারে। সুতরাং গান্ধিজীর নৈতিক আদর্শ, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'— এই উপনিষদিক আদর্শকে আশ্রয় করে আছে, একথা আমরা বলতে পারি। গান্ধিজীর মতে সংযম ও অভাববোধ নিবৃত্তি, এই দুটিই হল মানুষের মহৎ ধর্ম। গান্ধিজী বলেছিলেন, 'অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ' এবং সর্বোপরি সত্য এই চারটি সংযম হল, মানুষের অবশ্য পালনীয়। আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসেবে গান্ধিজী এই চারটি সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমেই বাক্‌সংযমের কথা বললেন। বাক্‌সংযম, আত্মসংযমের পথে প্রথম পদক্ষেপ। সংযম এবং সদাচার সেই অনুশীলনের মাধ্যম। 'আপনি আচরি ধর্ম, পরেরে শিখাও'— এই মতাদর্শের উপর তাঁর সমগ্র জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠিত। তিনি সদাচারের এমন কোন উপদেশ আমাদের দেন নি বা তিনি নিজে কখনও আচরণ করেন নি। আপনার জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'— অর্থাৎ তিনি যে সদাচারকে আপন জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই সদাচার দেশের সামনে নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এই সদাচার হল সত্যাচার ; সত্যের পথ অনুসরণ করে মানুষ এই সদাচারের পথে অগ্রসর হতে পারে। এই সত্য আবার ভগবৎ আশ্রিত। যাঁরা এই সত্যে বিশ্বাস করেন তাদের ভগবানেও বিশ্বাস করতে হবে। এই সত্যের বা ভগবৎ অস্তিত্বের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। গান্ধিজী ভগবানের বিধিকে নৈতিক এবং ধর্ম জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন। অতএব তিনি পেইলীর মত বিধিবাদীদের সমগোত্রীয়। অর্থাৎ যাঁরা (Who accepts Law as standard) বিধাতার বিধানকে নৈতিক ধর্ম জীবনের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছেন, গান্ধিজী তাদেরই সমগোত্রীয়। তাঁর মতে নৈতিক আদর্শ আসে মানুষের অন্তরের বিবেকের বাণী থেকে ; সেই বাণীই হল ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। অতএব আমরা বলতে পারি, গান্ধিজী ছিলেন নৈতিক বোধবাদে বিশ্বাসী। বোধহয় তাঁকে নীতিশাস্ত্রবিদ বাটলারের সমগোত্রীয় ভাবা যেতে পারে। আবার আরেক অর্থে তিনি মহাদার্শনিক কাণ্টের মত কৃচ্ছ্রতাবাদী ; তাঁকে যুক্তিবাদীও বলা যেতে পারে। তাঁর মতে নৈতিক কর্ম সামগ্রিক সামঞ্জস্যটুকু দাবী করে এবং নৈতিক আদর্শের মধ্যে যুক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। আবার তিনি এই মানুষের যুক্তিবুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে উচ্চতর ভিত্তির উপর কখন কখন নৈতিক আদর্শকে স্থাপন করেছেন। তাঁর মতে মানুষের কর্তব্য পালন করা উচিত সত্য এবং ন্যায়ের অনুশাসনে থেকে। অর্থাৎ যা সত্য নয় বলে বুঝব তাকে

কখনই কর্তব্য বলে পালন করব না। এ হল যুক্তিবাদীর কথা। এই অর্থে গান্ধিজী কাণ্টের মত যুক্তিবাদী। আবার গান্ধিজীকে স্বামী বিবেকানন্দের মত কর্মযোগীও বলা চলে। গান্ধিজীর কর্ম পথের মূল কথাটি হল, সত্য ও অহিংসা। গান্ধিজী অহিংসা ও সত্যকে অভিন্ন করে দেখেন নি। মানুষ নিজেকে ভগবানের সেবক জ্ঞান ক'রে নিরলস, নিষ্কাম কর্মে নিত্য রত থাকবে। এই আদর্শই হল শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এই আদর্শের কথা গান্ধিজী বললেন। এই আদর্শের কথা গীতায় বলা হয়েছিল। অতএব গান্ধিজীকে যদি কেউ প্রেয়োবাদী বলেন, তবে ভুল বলা হবে। উপযোগবাদও তাঁর কাছে গ্রহণ-যোগ্য নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা বলতে পারি যে, গান্ধিজী ছিলেন সম্পূর্ণতাবাদী ; তিনি নিজেকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন। সেই একাত্ম হয়ে থাকার মধ্যে তাঁর অহিংসাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ; সেই অভিন্ন আত্ম-জ্ঞান, সেই সমজ্ঞানই গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ দর্শনের ভিত্তিভূমি। তিনি সত্যানু-সরণকেই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র পথ বলেছেন এবং মানুষকে সেই সত্যের অনুসরণ করতে বলেছেন নির্ভীকভাবে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে।

পরিভাষা

Abbreviation—সংকেত
Aberration—অপেরণ
Ability—সামর্থ্য
Abnormal—অস্বাভাবিক
Abnormality—অস্বাভাবিকা
Abreaction—অভিস্ফুট
Abstinence—উপরতি
Absolute—পরম
Absolute mind—পরমাত্মা
Apathy—অনীহা
Abstract—বিমূর্ত
Abstract idea—বিমূর্তভাব
Abstract knowledge—বিমূর্ত জ্ঞান
Accidental action—আকস্মিক ক্রিয়া
Abstruse—নিগূঢ়
Accent—স্বরন্যাস
Accident—আপতন
Accidental—আপতিক
Aesthetic sense—সৌন্দর্য বোধ
Autonomic action—স্বতঃক্রিয়া
Ideomotor action—ভাবজ ক্রিয়া
Association—অনুসঙ্গ
Impulsive action—আবেগজাত ক্রিয়া
Involuntary action—অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
Muscular action—পৈশিক ক্রিয়া
Reflex action—প্রতিবর্তী ক্রিয়া
Analysis—বিশ্লেষণ
Sensorymotor action—সংবেদজ ক্রিয়া
Volitional action—ঐচ্ছিক ক্রিয়া
Theory of action—ক্রিয়াবাদ
Affective—অনুভূতিমূলক
Aggreeable feeling—প্রীতিকরভাব
Alternative—বিকল্প. অনুকল্প
Altruistic—পরকেন্দ্রিক
,, hedonism—পরসুখবাদ
Aspiration—উৎকাঙ্খা
Adjustment—উপযোজন
Adaptation—প্রতিযোজন
Affection—আধান
Affective quality—আধানিক গুণ
Afferent impulse—অন্তর্মুখ আবেগ
Assimilation—অঙ্গীকরণ
Benevolence—পরহিতৈষিতা

Casuistry—বিবেক বিচার বিদ্যা
Categorial imperative—শর্তহীন আদেশ
Catharsis—বিরেচন
Character—চরিত্র
Collective—সমষ্টিগত
Celebacy—ব্রহ্মচর্য
Centrepetal—কেন্দ্রাভিক
Conduct—আচরণ
Classification—শ্রেণীবিভাগ
Conflict of desire—কামনা বিরোধিতা
Conflict of duties—কর্ত্তব্য বিরোধিতা
Conflict—দ্বন্দ্ব
Clearness—বিশদতা
Convention—প্রচল
Conscience—বিবেক
Composite—সংযুত
Conation—ইচ্ছা
Contrariety—বৈপরীত্য
Concept—ধারণা
Culture—কৃষ্টি
Contiguity—সন্নিধি
Continuity—অনবচ্ছেদ
Demerit—দোষ
Desire—কামনা
Determinism—নিয়ন্ত্রণবাদ
Defect—ভঙ্গীল
Degree—মাত্রা
Deviation—ব্যত্যয়
Divine—ঐশ্বরিক
Disinterestedness—স্বার্থশূণ্যতা
Disposition—স্বভাব
Dissociation—বিষঙ্গ
Disagreeable feeling—অপ্রীতিকরভাব
Distraction—বিক্ষেপ
Dualism—দ্বৈতবাদ
Duty—কর্ত্তব্য
Ego—অহম্
Egoism—আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মবাদ
Egocentric—আত্মকেন্দ্রিক
Egoistic hedonism—আত্মসুখবাদ
Egotism—অহমিকা
Elation—উল্লাস
Element—মৌল
Elementary—মৌলিক
Emotion—ভাবাবেগ, প্রক্ষোভ
Empathy—সমানুভূতি
Empirical—প্রায়ুগিক
Empiricism—প্রয়োগবাদ
Environment—পরিণম প্রতিবেশ
End—লক্ষ
Equity—নিরপেক্ষতা
Ethical Hedonism—নৈতিক সুখবাদ
Evil—মন্দ, অন্যায়
Evolutionist—বিবর্ত্তনবাদী
Evolutionary Hedonism—বিবর্ত্তন সম্মত সুখবাদ

External Law—বহির্বিধি
External Sanction—বহি নিয়ন্ত্রণ
Extreme view—চরম মতবাদ
Experience—অভিজ্ঞতা
Experiencer—অভিজ্ঞাতা
Experiential—অনুমত সিদ্ধ
External law—বহির্বিধি
External Sanction—বহির্নিয়ন্ত্রণ
Extreme view—চরম মতবাদ
Fact—তথ্য
Fallacy of composition—সমষ্টি হেত্বাভাস
Farsight—ভবিষ্যৎ দৃষ্টি
Feeling of dependence—নির্ভরতাবোধ
Fore pleasure—পূর্বসুখ
Free—স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ, মুক্ত
Freedom of will—ইচ্ছার স্বাধীনতা
Free will—ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য
Frugality—মিতব্যয়িতা
Function—বৃত্তি, ধর্ম, ক্রিয়া, কর্ম
Functional—কার্মিক
Functionalism—ক্রিয়াবাদ
Generalization—সামান্যীকরণ
Gestalt Psychology—গেষ্টল্ট্ মনোবিদ্যা
Good—ভাল, কল্যাণ
Gross—স্থূল
Habit—অভ্যাস
Habitual—অভ্যাসগত
Habituation—অভ্যস্তকরণ
Hate—দ্বেষ
Hatred—দ্বেষ
Hedonism—প্রেয়োবাদ, সুখবাদ
Hedonist—সুখবাদী
Hedonistic Calculus—সুখবাদের গঠন প্রণালী
Highest good—পরম কল্যাণ
Humanitarian—মানবপ্রেমী
Humanity—মানবতা
Id—অদম্
Idea—ভাব
Ideal—আদর্শ
Idealism—ভাববাদ
Identical—একই
Ideational behaviour—চেষ্টিত, ভাবনাজ ক্রিয়া
Identification—অভেদ, একাত্মতা, একাত্ম
Identify—একাত্মীকরণ, একাত্মীভবন
Ideo-motor action—ভাবজ ক্রিয়া
Imitative action—অনুকরণ-শীল ক্রিয়া
Immoral action—নীতি-বিগর্হিত ক্রিয়া
Immorality—দুর্নীতি
Impersonal—নৈর্ব্যক্তিক
Improvement—উন্নতি
Impulse—আবেগ

Impulsive—আবেগজ
Incompatible—বিরুদ্ধ
Inconsistency—অসংগতি
Independent—স্বতন্ত্র
Individual—ব্যক্তি, ব্যক্তিগত, প্রাতিস্বিক
Individualism—ব্যক্তিতাবাদ
Individuality—ব্যক্তিতা
Industry—শ্রমশীলতা
Infinity—আনন্ত্য, অমেয়তা—
Regression to অনবস্থা
Inherence—অধিষ্ঠান
Inherit—বংশানুসরণ
Inheritance—উত্তরলব্ধি
Inherited—বংশগত, বংশানুসৃত
Inhibition—বাধ—
Retroactive Inhibition—প্রতীপবাধ
Inanimate object—অচেতন পদার্থ
Innate—জন্মগত
Insanity—বাতুলতা
Insight—পরিজ্ঞান
Inspiration—ভাবগ্রাহ, উচ্ছ্বাস, প্রশ্বাস
Instinct—সহজ প্রবৃত্তি—
sexual Instinct—সহজ যৌন প্রবৃত্তি
Instinctive action—সাহজিক ক্রিয়া
Instinctive—সাহজিক
Institute—প্রতিষ্ঠান
Integration—সম্পূরণ, সমাকলন
Intellectualism—বুদ্ধিবাদ
Intelligence—বুদ্ধি
Intelligence quotient বুদ্ধ্যঙ্ক
Intelligence test—বুদ্ধি অভিজ্ঞা
Intention—অভিপ্রায়
Intensity—তীক্ষ্ণতা
Interaction—মিথস্ক্রিয়া—
Psycho-Physical interaction—মানসদৈহিক মিথস্ক্রিয়া
Interactionism—মিথস্ক্রিয়াবাদ
Internal sanction—অন্তর্নিয়ন্ত্রণ
Intellectual—বুদ্ধিগত
Intellectual element—বুদ্ধিগত উপাদান
Introspection—অন্তর্দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি
Intuition—স্বজ্ঞা
Intuitive—স্বজ্ঞাত
(Knowledge)
Invo untary—অনৈচ্ছিক
Judgement—অবধারণ, বিচার
Just—ন্যায়ী
Justice—ন্যায়, ন্যায্যতা
Justification—সমর্থন, প্রমাণ
Justify—সমর্থন
Knowledge—জ্ঞান
Latent—অস্ফুট, লীন
Law—সূত্র
Law of Parsimony লাঘব সূত্র

Learn—শিক্ষা, অভ্যাস
Learning—শিক্ষা, বিদ্যা,—
,, curve শিক্ষারেখ
,, Method—আবৃত্তি পদ্ধতি
Life—জীবন
Magnitude—মাত্রা
Materialist—জড়বাদী
Mature—পরিপক্ক
Maturity—পরিপক্কতা
Maximum— গরিষ্ঠ, চরম, বৃহত্তম Mean সমক, গড় deviation ব্যত্যয় সমক mean error, the method of সমক ভ্রম পদ্ধতি Variable error সমকভেদ ভ্রমাত্মক, Variation সমক ব্যত্যয়, গড়ব্যত্যয়
Means—উপায়
Meaning—অর্থ
Merit—গুণ, গৌরব
Metaphysical—আধিবিদ্যক
Metaphysics—অধিবিদ্যা
Mollified—লঘু
Mood—মেজাজ
Moral—নৈতিক
Morality—নীতি, কর্ত্তব্যনীতি, নৈতিকতা
Moral action—নৈতিক ক্রিয়া, নীতিসম্বন্ধীয় ক্রিয়া
Moral attribute—নৈতিকগুণ
Moral consciousness—নৈতিক চেতনা
Moral duty—নৈতিক কর্ত্তব্য।
,, end—নৈতিক লক্ষ্য
,, faculty—নীতিবোধ শক্তি, নৈতিক শক্তি
,, insight—নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি
,, Judgment—নৈতিক বিচার
,, law—নৈতিক নিয়ম, নৈতিক বিধি
,, obligation—নৈতিক বাধ্যতাবোধ
,, progress—নৈতিক ক্রমোন্নতি
,, responsibility—নৈতিক দায়িত্ব।
,, sanction—নৈতিক নিয়ন্ত্রণ
,, sense—নীতিবোধ ইন্দ্রিয়।
,, sentiment—নৈতিক মনোভাব
,, worth—নৈতিক উৎকর্ষ।
Motive—উদ্দেশ্য, প্রেষণা,
Motivation—প্রেষণা
Motor—ক্রিয়া। ক্রিয়াজ
Motor area—চেষ্টাধিষ্ঠান
Motor nerve—বহির্মুখ নার্ভ, চালক নার্ভ।
Mystic—অতীন্দ্রিয়
Mysticism—অতীন্দ্রিয়তা। অতীন্দ্রিয়বাদ Myth অতিকথা
Natural—প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক, স্বাভাবিক—reaction স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

Naturalism—স্বভাববাদ
Natural Science—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান
Negative—নঞর্থক
Norm—স্বমিতি
Normative—আদর্শনিষ্ঠ
Normal—স্বভাবী। স্বমিত।
Normal person—স্বভাবী
Normality—স্বভাবিতা।
Non-moral action—নীতি-বহির্ভুত ক্রিয়া
Non-Voluntary action—অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
Object—পদার্থ, বস্তু, সামগ্রী, বিষয়
Objective—বিষয়গত, বৈষয়িক, ব্যক্তিনিরপেক্ষ
Objective attitude—বিষয় প্রতিন্যাস
Objective Method—বিষয়গতপদ্ধতি
Objectivism—বস্তুতন্ত্রতা
Object of moral Judgement—নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।
Obligation—বাধ্যতাবোধ
Observation—অবেক্ষণ, পর্যবে ণ
Observationism—ঈক্ষণকাম, ঈক্ষণরতি।
Opposite—বিরুদ্ধ
Opposition—বিরোধ
Opposite word—বিপরীত শব্দ
Organic—জৈব, আঙ্গিক, অঙ্গীয়
Organization—সংঘাত, সংগঠন
Organism—অবয়বী, অঙ্গী
Organic relation—আঙ্গিক সম্বন্ধ
Other regarding—পরকেন্দ্রিক
Outer—বাহ্য
Outline—পরিলেখ
Oughtness—ঔচিত্য বোধ।
Panpsychism—সর্বমনোবাদ।
Panthesis—সর্বেশ্বরবাদ
Paradox—কূটাভাস, কূট
Paradox of Hedonism—সুখবাদের হেঁয়ালি
Parallelism—সহচারবাদ, সহচার
Passive—ভোগবৃত্ত। নিষ্ক্রিয়
Passivity—ভোগবৃত্তি, নিষ্ক্রিয়তা
Percept—প্রত্যক্ষ।
Perception—প্রত্যক্ষ রূপ,
Perceptual—প্রত্যক্ষজ।
Perfect—ত্রুটিহীন।
Perfection—পরোৎকর্ষ।
Perfectionism—পূর্ণতাবাদ।
Permanent—স্থায়ী, নিত্য
Perseverance—অধ্যবসায়
Perseveration—অবিরতি
Personality—অস্মিতা।
Pessimism—দুঃখবাদ।
Physiology—জীবনবিজ্ঞান
Philosophy—দর্শন।

Play—ক্রীড়া
Pleasant—প্রিয়
Pleasantness—প্রিয়তা
Pleasure—সুখ
,, Principle সুখসূত্র
Pluralism—নানাত্ববাদ
Political—রাষ্ট্রীয়
Positive—বস্তুনিষ্ঠ, সদর্থক।
Positivism—দৃষ্টবাদ
Posterior—পশ্চাৎ
Postulate—স্বীকার্য
Positive Science—বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান
Postulates—স্বীকার্য সত্য।
Practical—ব্যবহারিক
Practical reason—ব্যবহারিক বিচারশক্তি
Practice—প্রয়োগ।
Pragmatic—প্রয়োগিক।
Pragmatism—প্রয়োগবাদ।
Presumption—অর্থাপত্তি
Principle—মূলনীতি, তত্ত্ব।
Problem—সম্পাদ্য
Projection—প্রক্ষেপ, অভিক্ষেপ
Propensity—প্রবণতা
Proposition—প্রতিজ্ঞা।
Psyche—মন
Psychological—মনোবিজ্ঞান-সম্মত।
Pure reason—বিশুদ্ধ চিন্তা, বিশুদ্ধ বিচার শক্তি।
Purposive action—আভিপ্রায়িক ক্রিয়া।
Rating—নির্ধারণ।
Rational—যুক্তিসিদ্ধ
Rationalist—যুক্তিবাদী, হৈতুক
Rationalism—হৈতুকতা, যুক্তিবাদ
Rationalization—যুক্ত্যাভাস
Real—বাস্তব।
Realism—বাস্তববাদ
Reality—বাস্তব, বাস্তবতা
Reason—বিচার বুদ্ধি, বিচারশক্তি
Reasoning—বিচার, যুক্তি।
Reconciliation—সমন্বয়
Redintegration—পুনঃ সমাকলন
Refined Hedonism—সূক্ষ্ম বা সংযত সুখবাদ
Reflection—প্রতিফলন
Reflex— প্রতিবর্ত, প্রতিবর্তক, প্রতিবর্তী— conditioned Reflex —সাপেক্ষ প্রতিবর্ত unconditioned Reflex —অনপেক্ষ প্রতিবর্ত।
Reflex action—পরাবর্তকক্রিয়া
Relation— সম্বন্ধ, ব্যতিষঙ্গ
Relative—সম্বন্ধ, আপেক্ষিক, সাপেক্ষ।
Relativism—ব্যতিষঙ্গবাদ
Relativity—আপেক্ষিকতা
Reformative—সংশোধনাত্মক
Regulative—নিয়ামক

Regulation—নিয়ন্ত্রণতা
Remembrance—স্মৃতি
Repetition—পুনর্বৃত্তি
Reproduction—জনন
Retribrutive—প্রতিশোধাত্মক
Rigoristic—কঠোর
Rigorism—কৃচ্ছ্রতাবাদ
Right—উচিৎ
Satiety—পরিতৃপ্তি, সন্তৃপ্তি
Savage—বর্বর।
Scepticism—সন্দেহবাদ
Schizophrenia—চিত্তভ্রংশী বাতুলতা।
Science—বিজ্ঞান
Scientific—বৈজ্ঞানিক
Science of actual—বাস্তব-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান
Science of ideal—আদর্শ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।
Score—সাফল্যাঙ্ক
Scoring method—যুগ্মস্মৃতি পদ্ধতি
Self—সত্তা, আত্মা।
Selfishness—স্বার্থপরতা
Self approval—আত্মপ্রশংসা
,, condemnation—আত্ম-নিন্দা
,, consciousness—আত্ম-সচেতনতা
,, determination—আত্ম-নিয়ন্ত্রণ
,, love—আত্মপ্রেম, আত্ম-অনুরাগ
Self realisation—আত্মোপলব্ধি
,, regarding—আত্মকেন্দ্রিক।
Sensibility—বেদিতা
Sensitive—সুবেদী
Sensorial reaction—সংবেদন প্রতিক্রিয়া
Sentiment—রস, মনোভাব
Sight—দর্শন
Similarity—সাদৃশ্য
Simple—সরল
Simplicity—সরলতা
Simplification—লঘুকরণ
Social—সামাজিক
Social Self—সামাজিক আত্মা
Sociality—সামাজিকতা
Spiritualist—অধ্যাত্মবাদী
Soul—আত্মা
Specific—বিশেষ
Speculation—দূরকল্পনা
Spiritualism—আত্মিকবাদ
Spontaneous—স্বতঃবৃত্ত
Spontaneous action—স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া
Structuralism— অবয়ববাদ সংঘাতবাদ
Spring of action—কাজের উৎস
Standard—মাপকাঠি, মানদণ্ড
Stimulus—উদ্দীপক
Sub-conscious—অন্তর্জ্ঞান
Subject matter—বিষয়।
Subjective—বিষয়ী, অধ্যাত্মীয়

Subjectivism—অধ্যাত্মবাদ।
Sublimation—উদ্‌গতি
Suggestion—অভিভাব, অভিভাবন
Suppressed—নিরুদ্ধ
Supreme good—পরমকল্যাণ
Survey—নিরীক্ষা
Syllogism—ন্যায়
Symbol—প্রতীক,
Symmetrical—প্রতিসম
System—রীতি, তন্ত্র
Temperance—সংযম
Tenacity—সংযক্তি
Tendency—প্রবণতা
Tension—তান, প্রেষ পীড়া, পীড়ন
Testimony—সাক্ষ্য
Thinker—মনীষী
Theory—তত্ত্ব
Theoretical—তাত্ত্বিক; তত্ত্বনিষ্ঠ
Transference of interest—স্বার্থের স্থানান্তরীকরণ।
Trust—বিশ্বাস।
Understanding—বোধ
Ultimate end—চরমলক্ষ্য
Ultimate goal—চরম উপেয়
Ultimate reality—পরমসত্তা
Unity—একত্ব
Universal—সর্বজনীন, সাধারণ, সার্বিক।
Unpleasantness—অপ্রিয়তা
Utility—প্রয়োজনীয়তা, উপযোগ
Utilitarianism—পরসুখবাদ, উপযোগবাদ।
Value—মূল্য
Validity—সত্যতা
Variable—ভেদ্য
Vice—অধর্ম।
Virtue—ধর্ম, সততা
Vision—দর্শন, দৃষ্টি
Visual—দার্শন।
Volition—ইচ্ছা
Violitional—ঐচ্ছিক
Voluntary action—ঐচ্ছিক ক্রিয়া
Want—অভাব
Wholeness—সমগ্রতা
Will—ইচ্ছা, সংকল্প
Wish—ইচ্ছা
Work—ক্রিয়া
Wrong—অনুচিত, অসৎ

গ্রন্থপঞ্জী

আরব্যান্ : ফাণ্ডামেন্টালস্ অব এথিকস্

আলেকজাণ্ডার : মর্যাল অর্ডার এণ্ড প্রোগ্রেস

আয়ার, এ, জে : এ্যানালিসিস্ অব মর্যাল জাজমেন্টস।

এ্যালবি, ই : হিস্ট্রি অব ইংলিস ইউটি লিটেরিয়ানিজম্।

ওয়াডিংটন্, সি, এইচ : সায়েন্স এণ্ড এথিকস্।

ওয়েষ্টারমার্ক : এথিক্যাল রিলেটিভিটি

ওলাফ ষ্টেপলটন্ : এ মডার্ন থিওরি অব এথিকস্।

কাণ্ট : ফাণ্ডামেণ্টাল প্রিন্সিপলস অব মেটাফিজিকস্ অব মর্যালস্।

ক্যারিট, ই, এফ : দি থিওরি অব মর্যালস্।

গারডিন্ এল : এ মডার্ন ইনট্রডাকশন টু এথিকস্

গিনস্বার্গ : মর্যাল প্রোগ্রেস্

গ্রীণ : প্রোলেগোমেনা টু এথিকস

জর্জ সান্তায়ন: দি লাইফ অব রিজন্।

জনসন, ও, এ : রাইটনেস্ এণ্ড গুডনেস্।

জোনস, ডবলু টি : এপ্রোচেস্ টু এথিকস্।

জুরি, জে, এস : ভ্যালু এণ্ড এথিক্যাল অবজেকটিভিটি

টেলর : দি ফেথ্ অব আ মর্যালিষ্ট

ডিউই জে : হিউম্যান নেচার এণ্ড কন্ডাক্ট ; রিকনসট্রাকশন্ ইন ফিলজফি।

ডিউঈ এণ্ড টাফটস্ : এথিকস্

নোয়েলস্মিথ, পি, এইচ্ : এথিকস্।

নীট্শে : বিঅণ্ড গুড এণ্ড ইভিল

লেজলি ষ্টিফেন : সায়েন্স অব এথিকস্

পেটন : দি মর্যাল ল্ ; দি গুড উইল ; আ ষ্টাডি ইন দি কোহেরেন্স থিওরি অব গুডনেস্।

পেপার্টা : দি প্রাইস অব মর্যালিটি।

ফ্লুগেল, জে, সি : ম্যান্, মর্যালস্ এণ্ড সোসাইটি

ফিল্ড, জি সি : মর্যাল থিওরি।

বাঁর্গস : দি টু সোর্সেস অব মর্যালিটি এণ্ড রিলিজিয়ন্

বেন্থাম : প্রিন্সিপিলস্ অব লেজিস্লেশন্ এণ্ড মর্যালস।

বোনার : দি মর্যাল সেন্স

বোসাং কে, বি : সাইকোলজি অব দি মর্যাল সেল্ফ।

ব্যুভোআ, সাইমঁ দ্য : এথিকস্ অব এম্বিগুইটি।

ব্রড : ফাইভ টাইপস্ অব এথিক্যাল থিওরি।

ব্র্যাডলি : এথিক্যাল ষ্টাডিজ।

মার্টিন্যু : টাইপস্ অব এথিক্যাল্ থিওরি

মিত্র, এ, সি : দি এলিমেণ্টস্ অব মর‍্যালস্।
মিল, জে, এস্ : ইউটিলিটেরিয়ানিজম্
মুয়রহেড : দি এলিমেন্টস অব মর‍্যালস্
মুর, জি, ই : প্রিন্সিপিয়া এথিকা ; এথিকস্।
ম্যাকিনন্ ডি, এম : এ ষ্টাডি ইন এথিক্যাল থিওরি।
ম্যাকেঞ্জি : এ ম্যানুয়েল অব এথিকস্.
মৈত্র সুশীল কুমার : এথিকস্ অব দি হিন্দুস্।
রস : দি রাইট এণ্ড দি গুড।
ফাউণ্ডেশনস্ অব এথিকস্।
রাইট : জেনারেল ইন্ট্রডাকশন টু এথিকস্।
রাসেল বার্ট্রাণ্ড : হিউম্যান সোসাইটি ইন্ এথিকস্
র‍্যাসডাল : থিওরি অব গুড এণ্ড ইভিল
লিলি : ইন্ট্রোডাকশন্ টু এথিকস্।
লেয়ার্ড : এ ষ্টাডি ইন্ মর‍্যাল থিওরি
বীগে-সেলবি, এল্, এ : ব্রিটিশ মোর‍্যালিষ্টস্।
ষ্টিভেনসন্ : এথিকস্ এণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ
ষ্টেস : দি কনসেপ্ট অব্ মর‍্যালস্।
সালি : আউট লাইনস্ অব সাইকোলজি, আউট লাইনস্ অব দি হিষ্ট্রী অব এথিকস্
সিজউইক : মেথড্ অব এথিকস্ ;
সেথ, জেমস্ : এথিক্যাল্ প্রিন্সিপলস্।
সেলশ্যাম, এইচ : সোশ্যালিজম্ এণ্ড এথিকস্।
সোভাইটজার, এ : সিভিলাইজেশন্ এণ্ড এথিকস্
স্যাফটস্‌বেরি : এন্ এনকোয়ারি কনসার্নিং ভার্চু
স্বামী সত্যানন্দ ; ওয়ার্লড এথিকস্।
স্মিথ, এ্যাডাম্ : দি থিওরি অব্ মর‍্যাল সেন্টিমেন্টস্।
হব্‌হাউস্ মর‍্যালস্ ইন্ ইভল্যুশন্।
হবস্ : লিভিয়াথান্।
হার্টম্যান : এথিকস্।
হাক্সলি, জে : ইভল্যুসানারি এথিকস্।
হিউম, ডেভিড : ট্রিটিজ অন হিউম্যান নেচার ; এনকোয়ারি কনসার্নিং দি প্রিন্সিপ্যালস্ অব্ মর‍্যালস্।
হিল, টি : কনটেম্পরারি এথিক্যাল থিওরিস্ ; এথিকস্ ইন থিওরি এণ্ড প্র্যাকটিস।
হেয়ার : দি লেন্গুয়েজ অব মর‍্যালস্
হেগেল : ফিলজফি অব রাইট।
হোস্পানী : এথিক্যাল ভ্যালু।
হ্যাড্‌ফিল্ড : সাইকোলজি এণ্ড মর‍্যালস্।
য়ুইঙ্গ এ, সি : দি ডেফিনিশন্ অব গুড; সেকেণ্ড থটস্ ইন্ মর‍্যাল ফিলজফি ; সাবজেকটিভিজম্ এণ্ড ন্যাচারালিজম্ ইন্ এথিকস্।

নির্ঘণ্ট

সমাপ্ত